আত্মজীবনী

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্-এ, বি-এল্
এডভোকেট্, কলিকাতা হাইকোর্ট; অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

"ফিলজফি অফ্ দি উপনিষদস্", "ডটার অফ্ হিন্দুস্থান"
"দেবনাথ", "লজ্জাদেবী", "বাসবী", "পরিতাপ"
"শ্রমিকের ছেলে", প্রভৃতি, প্রণেতা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্
কলিকাতা

প্রকাশক
সুহৃদ্ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এস্‌সি,
৪।২ জস্টিস্ চন্দ্রমাধব রোড
কলিকাতা

প্রিণ্টার : শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী
কালিকা প্রেস্ লিমিটেড্
২৫, ডি, এল্, রায় ষ্ট্রীট্
কলিকাতা

নীহার, সুহৃদ্, ও নিশীথকে
স্নেহোপহার দিলাম

সূচী

পরিচ্ছেদ		পৃষ্ঠা
	ভূমিকা	
১	পিতৃস্মৃতি	১
২	বাল্যকাল	৯
৩	শিক্ষাজীবন	১৯
৪	ওকালতি	২৭
৫	দেশের সেবা	৪২
৬	অধ্যাপন	৬০
৭	সাহিত্য চর্চ্চা	৭১
৮	তত্ত্বানুসন্ধান	
	(১) সংশয় কাল	১০৫
	(২) সংশয় মোচন : আত্মতত্ত্ব	১১৪
	(৩) হিন্দুর অবনতি	১৪৪
৯	পারিবারিক জীবন	১৫৭
১০	বন্ধুগণ	১৮২
১১	উড়িষ্যা	১৯০
১২	শেষ কথা	২০২
	শুদ্ধিসূচী	

ভূমিকা

বিখ্যাত লোক নই, অথচ আত্মজীবনী লিখিলাম। ঘটনাপূর্ণ জীবনের কথা যদি অকপটভাবে বলিতে পারা যায়, আত্মকাহিনীর স্বাভাবিক আকর্ষণ বাড়িয়া উঠে। বিচিত্র সৃষ্টিতে মানব-জীবন নিত্য অসংখ্য প্রকারে বিকশিত হইতেছে, কেবল পরিচিত দিক হইতে দেখিলে তার অনন্ত স্পর্শ অনুভব করা যায় না। আমার জীবনী সেই অপরিচিত দিকের একটি ক্ষুদ্র বিবৃতি।

আমার প্রণীত এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, "দি ফিলজফি অফ্ দি উপনিষদস্" (উপনিষদে দর্শনবাদ) ইংরাজি বইয়ের বাঙ্গালা অনুবাদ করিবার খুবই ইচ্ছা আছে। যদি জীবনে আর অবসর না পাই, সেজন্য সপ্তম পরিচ্ছেদে, তত্ত্বানুসন্ধানের প্রসঙ্গে, তার সারাংশ দিলাম। আমি উপনিষদের আলোচনা করিয়াছি, সত্যানুসন্ধানের তীব্র আকাঙ্ক্ষার বশীভূত হইয়া, খ্যাতির জন্য নয়, সে কারণেও উপনিষদ্-চর্চ্চার বিষয় জীবনীতে স্থান না পাইলে, তাহা অসম্পূর্ণ থাকিত। আশা করি, আমার আলোচনা, মানবের চরম জ্ঞান উপনিষদ্ সত্যের বিকৃত সাম্প্রদায়িক অর্থ করিবার প্রয়াস, চিরকালের জন্য ধ্বংস করিয়াছে।

কলিকাতা,
বৈশাখ, ১৩৪৬

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

আত্মজীবনী

প্রথম পরিচ্ছেদ

পিতৃ-স্মৃতি

যে সব বাঙ্গালী প্রবাসে গিয়া সুপরিচিত হইয়াছেন, আমার পিতা পার্ব্বতীচরণ তাঁদের মধ্যে একজন। পার্ব্বতীচরণ, জেলা খুলনা, সাতক্ষীরা মহকুমার অধীন পানিয়া গ্রামে ১৭৬৪ শকাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সাতক্ষীরা তখন চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত ছিল। পানিয়া এখন একটি ছোট গ্রাম, কালীগঞ্জ থানা হইতে দেড়ক্রোশ দক্ষিণে, কিন্তু এক সময়ে তার পাশ দিয়া যমুনা নদী বহিয়া যাইত, যার বক্ষে বাঙ্গালার অমর অধীশ্বর প্রতাপাদিত্যের অর্ণবপোত দর্পের সহিত বিচরণ করিত। যশোরেশ্বরীর পীঠস্থান ঈশ্বরীপুর, পানিয়া হইতে পাঁচক্রোশ দক্ষিণে। প্রতাপাদিত্যের রাজ্যলোপের পর, যমুনা, কালের গুণে, ছোট একটি খালে পরিণত হইয়া, কালীগঞ্জে কাঁকশিয়ালির খালের সঙ্গে মিশিয়াছে। এখন পানিয়ায় যাইতে ইচ্ছা করিলে, কলিকাতা-শ্যামবাজার ষ্টেশনে, মার্টিন কোম্পানির বারাসাত-বসিরহাট্ রেলে উঠিয়া, হাসনাবাদ্ ষ্টেশনে নামিতে হয়; হাসনাবাদ্ হইতে পানিয়া সাতক্রোশ, কালীগঞ্জ পর্য্যন্ত নৌকা করিয়া, এবং বাকি দেড়ক্রোশ পথ মোটরে যাইতে হয়।

আমরা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, চক্রবর্ত্তী আমাদের উপাধি। ব্রাহ্মণকুলে জন্ম অনেকের মত, আমার পূর্ব্বপুরুষেরা ধনহীন কিন্তু বিদ্যার অধিকারী ছিলেন। আমার সপ্তম পূর্ব্বপুরুষ, হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়, সামাজিক ভাষায় কুল নষ্ট করেন। আমার প্রপিতামহ, রামপ্রসাদ, তর্কবাগীশ উপাধিধারী ছিলেন। রামপ্রসাদের পিতা, সীতারাম, বিদ্যাবাগীশ উপাধি পাইয়াছিলেন। সীতারামের তিন ভাইও পণ্ডিত ছিলেন; বড় দুই ভাই, রামচন্দ্র এবং সিদ্ধেশ্বর,

যথাক্রমে শিরোমণি এবং তর্কালঙ্কার, এবং ছোটভাই, রামকন্দ্র, বিশারদ উপাধি পাইয়াছিলেন। সীতারামের পিতা মহাদেব, বাচস্পতি, এবং মহাদেবের পিতা, রাজেন্দ্রচন্দ্র, তর্কবাগীশ উপাধি পাইয়াছিলেন। রাজেন্দ্রচন্দ্র, হরিচর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র। কেবল সীতারামের বংশধরেরা পানিয়ায় বাস করেন; মহাদেবের অন্য পুত্ররা পানিয়ার নিকট তিনটি গ্রাম, দক্ষিণ শ্রীপুর, লক্ষীনাথপুর, এবং গোপালপুরে ছড়াইয়া বাস করিয়াছিলেন।

আমার পিতামহ শ্রীনারায়ণ, এবং তাঁর বড় ভাই গঙ্গানারায়ণ, বংশোচিত শিক্ষালাভ করিতে পারেন নাই, কারণ শৈশবে পিতা-মাতা হারাইয়া তাঁরা অভিভাবকশূন্য হইয়াছিলেন। বিদ্যাই তখন ব্রাহ্মণের উপার্জ্জনের প্রধান সহায় ছিল। আমার পূর্ব্বপুরুষেরা ব্রহ্মোত্তর-ভোগী ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু সময়ে ঐ সম্পত্তির এত বিভাগ হইয়াছিল, কেবল তার উপর নির্ভর করিয়া সংসার চলিত না। বিদ্যার অভাবে পিতামহের আয়ের পথ বন্ধ হওয়াতে, সংসার চালাইতে তিনি এত কষ্ট পাইয়াছিলেন, বৃদ্ধ বয়সেও পিতা তাহা স্মরণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

পিতামহ, গোপালপুর নিবাসী রামতনু চট্টোপাধ্যায়-চক্রবর্ত্তীর কন্যা অলকমণিকে বিবাহ করেন। পিতামহের দুই পুত্র এবং চার কন্যা; ভোলানাথ, তাঁর বড, এবং পিতা, কনিষ্ঠ পুত্র।

পিতার অপেক্ষা এগার বছরের বড আমার জ্যাঠা ভোলানাথ, লেখাপড়া শিখিবার চেষ্টা কখন করেন নাই, নিরক্ষর হইয়া জীবন কাটাইয়াছিলেন। পিতা পড়িবার আগ্রহ অল্পবয়স হইতে প্রকাশ করেন। পিতামহের অবস্থা অত্যন্ত মন্দ, গ্রামের পাঠশালাও ঐ সময়ে উঠিয়া গেল, অন্য উপায় না দেখিয়া তিনি পিতাকে, এগার বছর বয়সে, পানিয়ার দুইক্রোশ দূরে, উত্তর শ্রীপুর গ্রামে, একজন আত্মীয় গোবিন্দচন্দ্র রায়ের বাড়িতে শিক্ষার জন্য রাখিয়া আসিলেন। ঐ এগার বছর বয়সে বাড়ি ছাড়িয়া, মৃত্যু পর্য্যন্ত পিতা কখন একটানা দুইমাস পানিয়ার বাড়িতে কাটান নাই। কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে তিনি বলিয়াছেন, গোবিন্দের স্ত্রী তাঁকে এত যত্ন করিতেন, কোন ভাইকে বোনের নিকট ঐরূপ যত্ন পাইতে দেখেন নাই।

গোবিন্দের কাকা দিগম্বর, কলিকাতায় আলিপুরে মোক্তারি করিতেন। পড়ায় পিতার আগ্রহ দেখিয়া, তিনি পিতাকে কলিকাতায় লইয়া আসিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া পিতা আলিপুরের একটি বাঙ্গালা স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। ইংরাজী পড়িবার তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, কিন্তু অর্থের অভাবে পারিলেন না। সকাল দশটা পর্য্যন্ত বাঙ্গলা স্কুলে পড়িতেন, দুপরে আহার করিয়া, আলিপুরের ফৌজদারি আদালতের সেরেস্তায় কাজ শিখিতে যাইতেন, এবং সুযোগ পাইলে, নকলের কাজ করিয়া দুই চারি আনা পয়সা রোজগার করিতেন।

আর কিছুকাল কলিকাতায় থাকিয়া পড়িতে পারিলে, সময়ে যথেষ্ঠ উপার্জ্জন করিতে পারিতেন, কিন্তু পিতার ভাগ্যে তাহা ঘটিল না। পনর বছর বয়সে, শকাব্দ ১৭৭৯ আষাঢ় সংক্রান্তিতে, পিতামহের মৃত্যু হইল। জ্যাঠা ভোলানাথ বাড়িতে বসিয়া দিন কাটাইতেন, কোমল বয়সে সংসারের ভার পিতার উপর পড়িল। রুগ্না পিতামহীর চিকিৎসার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া, পড়া ছাড়িয়া তিনি উপার্জ্জনের চেষ্টায় ঘুরিতে লাগিলেন। ঐ সময় হইতে, পঁচিশ বছর বয়স পর্য্যন্ত, অসমসাহসে দুরবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া পিতা সংসার চালাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সৎভাবে রোজগারের সুবিধা আছে দেখিতে পাইলে, কোন কাজ হেয় মনে না করিয়া, তখনই তাহা করিতেন। পাচকের, এমন কি মজুরদের সর্দ্দারের কাজও, কিছুদিনের জন্য, করিয়াছিলেন। মনে হয়, রোগাক্রান্তা পিতামহীর ক্লিষ্ট ছবি তাঁর হৃদয়ে সৎসাহস জাগাইয়া রাখিত।

কয়েক বছর অত্যন্ত কষ্টে দিন কাটাইয়া, উনিশ বছর বয়সে, ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে, তিনি চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত বসিরহাট মুন্সেফ্ কোর্টের উকিল, বেঁওকাটি নিবাসী ঈশ্বরচন্দ্র সরকারের সংসর্গে আসেন। পিতাকে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর কেরানীর কাজে নিযুক্ত করিলেন। মহৎহৃদয়ের অধিকারী ঈশ্বরচন্দ্র পিতার কাজে সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁকে যত্ন করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের স্ত্রী স্নেহময়ী রমণী ছিলেন, তিনিও পিতাকে স্নেহের চোখে দেখিতে লাগিলেন।

কিছুদিন ঈশ্বরচন্দ্রের কেরানীর কাজ করিবার পর, সুযোগ আছে দেখিয়া, বসিরহাট ডেপুটি কালেক্টারের আদালতে, অনুমতি লইয়া, তিনি মোক্তারি আরম্ভ করিলেন। ঐ সময়ের মধ্যে, আইন সম্বন্ধে তিনি কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, এবং তখন পাশ না করিলেও যোগ্য ব্যক্তিকে মোক্তারি করিতে অনুমতি দেওয়া হইত। কয়েক বছর পরে, ঐ নিয়মের পরিবর্ত্তন হইল—পাশ না করিলে মোক্তারি করিতে দেওয়া হইবে না। তখন তিনি

কলিকাতায় আসিয়া মোক্তারি পরীক্ষার জন্য পড়িতে লাগিলেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে মোক্তারি পরীক্ষা দিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ঐ বছর মোক্তারি পাশ করিতে পারিলে, দূর প্রবাসে তাঁর যাইবার কথা উঠিত না।

অল্পবয়সে, অত্যধিক পরিশ্রম করিয়া এবং অনিয়মে দিন কাটাইতে বাধ্য হইয়া, পিতার অত্যন্ত স্বাস্থ্যের হানি হইল। মোক্তারি পরীক্ষা দিবার কিছুদিন পরে, রোগাক্রান্ত হইয়া ছয়মাস শয্যাশায়ী হইয়া রহিলেন। সুস্থ হইবার পর, নিজের কপর্দ্দকশূন্য অবস্থা দেখিয়া অস্থির হইলেন। তখনকার মত মোক্তারি পরীক্ষা পুনরায় দিবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া, কোন কাজে নিযুক্ত হইবার চেষ্টা করিলেন। শীঘ্র এক অদ্ভুত সুযোগ আসিল। ঈশ্বরচন্দ্রের দ্বারা, তিনি টাকীর বিখ্যাত জমিদার রায় কালীনাথ চৌধুরীর দেওয়ানের সঙ্গে পরিচিত হইলেন। তাঁর নিকট শুনিলেন, অনেক টাকার মোকদ্দমার কাজের জন্য, জমিদারের তরফ হইতে, একজন বিশ্বাসী লোককে কটকে পাঠান দরকার। কটকের নাম শুনিয়া সকলে অত্যন্ত ভীত হইল, কিন্তু পিতা এরূপ অর্থকষ্টে দিন কাটাইতেছিলেন, ইতস্তত না করিয়া কটকে যাইবেন, স্থির করিলেন। রায় মথুরানাথ চৌধুরীর দুই পোষ্যপুত্রের পক্ষ হইতে, তিনি কটকের কাজের জন্য আমোক্তার নিযুক্ত হইলেন। স্থির হইল, কাজের শেষে, কটক হইতে ফিরিয়া আসিবেন, আসিবার খরচও তাঁকে দেওয়া হইল।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে, পঁচিশ বছর বয়সে, উদ্ধব নামে একজন লাঠিয়াল সঙ্গে লইয়া, তিনি উড়িষ্যার জন্য রওনা হইলেন। সঙ্গে একজন লাঠিয়াল লইবার বিশেষ কারণ ছিল। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যায় যাইবার রেলের পথ হইয়াছে; তার পূর্ব্বে, কলিকাতা হইতে কটক যাইতে, চারিদিন লাগিত; কতক রাস্তা সমুদ্রপথে জাহাজে, বাকি পথ ছোট ষ্টীমারে যাইতে হইত। পিতা যখন উড়িষ্যার জন্য যাত্রা করেন, তখন জাহাজ কিংবা ষ্টীমার চলিত না, গরুর গাড়ি অথবা পালকি করিয়া, কিংবা হাঁটিয়া, কটকে যাইতে হইত। পুরীর জগন্নাথ দেব, বহুকাল হইতে বিষ্ণুভক্তদের আকর্ষণ করিয়াছেন, কিন্তু জাহাজের পথ হইবার আগে এরূপ দস্যুভয় ছিল, তীর্থযাত্রীকে প্রাণ হাতে লইয়া যাইতে হইত। দস্যুদের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইলেও, ওলাউঠা রোগে বহু তীর্থযাত্রীর মৃত্যু হইত। শুনিয়াছি ধনী লোকেরা,

পুরী যাইবার সময় উইল করিয়া বাহির হইত। পিতার সঙ্গে, যাতায়াতের খরচ ছাড়া, জমিদারের কাজের জন্যও অনেক টাকা ছিল।

অর্থের অভাবে, কলিকাতা হইতে কটক পর্য্যন্ত সমস্ত পথ তাঁকে হাঁটিয়া যাইতে হইয়াছিল। সরলভাবে তিনি স্বীকার করিয়াছেন, আমোক্তার নিযুক্ত হইবার পরেও, কটকে যাইতে কত সময় লাগে এবং পথ কিরূপ, সে সম্বন্ধে কোন ধারণা তাঁর ছিল না, নতুবা কখনই কটকে যাইতে সম্মত হইতেন না। কখন পাহাড়ের বন্ধুর পথে, কখন শুষ্ক নদীর তপ্তবালির উপর দিয়া, কখন বা নিবিড় অরণ্যের মধ্যে কেবল দিক লক্ষ্য করিয়া, পথিককে হাঁটিতে হইত। পান্থশালার অধিকারীকে, দস্যুর সাহায্যকারী সন্দেহ করিলে, অনশনে রাস্তা হাঁটিয়া দিন কাটাইতে হইত। ঐরূপভাবে হাঁটিয়া, কলিকাতা হইতে কটকে আসিতে, পঁচিশ দিনের কম সময় লাগিত না। জমিদারের কাজ শেষ হইবার পর, তিনি যে স্বদেশে ফিরিয়া আসিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই, দুর্গম পথ তার একটি কারণ। সেকালে, অনেকে ঐ কারণে, কটকে যাইয়া আটক থাকিয়া গিয়াছে।

পিতা দেখিতে সুপুরুষ ছিলেন এবং তাঁর প্রকৃতি অমায়িক ছিল। তাঁর সরল কথা কহিবার ধরণে সকলে প্রীত হইত। কটকের সরকারি উকিল তখন বর্দ্ধমান জেলা নিবাসী একজন বাঙ্গালী, দীননাথ সরকার, ছিলেন। জমিদারের কাজের জন্য গিয়া, তিনি দীননাথের স্নেহ-দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। দীননাথ যেরূপ বিদ্বান এবং বুদ্ধিমান ছিলেন, অন্তঃকরণ তাঁর সেইরূপ উদার ছিল। অল্প সময়ের মধ্যে, পিতার প্রতি দীননাথের মনের ভাব এরূপ হইল, যদি তিনি কটকে থাকিতে ইচ্ছা করেন, তাঁর ভবিষ্যৎ উন্নতির ভার লইবেন, প্রকাশ করিলেন। দীননাথের স্নেহ প্রদর্শনে পিতা দুর্গম পথের বিভীষিকা ভুলিয়া গেলেন, জমিদারের কাজ শেষ হইবার পর কটকে থাকিবেন, স্থির করিলেন। নিজের বৃহৎ অট্টালিকায়, তাঁর থাকিবার স্থান দীননাথ নির্দ্দেশ করিলেন, এবং পুত্রের ন্যায় তাঁকে যত্ন করিতে লাগিলেন।

দীননাথের সাহায্যে পিতার কষ্টের অবসান হইল। শীঘ্র মোক্তারি পাশ করিয়া, কটকে তিনি মোক্তারি করিতে লাগিলেন, এবং অল্প সময়ের মধ্যে পসার হইল। তাঁর যে সব গুণ ছিল, স্বচ্ছন্দতার সুবাতাসে সেগুলি বিকশিত হইয়া উঠিল। সর্ব্বাপেক্ষা তিনি নির্ভীক এবং স্বাধীনতা প্রিয়

ছিলেন। কটকে একজন সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ আসিলেন, যাঁর জারি-জুরিতে মোক্তারেরা শশব্যস্ত হইল। একদিন ঐ ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ পিতাকে অযথা অপমানসূচক কথা বলিলেন। তিনি নির্ভীকভাবে তার প্রতিবাদ কবিলেন, এবং প্রতিজ্ঞা কবিলেন, ঐ অভদ্র হাকিমেব কোর্টে তিনি আর যাইবেন না।

মোক্তাব হইয়া জেলাব ম্যাজিষ্ট্রেটেব বিবাগভাজন হইয়াছেন, তাঁব ভবিষ্যতের জন্য অনেকেব মনে আশঙ্কা হইল, তিনি কিন্তু বিচলিত না হইয়া, বিষযটি অন্য একদিক হইতে চিন্তা কবিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, প্রতিপদে যে মোক্তারকে লাঞ্ছিত কবিতে কেহ দ্বিধা কবে না, ঐ মোক্তাবেব কাজ তিনি আব কবিবেন না, উকিল হইযা সম্মানেব সহিত অর্থোপার্জ্জন করিতে চেষ্টা কবিবেন। তখন নিম্ন শ্রেণীব ওকালতি পবীক্ষাব জন্য, খুব কমে, ছাত্রবৃত্তি পাশেব দবকাব ছিল। পিতা ছাত্রবৃত্তি পাশ কবেন নাই। কটকে ছাত্রবৃত্তি পবীক্ষা উডিযা ভাষায় দিবাব নিয়ম ছিল। কিছু-মাত্র ভগ্নোৎসাহ না হইযা, ছাত্রবৃত্তি পবীক্ষা দিবেন স্থিব কবিলেন, এবং বালকদেব সঙ্গে বসিযা পবীক্ষা দিযা, উডিযা ছাত্রবৃত্তি পাশ কবিলেন। তাবপব, বাঙ্গালায ওকালতি পবীক্ষা দিবাব জন্য প্রস্তুত হইলেন। বত্রিশ বছব বযসে, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে, ওকালতি পাশ কবিযা, কটকে তিনি ওকালতি আরম্ভ করিলেন। পবেব বছব হইতে, বাঙ্গালা ভাষায় ওকালতি পবীক্ষা গ্রহণের নিয়ম উঠিযা গেল।

কয়েক বছবের মধ্যে, তিনি মুন্সেফ্‌ কোর্টের শ্রেষ্ঠ উকিল হইলেন এবং প্রচুব অর্থোপার্জ্জন কবিতে লাগিলেন। তাঁর মোকদ্দমাব সংখ্যা এত বেশি ছিল, স্থির হইযা উকিলখানায় বসিয়া তামাক খাইবার অবসব পাইতেন না, মুন্সেফ্‌ কোর্টেব সেবেস্তার একটি স্থানে বসিয়া তামাক খাইতেন। মুন্সেফ্‌রা তাহা জানিতেন, কিন্তু কেহ কখন আপত্তি কবেন নাই। তাঁর স্মরণশক্তি প্রখর ছিল, কোন মোকদ্দমার বিষয় কাগজে টুকিতেন না, একের পর এক মোকদ্দমা উঠিলে, সব বিষয়ের নির্ভুল বর্ণনা করিযা, জেরা কিংবা বক্তৃতা করিতেন। বত্রিশ বছর সুখ্যাতির সহিত ওকালতি করিয়া, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে, চৌবট্টি বছর বয়সে, তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যু পর্য্যন্ত, কটক উকিল-সম্প্রদায়ের, তিনি সহকারী সম্পাদক এবং [illegible] ছিলেন, এবং তাঁর বন্ধে, গঞ্জামিক পুকুরের ধারে, [illegible]

পিতা পার্ব্বতীচরণ চক্রবর্ত্তী

হইযাছিল। তাঁর মৃত্যুতে মধ্যবৃত্ত এবং গরিব মক্কেলেরা সর্ব্বাপেক্ষা বেশি দুঃখিত হইয়াছিল, কারণ পীড়ন করিয়া তিনি কাহারও নিকট অর্থ লইতেন না।

পিতা, টাকী নিবাসী মথুবানাথ চট্টোপাধ্যায়-চক্রবর্ত্তীর তৃতীযা কন্যা কমলবাসিনীকে বিবাহ কবেন। কটকে মোক্তার হইবার পব, অপেক্ষাকৃত বেশি বযসে তাঁর বিবাহ হয। জ্যাঠা ভোলানাথ, যদিও কখন উপার্জ্জন কবেন নাই, আজীবন পিতা তাঁব সঙ্গে একান্নে ছিলেন। পানিযাব বাড়ি, পিতামহী এবং জ্যাঠাব ব্যবহাবের জন্য প্রস্তুত কবেন। বড ভাইযেব প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা আদর্শ-স্থানীয। ভোলানাথের প্রকৃতি অত্যন্ত খোলা ছিল, কিন্তু বিবেচনাপূর্ব্বক কাজ কবিবাব ক্ষমতা সেরূপ ছিল না। পানিযার নিকট, পিতা কয়েকটি তালুক কিনিযাছিলেন। দেশে, পূজাব সমযে, কেবল কয়েক দিন কাটাইতে পারিতেন, বাকি সময কটকে থাকিতে হইত। তালুকগুলিব কাজের ভার নাযেবের উপর থাকিত, কিন্তু ভোলানাথ সুবিধা পাইলে প্রজাদের উপব জুলুম করিতেন। একবার বেশি পীডনের কথা কানে উঠিলে, পিতা কেবল বলিযাছিলেন, "দাদাকে বল, প্রজাদের কষ্ট না দিয়ে, বিষয় বিক্রী করে ফেলুন।" ভোলানাথেরও সহোদরগত প্রাণ ছিল। পিতার মৃত্যু কটকে হইয়াছিল, তাঁহাব মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া, বালকের মত কাঁদিযা, ভাইয়ের মৃত্যু-দৃশ্য দেখিতে পারিবেন না, সেজন্য ভোলানাথ পানিয়ায় চলিয়া যান। ভোলানাথের কোন সন্তান হয় নাই।

অনেক টাকা খবচ করিয়া, কটকের সংসারের সকলকে সঙ্গে লইয়া, পিতা প্রত্যেক পূজার সময়ে, পিতামহীকে দেখিবার জন্য দেশে যাইতেন। শেষ বযসে, পিতামহী হাঁটিতে পাবিতেন না, এবং তাঁর মাথার রোগ ছিল; সমুদ্রপথে, দূরস্থান কটকে, তাঁকে আনিতে পিতা সাহস করেন নাই। শকাব্দ ১৮০৩ অগ্রহায়ণ মাসে, পানিয়ায় আমার পিতামহীর মৃত্যু হয়।

যাঁদের দ্বারা পিতা প্রথম জীবনে উপকৃত হইয়াছিলেন, যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, অর্থ সাহায্য এবং অন্য প্রকারে, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে ভুলেন নাই। আত্মীয়-স্বজনকেও সাহায্য করিতেন। তাঁর জ্যাঠা গঙ্গানারায়ণের চার ছেলের মধ্যে, একজন ছাড়া অন্য তিন জনের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। ঐ তিন জনের প্রত্যেকের একটি ছেলেকে, কটকের

বাড়িতে আনিয়া, যাহাতে সে উপার্জ্জন করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাইতে পারে, তার উপায় করিয়া দিয়াছিলেন।

তাঁর ধর্ম্ম-বিশ্বাস সরল ছিল। ওকালতি করিয়া দিন কাটাইতেন, দেশ-বিদেশে বেড়াইবার আগ্রহ কখন প্রকাশ করেন নাই। মৃত্যুর কয়েক বছর আগে, পূজার ছুটির সময়ে, তাঁকে একদিন বলিলাম, "আপনি যদি ইচ্ছা করেন, পশ্চিমের তীর্থস্থানগুলি বেড়িয়ে আস্‌তে পাবেন, আমি বাড়ীতে থাক্‌বো।" আমি তখন উকিল হইয়াছি, প্রস্তাবটা যোগ্য ছেলের মত হইল ভাবিয়া, মনে কিছু প্রসন্নতা লাভ করিলাম। পিতা ধীর-ভাবে উত্তর দিলেন, "বাবা, তুমি কি মনে কর, ঈশ্বরকে পাবার জন্য, স্থানবিশেষে যাবার দরকার?" তাঁর উত্তর শুনিয়া আমার অহমিকা চূর্ণ হইল!

আমার মাতার মৃত্যু ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে কটকে হইয়াছে। জ্যাঠা এবং জ্যাঠাইকে, বৃদ্ধ বয়সে কটকের বাড়িতে আনা হইয়াছিল। তাঁরা কটকে দেহত্যাগ করিয়াছেন; জ্যাঠা ভোলানাথের মৃত্যু ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে এবং জ্যাঠাই মুক্তমণির মৃত্যু ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাল্যকাল

পিতামাতার আমি প্রথম সন্তান। ১৭৯৯ শকাব্দে কটকে আমি জন্মগ্রহণ করি। আমার পর, চার ভাই এবং ছয় বোনের জন্ম হয়। তাদের মধ্যে এক ভাই ও এক বোনের শৈশবে মৃত্যু হইয়াছে।

বাল্যকালের কথা স্মরণ হইলে হৃদয় বিষাদে পরিপূর্ণ হয়। বড় হইয়া যেভাবে জীবন কাটাইয়াছি, তার তুলনায় বাল্যজীবন এত পঙ্কিল, নিজেই বিস্মিত হই, বাল্যকাল কি আমার ঐভাবে কাটাইবার কথা!

পিতাকে অত্যন্ত খাটিতে হইত। দুপর এবং বৈকাল, কোর্টে কাজ করিবার পর, বাড়িতে সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দশটা, এবং সকাল হইতে বেলা দশটা পর্য্যন্ত, ঘরপোরা মক্কেল লইয়া তিনি ব্যস্ত থাকিতেন। তথাপি, ছোট ছেলেদের সঙ্গে কথা কহিবার অবসরের অভাব তাঁর ছিল না। কিন্তু তিনি পুরাতন রীতির অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। পিতার সঙ্গে বেশি কথা কহিবার ইচ্ছা রোধ করিয়া, দূরে থাকিয়া তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করিলে, ছেলের কর্ত্তব্য, এবং গম্ভীর ভাবে ছেলের সঙ্গে অত্যন্ত আবশ্যক কয়েকটি কথা কহিয়া, তার মনে সম্ভ্রমের ভাব উদ্রেক করিতে পারিলে, পিতার কাজ সম্পন্ন হইল, এই রীতির তখন অধিক চলন ছিল। ইহার ফল, আমার "শ্রমিকের ছেলে" উপন্যাসে, কপিল পণ্ডিতের ছেলে মহেশের চরিত্রে, দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। খুব বেশি প্রয়োজন না হইলে পিতা আমাদের সঙ্গে কথা কহিতেন না। পিতার মৃত্যু পর্য্যন্ত আমার মনে পড়ে না, কোন এক সময়ে, দুই তিন মিনিটের বেশি তাঁর সঙ্গে আমার কথা হইয়াছে, তাও হপ্তায় একবারের অধিক নয়। তিনি যেরূপ উচ্চ-হৃদয়ের লোক ছিলেন, এবং হিতাহিত জ্ঞান হইবার পর, উন্নত জীবন কাটাইবার আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে যেরূপ স্থান পাইয়াছিল, সব বিষয়ে তাঁর উপদেশের সাহায্য পাইলে খুবই উপকৃত হইতাম। আর কিছু না হউক, কিশোর বয়সের মূল্যবান সময় নষ্ট করিবার ইচ্ছা প্রবল হইত না, এবং মন্দ সঙ্গীদের প্রভাব হইতে নিশ্চয়ই নিষ্কৃতি পাইতাম।

আমি বলিতে চাই না, যত্ন লইলেই বালকের চরিত্রগঠনে অভিভাবক কৃতকার্য্য হইয়া থাকে। চেষ্টার ফল কখন হয়, কখন বা হয় না, অনেক সময়ে

তাহা বালকের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে, কিন্তু কুসঙ্গ হইতে রক্ষা করিবার জন্য, বালকের উপর প্রখর দৃষ্টি রাখা অভিভাবকের খুবই উচিত, শেষ-ফল যাহাই হউক। হিতাহিত জ্ঞান হইবার পূর্ব্বে, বালক কেবল অন্ধ অনুকরণ করিয়া অগ্রসর হয়, সেজন্য অভিভাবকের দায়িত্ব অত্যন্ত বেশি। অর্থব্যয় করিয়া শিক্ষক রাখিয়া অনেকে ভাবিয়া থাকে, বালক পুত্রের প্রতি কর্ত্তব্যপালন করা হইল, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। আগেকার গুরুর নিকট শিক্ষা, এবং আধুনিক শিক্ষকের নিকট পড়া, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য যেরূপ বেশি, ফল সেইরূপ শোচনীয়। পূর্ব্বে, নীতি ও ধর্ম্ম, শিক্ষার প্রধান অঙ্গ ছিল, এখন শিক্ষক কেবল মস্তিষ্কের গতি প্রখর করিতে পারিলে, তার দায়িত্ব শেষ হইয়াছে, মনে করে। অতএব, কোমলমতি বালকের চরিত্রগঠন, আধুনিক শিক্ষকের দ্বারা হয় না, তার ভার একমাত্র মঙ্গলকামী অভিভাবককে লইতে হয়।

আমার পাঁচ বছর বয়স হইতে, পড়াইবার জন্য পিতা শিক্ষক রাখিয়াছিলেন, কিন্তু অনেক সময়ে শিক্ষক নির্ব্বাচন ভাল হয় নাই। ঐ অল্প বয়সে, আমাকে সকাল-সন্ধ্যা পড়িতে হইত। খুব সম্ভব, শিক্ষকের ব্যবহারের জন্য, তখন পড়ার নাম করিলেই আমার অত্যন্ত ভয় হইত। একজন শিক্ষক, যাঁর বিদ্যা স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর বেশি নিশ্চয় নয়, একদিন আমাকে এরূপ নির্দ্দয়ভাবে বেত্রাঘাত করেন, আমি কাপড়ে মূত্রত্যাগ করিয়া ফেলি। কিছুদিনের জন্য, পাড়ার একজন লোক শিক্ষক ছিলেন, তিনি রাত্রে মদ খাইয়া রাস্তায় হল্লা করিতেন, এবং বাড়ি ফিরিয়া আসিলে, কত কলসী জল তাঁর মাথায় ঢালিয়া প্রকৃতিস্থ করা হইত, তার গল্প পরদিন সকালে শুনিতাম। বাড়িতে দিবারাত্রি থাকিয়া যে দুইজন শিক্ষক পড়াইয়াছিলেন, একজনের চরিত্র অতি জঘন্য, এবং অন্যজন মাতাল ছিলেন। বাল্যকালের কেবল দুইজন শিক্ষকের কথা মনে হইলে হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদয় হয়, কিন্তু তাঁরা অল্প সময়ের জন্য, স্থায়ী শিক্ষকের অনুপস্থিত কালে পড়াইয়াছিলেন। একজনের নাম চন্দ্রমোহন মহারাণা, অপরের নাম রাঘবানন্দ দাস। চন্দ্রমোহন বালেশ্বর জেলার লোক, সময়ে সরকারি জেলা স্কুল এবং কটক নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক হইয়া সুখ্যাতি লাভ করেন। রাঘবানন্দের বাড়ি পুরী জেলায়, তিনি সবডেপুটি হইয়াছিলেন; কটকের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল, আমার বন্ধু বিচিত্রানন্দ, এবং দেশের কাজে সুপরিচিত বি, দাসের তিনি জ্যেষ্ঠ সহোদর।

বাল্যকালের সঙ্গীদের মধ্যে দুইজনের কথা খুবই মনে আছে। একজন পাড়ায় থাকিত, অন্যজন স্কুলে আমার সঙ্গে পড়িত। উভয়ে স্কুলের চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়া শিক্ষা-জীবন শেষ করে। পাড়ার বন্ধু গরিবের ছেলে। এমন কোন মন্দ কাজ নাই, যাহা সে ঐ অল্প বয়সে অভ্যাস করে নাই। সে কলিকায় তামাক সাজিয়া, হুঁকার অভাবে হাতে টানিয়া খাইত। আমি তাকে অনুকরণ করিয়া, বার কয়েক ঐ ভাবে তামাক খাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু তেমন সুবিধা করিতে না পারিয়া, একদিন পিতার গড়গড়ার শটকা মুখে লইয়া তামাকের আস্বাদ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করি। বার দুই টানিয়া এরূপ বিষম খাইলাম, তামাক খাওয়ার উপর আমার খুবই অভক্তি হইল। সেদিন হইতে তামাক খাইবার জন্য আর আগ্রহ প্রকাশ করি নাই, কিংবা জীবনে কখনও তামাক খাই নাই।

পাড়ার বন্ধু আমাকে তামাক ধরাইবার চেষ্টায় বিফল হইয়া, শীঘ্র তার অভ্যস্থ আর একটি বিদ্যা কিছুদিনের জন্য দান করিতে পারিয়াছিল, তাহা হইতেছে সিদ্ধি খাওয়া। আমাদের বয়স তখন এত কম—দশ বছরের বেশি হইবে না—প্রচলিত ধরণে, বিবিধ সরঞ্জামের সহিত, সিদ্ধি প্রস্তুত করিয়া খাওয়া সম্ভব ছিল না। আমার বন্ধু একটি সহজ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিল। তখন কটকের চৌধুরী বাজারে 'মাজুম' নামে একপ্রকার মাদক দ্রব্য বিক্রয় হইত। এক টাকা হইতে আধপয়সা পর্য্যন্ত 'মাজুম' কিনিতে পাওয়া যাইত। 'মাজুম' সিদ্ধির বরফি, চিনির পাকে প্রস্তুত, খাইতে লাগিত ভাল। বন্ধুটি একদিন 'মাজুম' আনিয়া দেখাইল, এবং এরূপ হাত ঘুরাইয়া, মাথা নাড়িয়া, তার মজাদারি গুণের বর্ণনা করিল, পরীক্ষা না করিয়া বন্ধুতা বজায় রাখা সম্ভব হইল না। একদিন ঐ 'মাজুম' খাইয়া, সন্ধ্যার পর ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। মাতা ডাকিয়া ঘুম ভাঙ্গাইতে না পারিয়া, বিছানা হইতে আমাকে তুলিয়া লইয়া আহার করিতে অনিচ্ছুক দেখিয়া, খাওয়াইয়া দিলেন। খাইবার সময়ে, আমাকে ঢলিয়া পড়িতে দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন "তুই কি কিছু খেয়েচিস্?" আমি অত্যন্ত ভয় পাইয়া, কিছুই উত্তর দিতে পারিলাম না, মাতাও আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই।

পাড়ার সঙ্গীর মত, আমার স্কুলের সহপাঠীর উচ্ছৃঙ্খল দৃষ্টান্তও বাল্যজীবনে নীতি সম্বন্ধে ধারণা পরিস্ফুট হইতে দেয় নাই। ঐ সহপাঠী পিতার একজন অবস্থাপন্ন উকিল-বন্ধুর ছেলে। অল্পবয়সে কুসঙ্গে পড়িয়া নানাবিধ মাদক

দ্রব্যের অধীন এবং কুকাজে প্রবৃত্ত হইতে শিখিয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে, সে আমার অপেক্ষা বয়সে বড ছিল, এবং তাকে অনুকরণ করিবার বয়স হইবার পূর্ব্বে, চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়া, লেখাপডা সাঙ্গ করে।

এই দুই বন্ধু ছাডা, ঐ বয়সে, অল্পদিনের জন্য আর একটা কুৎসিত বন্ধু জুটিয়াছিল। সেও আমার অপেক্ষা বয়সে বড। তার মাতার অনুরোধে, পিতা তাকে আমাদের বাডির শিক্ষকেব নিকট পডিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। সে অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীব লোকের ছেলে। অল্পবয়সে তার বিবাহ হয়। আমার বয়স তখন এগার বছরের বেশি নয়। ঐ বন্ধুব নিকট, তার বৈবাহিক জীবনের গল্প, এবং আমাব বয়সের পক্ষে অদ্ভুত সংবাদ, পাডার একটি বালিকার সহিত তার অবৈধ প্রণয়ের কথা শুনিতাম।

ঘরে বাহিবে সমানভাবে দুর্নীতির অভিনয় চলিয়াছিল। বাড়িতে চাকরের সংখ্যা কম ছিল না, কিন্তু প্রায সব চাকরগুলির প্রকৃতি খারাপ ছিল। বাড়ির পাচক জুটিত অশ্লীল প্রকৃতির। একজন পাচক, রাত্রে পাকের কাজ শেষ করিয়া, বাডি হইতে বাহির হইয়া, সমস্ত রাত্রি হুটপাটি করিয়া, প্রভাতে ফিরিয়া আসিত। একজন পাচক, অনেকদিন আমাদের বাড়িতে ছিল, সে বাহিরে দেখিতে খুব ভালমানুষ, কিন্তু স্বভাব ছিল অত্যন্ত খারাপ। তার অশ্লীল গল্পেব ভাণ্ডার ছিল অফুরন্ত। পিতামাতার সঙ্গে সময় কাটাইবার অভ্যাস ছিল না, চাকরদের কাছে অনেক সময়ে থাকিতাম। সেই পাচকের কাছে বসিয়া অশ্লীল গল্প শুনিতাম।

বাল্যজীবনের দুটি ঘটনা, স্মৃতিপটে চিরদিনের জন্য আঁকা রহিয়াছে। আমার বয়স তখন বার বছর পূর্ণ হয় নাই। প্রথম ঘটনা, একজন বাঙ্গালী সন্ন্যাসী ও একজন প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর সহিত সংশ্লিষ্ট। সন্ন্যাসীর বয়স, পঁয়ত্রিশের বেশি নয়, রঙ্গ গৌরবর্ণ, গঠন সুন্দর। বোধ হয়, পুরী যাইবার পথে, কটকে পিতার অতিথি হইয়াছিল। সে সুন্দর গাইতে পারিত। অল্পবয়স হইতে আমি সঙ্গীতপ্রিয়, তার গান খুব ভাল লাগিত। প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী, টাকী নিবাসী পিতার পরিচিত একজন ভদ্রলোকের ছেলে, পুরী হইতে কটকে পরীক্ষা দিবার জন্য আমাদের বাড়িতে আসিয়া উঠিয়াছিল। যেদিন তার পরীক্ষা শেষ হইল, সে ও সন্ন্যাসী, সন্ধ্যার পর, চৌধুরী বাজারে মিশ্রের হোটেলে আহার করিতে যাইবে, শুনিলাম। তারা আমাকে নিমন্ত্রণ করিল। তখন আমাদের বাড়িতে, পেঁয়াজ ও বৃথা মাংসের প্রবেশ

নিষেধ ছিল, কিন্তু পাড়ার একজন "কাকার" প্রসাদে, হোটেলের সুমধুর ভোজনে আমি দীক্ষিত হইয়াছিলাম। পেঁয়াজের সুগন্ধে উদ্ভাসিত নয়নাভিরাম কাট্‌লেটের কথা স্মরণ করিয়া, আগ্রহের সহিত নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম, এবং কেহ জানিতে না পারে, কেবল কোঁচার কাপড খুলিয়া গায়ে দিয়া, হোটেলে যথাসময়ে উপস্থিত হইলাম। আহারে বসিবার কিছুক্ষণ পরে, হোটেলের ব্রাহ্মণ, মদের একটি বোতল এবং কাঁচের ছোট একটি গেলাস, সন্ন্যাসীব সম্মুখে রাখিল। আমি একবার ঐ বোতলের দিকে এবং একবার সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম। বারকয়েক মদিরা সেবনের পর, সন্ন্যাসী, অল্প মদ গেলাসে ঢালিয়া এবং কিছু জল মিশাইয়া, আমার হাত ধরিয়া তাহা খাইতে অনুরোধ করিল। কেন যে গেলাসের মদ খাইবার তীব্র অনিচ্ছা হইল, বলিতে পারি না, খাইব না দৃঢস্বরে বলিলাম। সন্ন্যাসী এবং পরীক্ষার্থী বুঝাইতে লাগিল, অল্প খাইলে কোন দোষ ত নাই, মনে বেশ আনন্দ পাওয়া যায, তথাপি খাইতে রাজি হইলাম না। অবশেষে, তারা আমাকে জিব দিয়া জিনিষটা কিরূপ একবার আস্বাদ করিয়া দেখিতে পীড়াপীড়ি কবিল। আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম, এবং হঠাৎ আহারের স্থান হইতে উঠিয়া, ছুটিয়া হোটেল ত্যাগ করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম। কিছুক্ষণ পরে সন্ন্যাসী এবং সেই যুবক আমাদের বাড়িতে আসিল। তাদের ভয় হইয়াছিল, কথাটা আমি পিতার কাণে তুলিব। আমি অঙ্গীকার করিলাম, তাঁকে কিছুই বলিব না।

অপর ঘটনার নায়ককে আমি 'কাকা' সম্বোধন করিতাম। তিনি কায়স্থ, পিতা তাঁকে ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ করিতেন। যে কাকার প্রসাদে হোটেলে খাইতে শিখিয়াছিলাম, তিনি সেই কাকা। কাকা অসংখ্যবার প্রবেশিকা সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হইয়া, পড়া শেষ করিয়াছিলেন। মাংস খাওয়ার লোভে আমি কাকার খুবই স্নেহাধীন হইয়াছিলাম। একদিন কোন এক কাজে বাহির হইবার সময়ে, তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। কয়েকস্থান ঘুরিবার পর সন্ধ্যা হইল, শ্রদ্ধেয় কাকা হোটেলে যাইবার কথা তুলিলেন না দেখিয়া মনটা খারাপ হইয়া আসিতেছিল, এরূপ সময়ে তিনি হঠাৎ বলিলেন, "আয় রে বাবা, তোর কাকীকে দেখিয়ে নিয়ে আসি।" কাকা বিবাহ করিয়াছিলেন কি না, ঠিক জানিতাম না, তবে তার পূর্ব্বে তাঁর স্ত্রীর কথা কখন উল্লিখিত শুনি নাই। বেশি কিছু ভাবিবার আগে,

তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া পথের ধারে একটি বাড়িতে প্রবেশ করিলেন, এবং একটি যুবতীকে দেখাইয়া অল্প হাসিয়া বলিলেন, 'ঐ তোর কাকী'। যুবতীটি বেশ্যা, আমার শুভানুধ্যায়ী কাকা, স্নেহের ভ্রাতুষ্পুত্রকে লইয়া তাঁর রক্ষিতা বেশ্যার বাড়িতে ঢুকিয়াছিলেন! আমাকে কিছু গম্ভীরভাব ধারণ করিতে দেখিয়া, স্ত্রীলোকটির সঙ্গে কয়েকটিমাত্র কথা কহিয়া, কাকা আমাকে লইয়া সেস্থান ত্যাগ করিলেন।

ঐ সময়েব মধ্যে, ধীরে ধীরে পড়ার দফা রফা হইয়া আসিল। দুষ্ট বালক বলিয়া খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল। আট বছর বয়সে রাভেন্সা কলেজিয়েট্ স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছিলাম, বছরের শেষে কোন রকমে উপরের ক্লাশে উঠিতে পারিতাম, কিন্তু বার বছর বয়সে, তৃতীয় শ্রেণীতে উঠিয়া পড়ায় এত অবহেলা করিলাম, সেবার ক্লাশে উঠিতে পারিলাম না। বাল্যকালের বিদ্যাভ্যাস এইভাবে শেষ হইল।

বাল্য-জীবনের কিন্তু আর একটি দিক আছে, যার সম্বন্ধে কিছু না বলিলে, ঐ প্রসঙ্গ শেষ করা যায় না। প্রবাদে যেরূপ আছে, এমন কোন মেঘ দেখা যায় না, যার একধারে রূপাব রেখা নাই, সেইরূপ আমার পঙ্কিল বাল্যজীবনের একদিকে এরূপ একটি শুভ্র আভা পড়িয়াছিল, যার স্মৃতি এ বয়সেও হৃদয়ে বিমল আনন্দ দিয়া থাকে। কিশোর বয়সে, পূজার সময় নিকট হইয়া আসিলে, মন আনন্দে নাচিত। পিতার কোর্ট পূজার জন্য একমাস বন্ধ থাকিত। বন্ধ হইবার অনেক আগে, দেশে যাইবার আয়োজন হইত। এখনকার মত কটক হইতে কলিকাতায়, এবং কলিকাতা হইতে দেশে যাওয়া নয় যে, ঘণ্টা কয়েক পূর্ব্বে খানকতক কাপড় সুটকেশের মধ্যে পুরিলে, গোছ-গাছ করা হইল। তখন কটক হইতে কলিকাতায় আসিতে চারি দিন, এবং কলিকাতা হইতে দেশে পৌছিতে, আরও দুই দিন লাগিত। দেশে যাইবার সময় আসিলে, বাড়িতে হৈ চৈ পড়িত। কোন্ ঝি-চাকর সঙ্গে যাইবে, কোন্ বাক্স-তোরঙ্গগুলি লওয়া হইবে, জাহাজে এবং ষ্টীমারে ব্যবহারের জন্য মিষ্টান্ন ও অন্য আহার্য্য কত দরকার, এইরূপ নানাবিধ বিষয়ের জল্পনা, অনেক আগে আরম্ভ হইত। তখন কটক-জীবনের সব কথা ভুলিয়া, মন নিরবচ্ছিন্ন দেশের দিকে ছুটিত। প্রফুল্ল-হৃদয়ে প্রথম ভাবিতাম, যে সব জিনিষগুলি কটকে পাওয়া যায় না, তার আস্বাদ করিয়া, কতই না আনন্দ পাইব! সে জিনিষ-গুলির মধ্যে, প্রধান স্থান অধিকার করিত, খেজুরের গুড়, ঘি-ওয়ালা কাঁকড়া,

গল্লাচিংড়ি, ভেটকিমাছ, তালের আঁটির শাঁস, এবং সাঁচি পান। ছিপ লইয়া দেশে মাছ ধরার দৃশ্যও মনকে উল্লসিত করিত। তারপর ভাবিতাম, কেনালের পথে ষ্টীমারে, এবং সমুদ্রে জাহাজে যাইবার আমোদের কথা।

যিনি কলিকাতা হইতে কটকে আসিয়াছিলেন, সব পথ হাঁটিয়া, চটীর নোংরা মাদুর ব্যবহার করিয়া, এবং কদাচিৎ দুইবেলা হাতে পাক করিয়া খাইয়া, সেই পিতা, কটক হইতে আমাদের দেশে লইয়া যাইতেন মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিয়া, যতদূর সম্ভব স্বচ্ছন্দভাবে। আমরা ষ্টীমার এবং জাহাজে প্রথম শ্রেণীতে যাইতাম। আমার এক বোন দিনকতক ছাগলের দুধ খাইত; সেবার দেশে যাইবার সময়ে, কটক হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত, ষ্টীমারে এবং জাহাজে, একটি ছাগল আমাদের সঙ্গে গিয়াছিল।

পূজার সময়ে অনেকগুলি বাঙ্গালী উকিল, দল বাঁধিয়া কলিকাতার জন্য রওনা হইত। পথে সকলে মনের স্ফূর্ত্তিতে দিনগুলি কাটাইত। ষ্টীমার কটকের জোবরা-ঘাট হইতে ছাড়িলে, আমার আনন্দের সীমা থাকিত না। উড়িষ্যার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোহর। কটক হইতে চাঁদবালি, ষ্টীমারে যাইতে হইত। যারা ঐ পথে একবার গিয়াছে, তাবা স্বীকার করিবে, পথের দৃশ্য কত সুন্দর। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য আমাকে বাল্যকাল হইতে মুগ্ধ করিয়াছে। আমি কেবিনের ভিতরে না থাকিয়া, ডেকে বসিয়া অনিমেষনয়নে কেনালের চারিদিকের দৃশ্য দেখিতাম। লক্‌গুলি পার হইয়া ষ্টীমার যখন বড় নদীতে পড়িত, সে দৃশ্য দেখিতে আরও সুন্দর। গভীর রাত্রিতে, ডেকের উপর নিঃশব্দে আসিয়া, ষ্টীমারের গতিতে উত্থিত জলের কল্লোল শুনিতাম।

ষ্টীমারে একদিন কাটাইয়া চাঁদবালিতে আসিলে, আনন্দের নূতন এক অঙ্ক আরম্ভ হইত। ডাক-বাঙ্গলায় স্থান না পাইলে, আমরা চটীতে উঠিতাম। পান্থশালায় সময় কাটান, বাল্যকালে এক নূতন ধরণের আমোদ মনে হইত।

চাঁদবালীতে একদিন থাকিয়া, জাহাজে উঠিতাম। চাঁদবালি হইতে কলিকাতায় আসিতে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা লাগিত। সমুদ্রের পথ—সত্তর মাইলের বেশি নয়—সাত ঘণ্টায় পার হওয়া যাইত। প্রকৃতির প্রধান দুটি দিক, সমুদ্র এবং পাহাড়, জীবনে আমাকে অব্যক্ত আনন্দ দিয়াছে। সমুদ্রতীরে দীর্ঘ সময় বসিয়া, তরঙ্গের খেলা দেখিয়া, নয়ন ক্লান্ত হয় নাই; গিরিরাজ হিমালয়ের দৃশ্য, বহুদিন ধরিয়া উপভোগ করিয়াও চিত্তে অবসাদ আসে নাই। বাল্যকাল হইতে প্রকৃতির ঐ দুটী দিক উপভোগ করিবার সুযোগ, উড়িষ্যায় থাকিয়া

হইযাছে। চাঁদবালি হইতে জাহাজে উঠিবাব পব, আমার প্রধান কাজ ছিল, ডেকের উপর বসিয়া অনন্ত জলবাশির মাধুর্য্য এবং গাম্ভীর্য্য উপভোগ করা। জাহাজ বেশি না দুলিলে, আমি তাব অগ্রভাগে গিয়া বসিতাম। বড় ধরণের চিন্তা করিবার ক্ষমতা হয নাই, বালক-হৃদযে কেবল চিত্তের প্রসন্নতা উপভোগ কবিয়া তৃপ্ত হইতাম।

সমুদ্রের সৌম্যমূর্ত্তিব মত, তাব বণমূর্ত্তি, মানসপটে উজ্জ্বলভাবে আঁকা রহিয়াছে। ঐ মূর্ত্তিব পূর্ণ বিকাশ হইযাছিল, একবাব 'মেদিনা' জাহাজে কলিকাতায় আসিবাব পথে। তখন আমাব বযস বোধ হয নয বছব। আকাশের অবস্থা ভয়ানক, তবুও ইংরাজ কাপ্তেন, চাঁদবালি হইতে জাহাজ ছাড়িযা দিলেন। সমুদ্রে কিছুদূর আসিবার পর, ভীষণ ঝড় হইতে লাগিল, জাহাজেব গতি ঠিক বাখা সম্ভব হইল না। অল্প সমযেব মধ্যে কাপ্তেন পথ হারাইলেন। বাত্রি আসিল। চারিদিকে, উচ্চ-তবঙ্গমালার ভীষণ শুভ্র দন্তবিকাশ ছাড়া, আর কিছুই দেখা গেল না। রাত্রি শেষেও, জাহাজ সমুদ্রে আছাড় খাইযা, কোন মতে চলিতে লাগিল। বিশাল ডেউগুলি জাহাজকে এক-একবার বহু উর্দ্ধে তুলিয়া, এরূপ গহ্বরের মধ্যে ফেলিয়া দিতে লাগিল, মনে হইল সমুদ্র আমাদের মাথাব উপর দিযা চলিযা যাইতেছে, আমরা তাব তলায় পড়িয়া আছি। অবশেষে, কাপ্তেন বুঝিতে পারিলেন, জাহাজ চট্টগ্রামের দিকে আসিয়াছে। সেবার অনেক কষ্ট পাইয়া, চারিদিন সমুদ্রে কাটাইয়া, কোন রকমে প্রাণ লইয়া আমরা কলিকাতায় পৌছিয়াছিলাম। যতদূর স্মরণ হয়, মেদিনার ঐ সাহেব কাপ্তেনই কয়েক বছর পরে, "সার্ জন্ লরেন্স্" জাহাজেব কাপ্তেন হইয়াছিলেন, এবং তাঁর গোঁয়ারতুমির জন্য, "সার্ জন্ লরেন্স্", আট শত যাত্রীর সহিত, পুরী যাইবার পথে, সমুদ্রে ঝড়ে ডুবিয়া যায়, এবং ঐ কাপ্তেনেরও মৃত্যু হয়।

একবার জাহাজে যাইবার সময়ে, একটি মর্ম্ম-স্পর্শী ঘটনা দেখিয়াছিলাম। জাহাজ সবে সমুদ্রে পড়িয়াছে, আমি জাহাজের একধার হইতে আসিতেছি, হঠাৎ মনে হইল, আমার পাশ হইতে কে যেন সমুদ্রে লাফাইয়া পড়িল। সত্যই একজন যাত্রী, ইচ্ছা করিয়া, জাহাজ হইতে সমুদ্রে লাফ দিয়াছিল। সংবাদ পাইবামাত্র, ইংরাজ কাপ্তেন জাহাজ থামাইলেন। আমি দেখিলাম, লোকটি অনেক দূরে, মোচার খোলার মত, সমুদ্রে ভাসিয়া যাইতেছে। চোখের পলক না ফেলিতে, কয়েকজন দেশী খালাসী একখানি জলিবোট

মাতা কমলবাসিনী দেবী

লইয়া, লোকটিকে লক্ষ্য করিয়া চলিল, এবং দ্রুত বাহিয়া শীঘ্র তার কাছে উপস্থিত হইল। লোকটি প্রথমে জলিবোটে উঠিতে চায় নাই, সে বাড়ীতে ঝগড়া করিয়া আসিয়াছিল, এবং আত্মহত্যা করিবার জন্যই সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিল, কিন্তু পরে প্রাণের মায়ায় সাঁতার দিতে আরম্ভ করে। জাহাজে তুলিয়া আনিবার পর, কাপ্তেন তার হাতে হাতকড়া দিয়া একটি কেবিনে বন্দ করিয়া রাখিলেন। জাহাজ কলিকাতায় আসিলে, যাত্রীদের অনুরোধে পুলিসের হাতে না দিয়া, কাপ্তেন লোকটিকে ছাড়িয়া দিলেন।

কলিকাতা হইতে আমরা পান্‌সী করিয়া পানিয়ায় যাইতাম। দ্রুতগামী ষ্টীমার এবং জাহাজে পথ অতিক্রমের পর, নৌকায় উঠিয়া বেশ আমোদ বোধ করিতাম। অনেক সময়ে, যেখানে মাঝিরা দাঁড় বাহিত, তাদের কাছে বসিয়া থাকিতে ভালবাসিতাম। দাঁড়গুলি একটি শ্রুতিমধুর শব্দে জল বিভক্ত করিত, এবং নৌকা মৃদু কল্লোলে অগ্রসর হইত, নিস্তব্ধ হইয়া দেখিতাম। সূর্য্যাস্তের পর, পশ্চিম আকাশ রাঙ্গা হইয়া উঠিয়া যখন মাঝির মনকেও আনন্দিত করিত, কিংবা চাঁদনি রাতে, চাঁদের দিকে চাহিয়া দাঁড় টানিতে টানিতে যখন মাঝির প্রাণও বিভোর হইয়া উঠিত, এবং তারা গান ধরিত, আমি মুগ্ধ হইয়া সে গান শুনিতাম। মুক্ত প্রকৃতি এবং বিশাল জলরাশি তাদের গানকে এরূপ একটি কোমল মর্ম্মস্পর্শী ভাবে মণ্ডিত করিত, আমার বালক হৃদয়ও পুলকিত হইত।

নৌকা টাকীর ঘাটে আসিলে, আমরা নামিয়া মামার বাড়ীতে যাইতাম, এবং সেখানে পূজার কয়দিন কাটাইতাম। টাকীতে তখন পূজার আমোদ খুব বেশি ছিল। সকলের অপেক্ষা জাঁক-জমকের পূজা হইত বৈঠকখানা-জমিদারদের বাড়িতে, কিন্তু আমার ভাল লাগিত, মামার বাড়ীর নিকট ঘোষেদের বাড়ির পূজা। বৈঠকখানা-জমিদারদের বাড়িতে অসংখ্য ছাগশিশু এবং মহিষ বলি দেওয়া হইত, আমার মোটেই ভাল লাগিত না। ঘোষেদের বাড়িতে, জীববলির পরিবর্ত্তে, আখ, কুমড়া, ইত্যাদি, বলি দেওয়া হইত, তাহা শৈশবের খেলা-ঘরের ব্যাপারের মত মনে হইলেও, দেখিয়া আনন্দলাভ করিতাম।

টাকীর বিসর্জ্জনের আমোদ খুব ভাল লাগিত। বড় হইয়া কাশীধামে দেবী বিসর্জ্জন দেখিয়াছি, পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বে, টাকীর নদীতে বিসর্জ্জনের আমোদ, তার অপেক্ষা কোন অংশে কম ছিল না।

বিজয়ার কোলাকুলির পর, অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া, নৌকায় আসিয়া ঘুমাইয়া পড়িতাম। প্রভাতে উঠিয়া দেখিতাম, নৌকা কালীগঞ্জের ঘাটে আসিয়াছে, অদূরে সেই পরিচিত ঝাউ গাছ, এবং জ্যাঠামহাশয় অনাবৃত বদনে, খালি পায়ে, কোমরে চাদর বাঁধিয়া, আমাদের বাড়িতে লইয়া যাইবার যোগাড় করিতেছেন

কটক হইতে বাহির হইয়া, দেশ ঘুরিয়া, কটকে ফিরিয়া আসিতে যে একমাস সময় লাগিত, বাল্যজীবনে, বছরের মধ্যে ঐ সময় আমার সর্ব্বাপেক্ষা নির্ম্মল আনন্দে কাটিত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শিক্ষা-জীবন

বার বছর বয়সে, তৃতীয় শ্রেণী হইতে ক্লাশে উঠিতে না পারিয়া, আমার যথার্থ শিক্ষা-জীবন আরম্ভ হইল। আমার ভাই শরৎ নীচের ক্লাশে পড়িত, আমার সঙ্গে পড়িতে আসিল। শরতের পডার অবস্থা আমার মত হইয়াছিল, তবে সেবার সে কোন রকমে ক্লাশে উঠিতে পারিয়াছিল। সে আমার দুই বছব পরে এণ্ট্রান্স্ পাশ করে। ছোট ভাই সঙ্গে পড়িতে আসার জন্য মন মোটেই খারাপ হয় নাই, কারণ সে আমার খেলার সঙ্গী ছিল, এবং অনেক সময়ে আমরা পরামর্শ করিয়া দুষ্টামি করিতাম। নূতন বই কিনিয়া, বুক ফুলাইয়া, সহপাঠীদের উপরের ক্লাশে পড়িবার দৃশ্যই আমাকে লজ্জায় অত্যন্ত অভিভূত করিল।

ক্লাশে উঠিতে না পারিয়া, ম্লানমুখে, কাহাবও সঙ্গে কথা না কহিয়া, দিনগুলি কাটাইতে লাগিলাম। আমার মনের অবস্থা দেখিয়া, ঠিক স্মরণ হয় না, পিতা কিংবা মাতা বলিলেন, বেশি দুঃখ করিবার দরকার নাই, মন দিয়া পড়িলে বছরের শেষে নিশ্চয় উপরের ক্লাশে উঠিতে পারিব। আমি ঐ কথায় সান্ত্বনা পাইলাম না, নিজেকে ঘৃণার চোখে দেখিতে লাগিলাম। সে পর্য্যন্ত কোন কাজ চিন্তা করিয়া করি নাই, হঠাৎ আমি চিন্তাশীল হইলাম। বয়স্ক লোকের মত, আমার ক্ষুদ্র জীবনের ঘটনাগুলি যতই আলোচনা করিলাম, ততই আত্মগ্লানি বাড়িল। যাদের সঙ্গে বেশি মিশিতাম, তাদের সহিত কথা কওয়া বন্ধ করিলাম। একদিন অনেকক্ষণ চিন্তার পর, কাঁদিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম, আমি সব বিষয়ে ভাল হইব। প্রতিজ্ঞার কথা, বিদ্রূপের ভয়ে, কাহারও নিকট প্রকাশ করিলাম না। কয়েক মাস পরে আমার উপনয়ন হইল।

প্রতিজ্ঞা করার সঙ্গে সঙ্গে যে অন্যধরণের বালকে পরিণত হইলাম, ইহা সম্ভব নয়, কিন্তু ঐ দিন হইতে ধীরে ধীরে আমার নৈতিক এবং মানসিক উন্নতি আরম্ভ হইল। ষোল বছর বয়সে, আমি একজন চরিত্রবান এবং অধ্যয়নশীল যুবক বলিয়া গণ্য হইলাম।

জীবনে ভাল হইবার চেষ্টা করিতে গিয়া, অপরের সাহায্য কখন পাই নাই, অবস্থার সাহায্যও ভাগ্যে ঘটে নাই। কলিকাতায় বি, এ, পড়িতে আসিবার পূর্ব্বে, দুর্ভাগ্যক্রমে আমার একজনও সহপাঠী ছিল না, যাকে অনুকরণ করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারি। আমার পরিবর্ত্তন দেখিয়া, বন্ধুরা আমাকে পবিত্রবাদী বলিয়া পরিহাস করিতে লাগিল। পরিহাসের চেষ্টায় তারা সফল হইল না। প্রকৃতি গম্ভীর সত্ত্বেও আমি খুব আমোদপ্রিয়। বেশি বয়সেও, আমি দলে না থাকিলে, বন্ধুদের আমোদ পূর্ণমাত্রায় হইত না। কথার ফোয়ারা ছুটাইয়া আমোদ বাড়াইতে খুব পারিতাম, এবং আমার মত পরিহাস করিবার ক্ষমতা বন্ধুদের মধ্যে কাহারও ছিল না। অধিক পরিহাস করিয়া বন্ধুদের বিদ্রূপ হইতে নিজেকে রক্ষা করিলাম, কিন্তু মনের মধ্যে সৎ এবং সচ্চরিত্র হইবার ইচ্ছা দৃঢ় হইতে লাগিল।

ঐ সময়ের দুটি ঘটনার দ্বারা আমার মনের পরিবর্ত্তন বেশ প্রকাশ পায়। কোনরূপ মাদকদ্রব্য স্পর্শ করিব না, স্থির করিলাম। উড়িষ্যায় সিদ্ধি খাওয়ার চলন অত্যন্ত বেশি। পেট ঠাণ্ডা রাখে কারণ দিয়া, অনেক ভদ্রলোকের বাড়িতে, অল্প পরিমাণে সিদ্ধি, নিয়ম করিয়া ব্যবহার করা হয়। স্কুল কলেজের ছেলেদের মধ্যে সিদ্ধির চলন খুবই ছিল, তখন চুরুট খাওয়া এবং নস্যলওয়ার ঢেউ তেমন উঠে নাই। বিজয়া দশমীর দিন, সিদ্ধি খাওয়ার ধূম চরমে উঠিত। বাড়িতে কেহ দেখা করিতে আসিলে, 'মিষ্টিমুখ' করাইবার আগে, নিয়ম করিয়া তাকে সিদ্ধি খাইতে দেওয়া হইত। বাড়ির ছোট-বড় সকলে, অল্প-বেশি পরিমাণে সিদ্ধি খাইত। একবার বিজয়ার দিন, মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি সিদ্ধি খাইয়াছি কি না। আমি বলিলাম, সিদ্ধি খাইব না। মাতা বলিলেন, বিজয়ার দিন সিদ্ধি খাইতে হয়। আমি তবুও খাইব না, বলিলাম। মাতা গম্ভীর হইয়া চলিয়া গেলেন। খুব সম্ভব, সিদ্ধি মহাদেবের প্রসাদ মনে করিয়া বিজয়ার দিন অনেকে খাইয়া থাকে।

আমার সহপাঠী বন্ধুদের মধ্যে শীঘ্র বার্ডসাই খাওয়ার চলন আরম্ভ হইল। যে দুজন বন্ধুর সঙ্গে, ঐ সময়ে আমার ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল, তারা চুরুট ধরিল। আমি চুরুট খাইতে ইচ্ছুক নই বুঝিতে পারিয়া, তারা ষড়যন্ত্র করিল, কোন রকমে আমাকে চুরুট ধরাইবে। তারা দুজনই আমার অপেক্ষা বলবান। একদিন একটি চুরুট ধরাইয়া, দুইজনে আমার দুই হাত আটকাইয়া, আমার

মুখে চুরুট প্রবেশ করাইতে চেষ্টা করিল। তখন হঠাৎ আমার মাথায় এক বুদ্ধি আসিল, তাহা প্রয়োগ করিলাম। আমার দুই বন্ধুই তাদের পিতার একমাত্র পুত্র, আমার দুই ছোট ভাই ছিল। কিছু দুঃখের স্বরে বলিলাম, তারা চুরুট খাইলে তেমন দোষের হইবে না, আমার দুই ছোট ভাই আমাকে অনুকরণ করিয়া চুরুটখোর হইবে, তাদের বিবেচনায় কি সেটা ভাল হয়? কথাটা তাদের মনে লাগিল, তারা তৎক্ষণাৎ আমার হাত ছাড়িয়া দিল, এবং আর কখন আমাকে চুরুট খাইতে অনুরোধ করে নাই। আমার দৃষ্টান্ত কিন্তু আমার ভ্রাতারা অনুকরণ করে নাই, চুরুট এবং তামাকের প্রতি সমান আদর তারা জীবনে দেখাইয়া আসিতেছে! কিশোর বয়সের প্রতিজ্ঞা আজীবন রাখিয়াছি, কখনও মাদকদ্রব্য স্পর্শ করি নাই।

কলেজিএট্ স্কুল হইতে এণ্ট্রেন্স্, এবং রাভেন্সা কলেজ হইতে এফ, এ, পাশ করিবার পর, কলিকাতায় আসিয়া পডিবার ইচ্ছা প্রবল হইল। প্রেসিডেন্সি কলেজের সুখ্যাতি শুনিয়া, ঐ কলেজে পড়িবার খুবই আগ্রহ হইল। কটকের কলেজে পড়ান ভাল হইত না, তাহা ছাড়া, যাহা আমি ঐ বয়সে খুবই অপছন্দ করিতাম, সহপাঠীদের মধ্যে একজনকেও উচ্চ আশায় অনুপ্রাণিত হইতে দেখি নাই। ভাল কলেজে, উচ্চ আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ ছাত্রদের সঙ্গে পড়িয়া উন্নতি করিবার জন্য, কলিকাতায় অসিবার ইচ্ছা হইল। ক.,কোতায় পড়িবার বিষয়, পিতার নিকট বলিতে সাহস করিলাম না, মাতাকে বলিলাম। আপত্তির রাশি এত হইল, মনে হইল, কলিকাতায় যাইবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিতে হইবে। তখন সমুদ্রপথে কলিকাতায় আসিতে হইত। অভিভাবকশূন্য হইয়া, অল্পবয়সে ছাত্রাবাসে থাকিয়া পড়িতে হইবে; কলিকাতায়, অল্প সময়ের মধ্যে, ছাত্ররা কুসঙ্গে পড়িয়া অধঃপাতে যায়; এইরূপ নানা আপত্তির কারণ পিতার নিকট হইতে মাতা শুনিয়া আসিয়া বলিলেন। চরিত্রের বল থাকিলে, আশঙ্কার কোন কারণ নাই; বাঙ্গলার মফস্বল হইতে অসংখ্য ছেলেরা কলিকাতায় পড়িতে আসে; আমার বয়স নেহাৎ কম নয়, ইত্যাদি, বলিয়া কলিকাতায় যাওয়ার বিরুদ্ধে যুক্তিগুলি খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু মাতার মন ভিজিল না। অবশেষে, একদিন অত্যন্ত ক্ষুন্নমনে বলিলাম, সকল পিতামাতাদের ইচ্ছা, ছেলেরা ভাল পড়িয়া জীবনে উচ্চ পদ এবং খ্যাতি লাভ করে, তাঁদের কেন ঐরূপ ইচ্ছার অভাব হইতেছে? ঐ কথা শুনিয়া পিতার মতের পরিবর্ত্তন হইল, আমার

আনন্দের সীমা রহিল না। খৃষ্টাব্দ ১৮৯৬ জুনমাসে, পড়িবার জন্য কলিকাতায় আসিলাম, সঙ্গে ভাই শরৎ আসিল।

কলিকাতায় আসিয়া, প্রেসিডেন্সি কলেজে বি, এ, তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলাম। পূজা পর্য্যন্ত হ্যারিসন্ রোডে একটি বোর্ডিংএ থাকিয়া, পরে ইডেন্ হিন্দু হোষ্টেলে স্থান পাইলাম। কলিকাতায় আসিয়া মনে হইল, নবজীবন লাভ করিলাম। কটক এবং কলিকাতার প্রধান কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রদের মধ্যে প্রভেদ দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। ম্যান্, পার্সিভ্যাল্ এবং রো আমাদের ইংরাজি সাহিত্য পড়াইতেন; পি, কে, রায় এবং উইলসন্ দর্শন, প্রথেরো এবং বিনয়েন্দ্র সেন, ইতিহাস পড়াইতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ অধিকাংশ ভাল ছাত্র, তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িত। ভবিষ্যৎ জীবনের নানাবিধ উজ্জ্বল ছবি, উৎসাহ এবং আকাঙ্ক্ষায় হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল, কিন্তু কিছুদিন পরে দেখিলাম, তাহা সুখস্বপ্নে পরিণত হইল!

কলিকাতায় থাকা ছয়মাস হয় নাই, হঠাৎ একদিন কটক হইতে আমার বড় ভগ্নীপতি জগদীশের একখানি চিঠি পাইলাম। সে লিখিয়াছিল, পিতার শরীর অসুস্থ, একদিন রাত্রে ডাক্তার আনিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা তাকে করিতে হইয়াছিল; দুঃখপ্রকাশ করিয়া পিতা জগদীশকে বলিয়াছিলেন যে, ঐ বয়সে ছেলেরা কাছে থাকিয়া তাঁকে দেখিবার কথা, কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্য, ছেলেরা বাড়ি ছাড়িয়া দূরে যাইয়া রহিয়াছে। পিতার বয়স তখন ৫৪ বৎসর, দশ বছর পরে, তাঁর মৃত্যু হয়। কোন শক্ত অসুখ হয় নাই, দিন কয়েকের মধ্যে তিনি সারিয়া উঠিলেন, কিন্তু তাঁর কথাগুলি আমার হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত করিল। পিতা যদি দুঃখিত-হৃদয়ে দিন কাটাইলেন, রোগের সময়ে পুত্রের সেবায় বঞ্চিত হইলেন, পুত্রের জীবন বৃথা গেল মনে করিতে হইবে। আমার ভাবপ্রধান হৃদয় লইয়া বিষয়টি যতই ভাবিলাম, কটকে ফিরিয়া গিয়া পিতার নিকট থাকিবার ইচ্ছা ততই দৃঢ় হইল। উচ্চাভিলাষ অন্তর্হিত হইল, পিতার দুঃখ-বিজড়িত কথাগুলি হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। পিতাকে লিখিলাম, জগদীশের চিঠি পাইয়াছি, দূরস্থানে থাকা উচিত মনে করি না, তাঁর নিকট কটকে থাকিয়া পড়িতে ইচ্ছা করি। স্বল্প কথায় পিতার উত্তর আসিল, আমি যাহা উচিত মনে করি, করিতে পারি। মনের ভাব বাহুল্য ভাবে প্রকাশ করিবার অভ্যাস তাঁর ছিল না, চিঠির ধরণে বুঝিলাম, কটকে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করি জানিয়া প্রীত হইয়াছেন। ছয়মাস মাত্র

কলিকাতায় কাটাইয়া, কলিকাতার পাট তুলিয়া দিয়া, শরতের সহিত কটকে ফিরিয়া আসিলাম।

আমি বি, এতে ইতিহাস লইয়াছিলাম। কটকের কলেজে তখন ইতিহাস পড়াইবার ব্যবস্থা ছিল না। সে বছর ইতিহাস পরিবর্ত্তন করিয়া অন্য কোন বিষয় লইবার সময় ছিল না। এক বছর সময় নষ্ট হইয়া গেল দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। ঐ সময়ে শুনিলাম, আমার কটকের কয়েকজন বন্ধু প্লিডারসিপ্ পড়িবে স্থির করিয়াছে। ভাবিলাম, ভবিষ্যতে উকিল হইয়া পিতার সঙ্গে কাজ করা যদি আমার উদ্দেশ্য হয়, বি, এ, না পড়িয়া, প্লিডারসিপ্ পাশ করিয়া শীঘ্র উকিল হইলে ত মন্দ হয় না। পিতাকে আমার অভিপ্রায়ের কথা বলিলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিলেন। প্লিডারসিপ্ পড়িব স্থির হইল। এমন কেহ ছিল না যে পরামর্শ দেয়, আমার ঐ অল্পবয়সে একবছর মোটেই বেশি সময় নয়, প্লিডারসিপ্ না পড়িয়া আমার বি, এ, পড়াই উচিত। এক ভুলের পর আবার এক বড় ভুল করিলাম।

বাঙ্গলায়, প্লিডারসিপ্ পরীক্ষা অনেকদিন উঠিয়া গিয়াছে। পরীক্ষা খুব শক্ত ছিল, প্রত্যেক কাগজে শতকরা পঞ্চাশ এবং মোটের উপর শতকরা ছয়ষট্টি নম্বর রাখিতে হইত। শতকরা দশ কিংবা বার জনের বেশি পাশ করিতে পারিত না। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে প্লিডারসিপ্ পাশ করিয়া কটকে ওকালতি আরম্ভ করিলাম।

উকিল হইবার পর, পিতা যদি আমাকে সঙ্গে লইয়া কাজে নিযুক্ত রাখিতেন, কাজের চাপে এবং টাকার মোহে, অন্য কোন বিষয় ভাবিবার অবসর থাকিত না, আমার ভবিষ্যৎ অন্য প্রকারের হইত, কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু পিতা তাহা না করিয়া, আমাকে অন্য উকিলদের সঙ্গে ঘুরিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে উপদেশ দিলেন, এবং রোজগারের জন্য উদ্বিগ্ন হইতে নিষেধ করিলেন। আমি প্রচুর অবসর পাইলাম। পরে বুঝিতে পারিলাম, ছেলেকে সব সময়ে সঙ্গে রাখিয়া কাজ করা তিনি পছন্দ করেন না।

বুদ্ধির দোষে এবং অবস্থাচক্রে পড়িয়া, বি, এ, পড়া ছাড়িয়া প্লিডারসিপ্ পড়িয়াছিলাম, কিন্তু একদিনের জন্যও ঐ অবস্থায় সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। জীবনের বড় আশাগুলি মিটিল না চিন্তা করিয়া মনে কষ্ট পাইতাম। প্লিডারসিপ্ পড়িবার সময়ে, তিন জন বাঙ্গালী উকিলের সঙ্গে পরিচয় হয়, যারা পরে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হইয়াছিল। তারা তিন জনই কলিকাতা

হইতে, আত্মীয় উকিলদের সাহায্যে ওকালতি করিতে, কটকে আসিয়াছিল। তিন জনই এম্, এ, বি, এল্। বি, এ, পড়া না ছাড়িলে, আমি যে তাদের মত একজন হইতাম, সর্ব্বদা মনে হইত। তারা আমার মনের ভাব কিছুই জানিত না, কিন্তু তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া মনের অশান্তি বাড়িতে লাগিল।

মনের অস্থিরতা নিবারণের জন্য, গোপনে স্থির করিলাম, যে পরীক্ষাগুলি সময়ে পাশ করিতে পারি নাই, সেগুলি একে একে বাড়িতে পড়িয়া দিতে চেষ্টা করিব। আমার বড় ভগ্নীপতি জগদীশ, কটকের একটি মাইনর্ স্কুলের সেক্রেটারি ছিল। স্থির করিলাম, বেতন না লইয়া ঐ স্কুলের শিক্ষক হইয়া বি, এ, পরীক্ষা দিব। দুই বছর ঐ স্কুলের শিক্ষক শ্রেণীভুক্ত থাকিয়া, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বি, এ, পরীক্ষা দিবার অনুমতি পাইলাম। কটক, এম্, এ, এবং বি, এল্ পরীক্ষা ছাড়া, অন্য সব পরীক্ষার কেন্দ্র ছিল। আমি কিন্তু কলিকাতা কেন্দ্রে যাইয়া বি, এ, পরীক্ষা দিব, স্থির করিলাম। বিষয়টি গোপনে রাখিয়াছিলাম, দুই চারি জন ছাড়া অন্য কেহ জানিত না, আমি বি, এ, পড়িতেছি। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে শিক্ষক হইয়া বি, এ, পাশ করিলাম। তখন আমার ওকালতি করা চার বছর হইয়াছে।

বি, এ, পাশ করিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিলাম, কলেজে না পড়িয়া আমাকে বি, এল্ পরীক্ষা দিবার অনুমতি দেওয়া হউক। কটকে বি, এল্ ক্লাশ আছে, কারণ দেখাইয়া, আমাকে ঐ অনুমতি দেওয়া হইল না। আমি অগত্যা রাভেন্সা কলেজে দুই বছর বি, এল্ পড়িলাম। ওকালতিও ঐ সঙ্গে চলিয়াছিল। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে বি, এল্ প্রথম শ্রেণীতে পাশ করিলাম।

বি, এল্ পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পর, হাইকোর্টের উকিল হইতে ইচ্ছা করিলাম। যে উদারতা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করে নাই, হাইকোর্ট তাহা আমার প্রতি প্রকাশ করিল। তখন বি, এল্ পাশ করা উকিল, চার বছর জেলা-কোর্টে ওকালতি করিবার পর, হাইকোর্টের উকিল হইতে পারিত। হাইকোর্ট ইংলিশ্ বিভাগের কর্ত্তা তখন ছিলেন, জজ্ সারদাচরণ মিত্র। তাঁর সঙ্গে দেখা করিলাম। তিনি বলিলেন, নিয়মে এরূপ ঠিক বলা নাই, বি, এল্ পাশ করার পর চার বছর ওকালতি করার দরকার, তুমি জেলায় ছয় বছরের উপর ওকালতি করিয়াছ, আবেদন কর,

আমি মঞ্জুর করিব। বি, এল্ পরীক্ষার ফল বাহির হইবার তিনমাস পরে, হাইকোর্টের উকিল হইলাম।

কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করিবার সময়ে দেখিলাম, বি, এ, বি, এল্ এবং এম্, এ, বি, এলের মধ্যে তারতম্য হইয়া থাকে। উঁচু নজর করিতে গেলেও, এম্, এ, পাশের অভাব বিঘ্নস্বরূপ হইতে পারে। যদিও আমার অবসর কম ছিল, স্থির করিলাম এম্, এ, পরীক্ষা দিব। এম্, এ, পরীক্ষার জন্য বিষয় নির্ব্বাচনের সময়ে, কিছু চিন্তা করিতে হইল। বি, এতে ইংরাজী অনার পরীক্ষা দিয়াছিলাম, ইংরাজীতে এম্, এ, পরীক্ষা দিবার কথাই প্রথম ভাবিলাম। আমার তখন বয়স হইয়াছে, ভাষার আকর্ষণ কমিয়া ভাবের প্রাধান্যই অনুভব করিতেছিলাম, ইংরাজীতে এম্, এ, পরীক্ষা দিবার আগ্রহ হইল না। দর্শনে এম্, এ, পরীক্ষা দিলে, যে সব বিষয় আমি সর্ব্বদা চিন্তা করিয়া থাকি, সে সম্বন্ধে অনেকটা সাহায্য পাইব ভাবিয়া, দর্শনে এম্, এ, পরীক্ষা দিব স্থির করিলাম। জীবনের গতি কিরূপে পরিচালিত হয়, বুঝা সহজ নয়। দর্শনে এম্, এ, পরীক্ষা না দিলে আমার ভবিষ্যৎ জীবন যেরূপ হইয়াছিল, নিশ্চয়ই সেরূপ হইত না।

দর্শনের বইগুলি কিনিয়া দেখিলাম, সংখ্যা এত বেশি এবং বার বছর ওকালতি করিয়া ছাত্রসমাজ হইতে এতদূরে আসিয়া পড়িয়াছি, কোন দর্শনের অধ্যাপকের সাহায্যে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবার ধরণ জানিয়া না লইলে, ভাল পাশ করা সম্ভব নয়। ঐ সম্বন্ধে আমার দেশবাসী বন্ধু বিজয়গোপাল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরামর্শ করিলাম। তিনি তখন কলিকাতা বেথুন কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক। বিজয়গোপাল তাঁর বন্ধু ডক্টর্ আদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। আদিত্যনাথ তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে দর্শন পড়াইতেন। তিনি আমার একবছর আগে এণ্ট্রেন্স্ পাশ করেন। আদিত্যনাথ হৃষ্টচিত্তে আমাকে সাহায্য করিলেন, এবং কিছুদিন পরে, আমি প্রথম শ্রেণীতে পাশ করিতে পারিব বলিয়া আমার উৎসাহ বাড়াইয়া দিলেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে এম্, এ, পাশ করিলাম। পরীক্ষার সময়ে আমার স্ত্রী শঙ্কটাপন্ন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন, প্রথম শ্রেণীতে পাশ করিতে পারিলাম না, দ্বিতীয় শ্রেণীতে উচ্চে স্থান পাইলাম।

এম্, এ, পরীক্ষা সম্বন্ধে, একটি বিষয় উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। পরীক্ষার বিষয় গোপনে রাখিয়াছিলাম, কিন্তু প্রচার হইয়া পড়িল, এবং কথাটা হাইকোর্টের জজ সার্ আশুতোষ মুখার্জ্জির কাণে উঠিল। তিনি আমাকে একদিন সম্মুখে পাইয়া, আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, তুমি অদ্ভুত কাজ করিতেছ, সময়ে এম্, এ, পরীক্ষা দিলে বলিবার কিছুই ছিল না, কিন্তু যে বয়সে এবং যেরূপ কাজের মধ্যে থাকিয়া পরীক্ষা দিতেছ, তাহা প্রশংসনীয়। দুঃখিত হইয়া বলিতে হইল, পড়িয়া উন্নতি করিবার চেষ্টায়, আত্মীয়দের নিকট কখন উৎসাহ পাই নাই। যিনি কেবল আমার ভবিষ্যৎ জীবনের গতি দেখিয়া সুখী হইতেন, আমার পিতা, ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। উকিল হইবার পর, আমাকে কেবল বি, এ, পাশ করিতে দেখিয়া গিয়াছিলেন। বি, এ পাশের সংবাদ শুনিয়া, মৃদু হাসিয়া বলিয়াছিলেন, ঠিক তাঁর মতই হইল!

তারপর, ডি, এল্ হইবার জন্য এম্, এল্ পরীক্ষা দিবার অত্যন্ত ইচ্ছা হইল। তখন কটকে ফিরিয়া গিয়াছি এবং ম্যুনিসিপালিটির ভাইস্-চেয়ারম্যান্ হইয়াছি। সেখানে থাকিয়া এম্, এল্ পরীক্ষার জন্য কিরূপ ভাবে প্রস্তুত হওয়া দরকার বুঝিতে পারিলাম না। ওকালতি ছাড়া, সাধারণ কাজে যেরূপ জড়াইয়া পড়িতেছিলাম, ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের শেষে যে পরীক্ষা হইবে, তাহাতে উপস্থিত না হইতে পারিলে, আর যে কখন ঐ পরীক্ষা দিতে পারিব, সম্ভব মনে হইল না, অথচ আট মাসের বেশি সময় নাই। আমি ওকালতি এবং ম্যুনিসিপালিটির কাজ যথাসম্ভব বজায় রাখিয়া, অর্থাৎ অবহেলা করিয়া, ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় আসিয়া এম্, এল্ পরীক্ষা দিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। পরে জানিলাম, অন্তত দুই বছর না পড়িয়া কেহ ঐ পরীক্ষা দিতে সাহস করে না। আমার সঙ্গে কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ ঐ পরীক্ষা দিয়া কৃতকার্য্য হইলেন। পুনরায় ঐ পরীক্ষা দিবার অবসর পাইলাম না। জীবনে ক্ষোভ রহিল, কেবল এম্, এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়া, নিরস্ত থাকিতে হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ওকালতি

প্লিডারশিপ্ পাশের পর ১৯০১ খৃষ্টাব্দে কটকে ওকালতি আরম্ভ করিলাম। তখন জেলার জজ্ কটকে থাকিতেন, এবং আবশ্যক মত বছরে কয়েকবার পুরী এবং বালেশ্বরে গিয়া দাওরার বিচার করিয়া আসিতেন। পুরী এবং বালেশ্বরের জন্য স্বতন্ত্র জজ্ কিংবা সব্‌জজ্ ছিল না, ঐ দুই জেলার বড় দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার কটকে হইত। উড়িষ্যা বিভাগের কমিশনার কটকে থাকিতেন, সুতরাং কটকের উকিলদের আয় এবং প্রতিপত্তি তখন খুব বেশি।

আমি যখন উকিল হই, কটকে উকিলের সংখ্যা ত্রিশের বেশি নয়, তার মধ্যে উড়িয়া উকিল ছয়জন, একজন মুসলমান, এবং বাকি উকিলরা, স্থানীয় এবং নবাগত বাঙ্গালী। আমার দুইজন উড়িয়া বন্ধু, জগবন্ধু (জগদ্বন্ধু) সিংহ এবং পীতবাস পট্টনায়ক, আমার সঙ্গে প্লিডারশিপ্ পাশ করিয়া কটকে ওকালতি আরম্ভ করে, কিন্তু শীঘ্র নিজেদের জেলায়, পুরীতে, ওকালতি করিতে যায়। পীতবাস, পুরী জেলাবোর্ডের ভাইস্-চেয়ারম্যান্ হইয়াছিল, কয়েক বছর হইল মারা গিয়াছে। জগবন্ধু পুরীতে এখনও সুখ্যাতির সহিত ওকালতি করিতেছে, এবং প্রাণ ঢালিয়া দেশের সেবায় নিযুক্ত আছে।

এই দূর সময়ে, তুলনার দ্বারা বেশ বুঝিতেছি, তখন কটকে ভাল শ্রেণীর উকিল যত ছিল, তারপর একসঙ্গে অতগুলি ভাল উকিলকে সেখানে কাজ করিতে দেখি নাই। বিদ্বান্, আত্মমর্য্যাদাভিমানী, অকাতরে মক্কেলের কাজ করিতে ইচ্ছুক উকিল তখন যথেষ্ট ছিল। তখন যারাই উকিল হইয়াছে, সকলে বেশ রোজগার করিয়াছে, কিন্তু আর দশ বছর পরে কটকে ওকালতির সে অবস্থা রহিল না।

আমি উকিল হইবার পর, পিতা চার বছর ওকালতি করিয়াছিলেন। লিখিতে লজ্জা বোধ হয়, তিনি ইংরাজী জানিতেন না, সেজন্য মনে করিয়াছিলাম, ভাগ্যক্রমে অনেক টাকা রোজগার করিয়া থাকেন, ইংরাজী জানা উকিলদের মত তাঁর পারদর্শিতা নাই। দিন-কয়েকের মধ্যে, আমার সে

ভুল ভাঙ্গিল। তাঁর জেরা, বক্তৃতা, এবং মাঝে মাঝে বাঙ্গলায় নজির উদ্ধৃত করার ধরণ দেখিয়া বুঝিলাম, ইংরাজী-জানা বড় আদালতের উকিল হইলে, আমাদের জীবনে রোজগার করা দরকার হইত না।

আমি শীঘ্রই আপিল আদালতে কাজ করার পক্ষপাতী হইলাম। তার প্রধান কারণ, প্রথম আদালতে সাক্ষী লইয়া খুব নাড়াচাড়া করিতে হয়, এবং অনেক সময়ে কি বলা উচিত কিংবা উচিত নয়, আগে তাদের বলিয়া প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। সচরাচর ঐ কাজের ভার জুনিয়ার উকিলদের লইতে হয়। অনেক সময়ে, সাক্ষীরা যাহা জানে না, তাহা বলিবার জন্যও তাদের প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। আমি তাহা করিতে ইচ্ছুক হইলাম না।

বি, এ, পরীক্ষা দিবার জন্য ওকালতি অবহেলা করিতে হইয়াছিল; দুই বছর বি, এল্ ক্লাশে যাইতে হইয়াছিল, সকালে কাজ করিবার সময় থাকিত না; উভয় কারণে, যতশীঘ্র পসার হইবার কথা, তাহা হইল না। ঐ সময়ে মনে হইল, ওকালতিজীবন অপেক্ষা মুন্সেফ্ হইতে পারিলে আমার পক্ষে ভাল হয়। যে তিন জন বাঙ্গালী উকিলের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল, তাদের মধ্যে দুইজন মুন্সেফ্ হইল দেখিয়া, একবার মুন্সেফ্ হইবার চেষ্টা করিতে ইচ্ছা করিলাম। আমি তখন বি, এ, পাশ করিয়া বি, এল্ পড়িতেছি। বয়স চলিয়া যাইবে, অপেক্ষা না করিয়া, হাইকোর্টে আবেদন করিলাম। তখন কটকে একজন প্লিডারশিপ্ পাশ করা মুন্সেফ্ ছিলেন, একেবারে নিরুৎসাহ হইলাম না। আমার আবেদন নামঞ্জুর করা হইল, কারণ দেওয়া হইল, আমার বয়স হিসাবে যথা-সময়ে প্রথম চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। আসল কারণ অবশ্য আমি বি, এল্ পাশ করা উকিল নই। আমি পুনরায় আবেদন করিয়া জানাইলাম, বি, এ, পাশ করিয়া বি, এল্ পড়িতেছি, বি, এল্ পাশ না করিলে আমার আবেদন পাকাভাবে গ্রহণ করিতে বলিব না, তখনকার মত অস্থায়ীভাবে আমার নাম রাখিতে প্রার্থনা করিতেছি। দ্বিতীয়বারও আগেকার কারণ দিয়া, আমার আবেদন অগ্রাহ্য করা হইল। তখন দুঃখিত হইয়া ভাবিলাম, কলিকাতায় থাকিয়া সময়ে পাশগুলি করিলে, মুন্সেফ্ হইবার ইচ্ছা নিশ্চয় পূর্ণ হইত।

বি, এল্ পাশ করিয়া, হাইকোর্টের উকিল হইবার পর, হাকিম এবং মক্কেলদের নিকট সম্মান বাড়িল। তখন হাইকোর্টের উকিলের সংখ্যা

কটকে খুব কম। মাস কয়েক পরে, জেলার জজ্ পেটেল্ একদিন খাস্ কামরায় ডাকিয়া পাঠাইলেন, এবং অবসরের সময়ে, মাসিক দুই শত টাকা বেতনে একটি বড় এস্টেটের কমন্ ম্যানেজারের কাজ লইতে অনুরোধ করিলেন। অনুরোধের কারণ জানিলাম, সরিক জমিদারেরা জজের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমি কাজের ভার লইলে তাঁরা সকলেই সন্তুষ্ট হইবেন। জজ্‌কে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ঐ কাজ লইলাম।

শীঘ্র একটি ঘটনার দ্বারা আমার জীবনের গতির পরিবর্ত্তন হইল। পুরীর একটি বড় মোকদ্দমা জজের নিকট বিচারের জন্য ছিল। উভয় পক্ষ ধনী, এবং মোকদ্দমা জিতিবার জিদ্ উভয় পক্ষের সমান ছিল। দুই পক্ষ হইতে কলিকাতা হাইকোর্টের বড় ব্যারিষ্টার্ এবং উকিল আসিল। একপক্ষে আসিলেন, লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার্ ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, অপর পক্ষে আসিলেন, বিখ্যাত উকিল, রাসবিহারী ঘোষ। এডামি সাহেব তখন কটকের জজ্ ছিলেন, তিনি পরে পাটনা হাইকোর্টের জজ্ হইয়াছিলেন। তখন জজ্‌কোর্ট গঙ্গামন্দির পুষ্করিণীর ধারে ছিল। জজের ছোট এজ্‌লাস্, জজ্ আসিবার অনেক আগে, উকিল এবং দর্শকবৃন্দে পরিপূর্ণ হইল। জজ্ এডামি আসিয়া, রাসবিহারীকে মিষ্টকথায় অভ্যর্থনা করিবার ইচ্ছায় বলিলেন, Dr. Ghosh, you have got a large audience : ডক্টর্ ঘোষ্, আপনার বক্তৃতা শুনিবার জন্য বহুলোকের সমাগম হইয়াছে। রাসবিহারী জেলায় কাজ করিতে আসিয়া, অল্পবয়স্ক হাকিমের পিঠ্‌চাপড়ানিতে আহ্লাদ প্রকাশ না করিয়া, মৃদু হাসিয়া বলিলেন, Not audience, your Honour, but spectators : হুজুর, শ্রোতা নয়, কেবল দর্শকবৃন্দ! এডামি সমস্তক্ষণের মধ্যে আর একটিও কথা বলেন নাই। আমি রাসবিহারী এবং ব্যোমকেশের বক্তৃতা মুগ্ধ-হৃদয়ে শুনিলাম। তাঁদের বক্তৃতার ধরণে জেলার উকিলের ভাব কিছুই ছিল না। প্রত্যেকটি ধরণ দেখিলাম, বক্তার আত্ম-সম্মান জ্ঞানের পরিচয় দিতেছে। সৌজন্য প্রকাশ করিয়া নির্ভীকভাবে ঐরূপ বক্তৃতা করিতে পূর্ব্বে কখনও শুনি নাই। বক্তাদের আত্ম-নির্ভরতাই বা কিরূপ! আমি বাড়িতে আসিয়া, কেবল রাসবিহারী এবং ব্যোমকেশের কথা ভাবিতে লাগিলাম। তাদের মত ব্যবহার-জীবীদের মধ্যে থাকিয়া, তাদের অনুকরণ করিয়া, সম্মানের সহিত অর্থোপার্জ্জন করিলে, জীবন নিশ্চয়ই ধন্য হয়। আদর্শের প্রভাব আজীবন আমার উপর সমানভাবেই চলিয়াছে। স্থির

করিলাম, জেলায় আর কাজ না করিয়া, কলিকাতায় গিয়া হাইকোর্টে ওকালতি করিব। তখন আমার আট বছর ওকালতি করা হইয়াছে।

আমার পূর্ব্বে, উড়িষ্যা হইতে কেহ কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করিতে আসে নাই, সুতরাং সংবাদটা উকিল মহলে একটা বড় রকমের আলোচনার বিষয় হইল। একজন উড়িয়া উকিল বন্ধু—তিনি এখনও জীবিত আছেন—জিজ্ঞাসা করিলেন, সত্যই কি আমি হাইকোর্টে ওকালতি করিতে যাইতেছি? কথাটা ঠিক শুনিয়া, কিছু উদ্বিগ্ন-হৃদয়ে বলিলেন, সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়া এবং কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করিতে যাওয়া যে একই রকমের ব্যাপার! একটি বাঙ্গালী উকিল-বন্ধু, আমার অপেক্ষা বয়সে বড়, বাড়ি কলিকাতায়, কটকে ওকালতি করিতে আসিবার আগে, কলিকাতার ছোট আদালতে কিছুদিন ওকালতি করিয়াছিলেন, অন্য পাঁচটা উপদেশের সঙ্গে, গম্ভীর ভাবে আমাকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিলেন, দেখো ভাই, আর যাই হোক, বাড়ীতে চা-তামাকের আড্ডাটা যেন বাড়াবাড়ি রকমের না হয়! জানকীনাথ বসু তখন কটকের সরকারী উকিল, সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, যারা পুরনো হয়েচে, তাদের ভেতর থেকেই যাবার কথা, তা তো হলো না, তুমি যাচ্চো, আহ্লাদের বিষয়। একটি পসারওয়ালা বাঙ্গালী উকিল, কিছু ঈর্ষার বশীভূত হইয়া বলিলেন, গিয়ে আর কি হবে, ঘুরে ঘুরে কেবল দিনগুলো কাটাতে হবে! তাঁর ঐ মত, দৈবক্রমে প্রকাশ করিয়াছিলেন, সব্‌জজের সম্মুখে। সেখানে অবশ্য আমি ছিলাম না, অন্য জনকয়েক উকিল ছিল। আমার সম্বন্ধে সব্‌জজের ধারণা ভাল ছিল, ঐ কথা শুনিয়া, তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, ঐ রকম ঘুরতে ঘুরতে আবার কেউ জজ্‌ও হয়ে থাকে!

নানাবিধ আশা এবং আশঙ্কা মনে লইয়া, ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করিতে আসিলাম। এখন স্মরণ হইলে খুবই হাসির বিষয় মনে হয়, আসিবার আগে, আমি একটি উইল করিয়া শরৎ ভায়ার নিকটে রাখিয়া আসিলাম। কলিকাতায় কয়েক মাস কাটাইবার পর, আত্মনির্ভরতা বাড়িল, আশঙ্কার লেশমাত্র রহিল না। কলিকাতায় বি, এ, পড়িতে আসিয়া যেরূপ নবজীবনের সঞ্চার উপলব্ধি করিয়াছিলাম, হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করিয়া, মন সেইরূপ প্রসারিত এবং উল্লসিত হইল। জেলা-কোর্ট এবং হাইকোর্টের মধ্যে দেখিলাম, কল্পনাতীত প্রভেদ। কেহ যেন

মনে না করে, ইহা কেবল নবাগত মফস্বলের উকিলের অতিরঞ্জিত কল্পনা! মনে যেন থাকে, ত্রিশ বছর পূর্ব্বে হাইকোর্টের অবস্থার কথা বলিতেছি। উদারতা দেখিলাম, হাইকোর্টের চারিধারে যেন ছড়ান রহিয়াছে, ক্ষুদ্রতার স্থান সেখানে নেই।

উকিলদের সঙ্গে জজ্‌দের ব্যবহার, প্রথমেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। মফস্বলের হাকিমের মত, প্রতিপদে উকিলদের সন্দেহের চোখে জজ্‌রা দেখিতেন না। এরূপ বিশ্বাস এবং নির্ভরতার ভাব তাঁরা প্রকাশ করিতেন, উকিলদের মনে আপনা হইতে সম্মানের জ্ঞান জাগিয়া উঠিত, এবং সৎভাবে কাজ করিবার ইচ্ছা প্রবল হইত। এখনও জজ্‌ উড্রফের কথা কয়টি কানে প্রতিধ্বনিত হইতেছে! আসিবার কিছুদিন পরে, তাঁর কোর্টে একটি বিষয়ের আবেদন করিলাম, যাহাতে ভিন্ন প্রকারের অনেকগুলি কাগজ দাখিল করা দরকার। তিনি কাগজগুলি সম্বন্ধে আমাকে কোন কথা উল্লেখ করিতে না বলিয়া, কিংবা নিজে না দেখিয়া, আমার মুখের দিকে চাহিয়া কেবল জিজ্ঞাসা করিলেন, Is everything in order : সব ঠিক আছে ত? আমি বলিলাম, "হ্যাঁ"। দরখাস্ত তৎক্ষণাৎ মঞ্জুর হইল।

তখন হাইকোর্টের আপিল বিভাগে ওকালতি করিতে আসিত. দুই শ্রেণীর লোক। মফস্বলে যাদের পৃষ্ঠপোষক উকিলরা আছে অথবা যারা মফস্বলে কাজ করিয়া মক্কেলদের নিকট পরিচিত হইয়া আসিয়াছে, তারা এক শ্রেণী; দ্বিতীয় শ্রেণীর উকিল, যারা অর্থশালী লোকের সন্তান, রোজগার না করিলে চলে, জেলার নামে নাসিকা কুঞ্চন করিয়া থাকে, এবং হাইকোর্টে বাঙ্গলার কৃতী সন্তানদের মধ্যে আসিয়া সময় কাটাইতে পছন্দ করে। উভয় শ্রেণীর অবস্থা ভাল, সম্মানের সহিত কাজ করিবার পক্ষে কোন বাধা ছিল না।

পনর বছর পরে, হাইকোর্টের অবস্থা আর সেরূপ রহিল না। আইন ব্যবসায়ীদের সংখ্যা দেখিতে দেখিতে অনেক বাড়িয়া উঠিল, নানা শ্রেণীর লোক, বেশি রোজগারের লোভে প্রলুব্ধ হইয়া হাইকোর্টে আসিতে লাগিল, যাদের মধ্যে অর্দ্ধেকের দিন কিছু না আনিলে সংসার চলে না! দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, কলিকাতার বোর্ডিংএ থাকিয়া হাইকোর্টে ওকালতি করিতে আসিতেছে! সঙ্গে সঙ্গে উকিলদের সম্মান ধূলায় লুটিতে লাগিল। একদিন বিস্মিত হইয়া শুনিলাম, একজন উকিল, অপর পক্ষের উকিলের

বক্তৃতার সময়ে বাধা দিয়া বলিতেছেন, "আমার বন্ধু নথীর বহির্ভূত কথা বলিতেছেন"! প্রতিদ্বন্দ্বী উকিল পশ্চাৎপদ নহেন, তিনি জোরের সহিত উত্তর দিলেন, "বন্ধুর কথা ঠিক নয়!" জজ্ মৃদু হাসিতেছিলেন! মনে হইল যেন স্বপ্ন দেখিতেছি, আমি মাথা হেঁট করিয়া ঐ স্থান ত্যাগ করিলাম।

বছর না ফিরিতে, আমার কাজের সংখ্যা বাড়িল, এবং আশার অধিক অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলাম। উড়িষ্যার প্রায় সব বড় মোকদ্দমার এক পক্ষে আমি থাকিতাম। অনেক সময়ে, অপর পক্ষে, প্রভাসচন্দ্র মিত্র থাকিতেন। প্রভাসচন্দ্র, পরে সার্ প্রভাস হইয়া, বাঙ্গলার এক্‌জিকিউটিভ কাউন্‌সিলাব হইয়াছিলেন।

জজ্‌দের নিকট সম্মান বজায় রাখিয়া কাজ করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিতাম। একদিন জজ্ হম্‌উডের কোর্টে, একটি ফৌজদারি মোশন্ করিতে উঠিলাম। কটকে থাকিতে ফৌজদারি মোকদ্দমা বড় করিতাম না। কলিকাতায় আসিয়া, উড়িষ্যার ফৌজদারি মোকদ্দমা পাইতে লাগিলাম। অল্প পরিশ্রমে বেশি টাকা পাওয়া যায় দেখিয়া, ফৌজদারি কাজও লইতাম। যে মোকদ্দমার কথা বলিতেছি, তাহা কটকের একজন ধনী লোকের। আমি কেবল মোকদ্দমার বিষয় বলিতে আরম্ভ করিয়াছি, দুই মিনিটও হয় নাই, জজ্ হম্‌উড্ বলিয়া উঠিলেন, There is no point of law: আইনগত কথা কিছুই নাই! হম্‌উড্ রাশ্‌ভারি জজ্, তাঁর মুখের উপর কোন কথা বলিতে, উকিল কিংবা ব্যারিষ্টার বড় সাহস করিত না, কিন্তু মোকদ্দমার সব কথা শুনিবার আগে, তাঁকে ঐরূপ মত প্রকাশ করিতে দেখিয়া, আমি হঠাৎ উত্যক্ত হইয়া উঠিলাম। যদিও তখন হাইকোর্টে বেশি দিন কাজ করি নাই, আমি উত্তর করিলাম, I am afraid, your lordship has not heard enough to form an opinion in the matter: অর্থাৎ, আমি সে পর্য্যন্ত এমন কিছু বলি নাই, যাহা হইতে মোকদ্দমা সম্বন্ধে তিনি কোন ধারণা করিতে পারেন। এজলাস্ হঠাৎ অধিক নিস্তব্ধ হইল! হম্‌উড্ সাহেব গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিলেন, আমি বক্তৃতা করিতে লাগিলাম। মোশন্ নামঞ্জুর হইল। কোর্টের বাহিরে, জুনিয়ার্ উকিলরা আমাকে ঘিরিয়া বলিল, আমি জুনিয়ারদের সম্মান খুব রক্ষা করিয়াছি! জজ্ হম্‌উডের অন্তঃকরণ ভাল ছিল, ঐ ঘটনার কথা মনে রাখিয়া কখনও আমার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন নাই।

এড্‌ভোকেট্‌ পরিচ্ছদে

হাইকোর্টে ফৌজদারি মোশনের সময়ে, ব্যারিষ্টার ও উকিল এবং জজের মধ্যে, কথা কাটাকাটি অনেক সময়ে হইত। একদিন জজ্ হ্যারিংটনের কোর্টে, আমার মোশনের পালার জন্য অপেক্ষা করিতেছি, প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার জ্যাক্সন্ একটি মোশন করিতে উঠিলেন। জ্যাক্সনের মেজাজের কথা অনেকে শুনিয়াছে, তাঁকে জজেরা সম্মান করিতেন, এবং বলিলে বোধ হয় আপত্তিজনক হইবে না, কিছু ভয়ও করিতেন। হ্যারিংটন্ জজিয়তির শেষভাগে, ব্যারোনেট্ আত্মীয়ের উত্তরাধিকারী হইয়া ব্যারোনেট্ হইয়াছিলেন, এবং তাঁর প্রকৃতিও খুব গম্ভীর ছিল। জ্যাক্সন্ কয়েকটি কথা বলিবার পর, জজ্ হ্যারিংটন জিজ্ঞাসা করিলেন, What is your point of law : মোকদ্দমায় আইনগত কথা কি আছে? কতকটা ইঙ্গিতে বলা হইল, আইনের কথা যদি থাকে বল, আমি বাজে বক্তৃতা শুনিতে চাই না! জ্যাক্সন্ একেবারে রুখিয়া উঠিলেন। কিছু রুক্ষস্বরে বলিলেন, আগে হাইকোর্টের জজেরা জিজ্ঞাসা করিতেন, তোমার প্রতি অবিচারের কারণ কি বল, এখন তাঁদের মুখে শুনিতে পাই, আইনের তর্ক কি আছে দেখাও! তারপর, মোশনে যাহা সচরাচর কেহ পড়িতে ভরসা করে না, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত, সাক্ষীদের উক্তিগুলি পড়িতে লাগিলেন, এবং প্রায় তিন কোয়াটার বক্তৃতা করিয়া বসিলেন। মোশনের রায় গোণা কয়টি কথায় দেওয়া হইয়া থাকে, কিন্তু হ্যারিংটন্ দশ মিনিট ধরিয়া রায় দিয়া মোশন্ নামঞ্জুর করিলেন, এবং রায়ের গোড়ায় জ্যাক্সনের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, **The case has been argued with more than necessary zeal** : অপ্রয়োজনীয় উৎসাহের সহিত মামলায় বক্তৃতা করা হইয়াছে।

জজ্ ষ্টীফেনের নিকট একদিন একটি দাওয়ানি আপিল করিবার সময়ে আমাকে তাল সামলাইতে হইয়াছিল। ছাপার বইয়েতে, একটি বিষয় আছে কি না, তিনি আমাকে প্রশ্ন করিলেন। প্রশ্নটি কোন প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে নয়। আমি বিনয়ের সহিত বলিলাম, দেখিয়া বলিতেছি, এবং খাঁ খাঁ করিয়া ছাপার বইয়ের পৃষ্ঠা উল্টাইয়া যাইতে লাগিলাম। জজ্ ষ্টীফেনের অল্পতে ধৈর্য্যচ্যুতি হইত, বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি ছাপার বইয়ের ঐ অংশ পড় নাই? আমি যথার্থ পড়ি নাই, দুঃখ প্রকাশ করিয়া স্বীকার করিলাম। তবুও তিনি [illegible] বিরক্তিভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন, কেন পড় নাই, পড়া উচিত [illegible]। তখন আমি তাঁর

মুখের দিকে স্থিরভাবে চাহিয়া বলিলাম, নিশ্চয় পড়িতাম, যদি প্রয়োজন মনে করিতাম।

আপিল আদালতের অনেক জজ্‌দের সঙ্গে ভালরূপ পরিচিত হইলাম, এবং কয়েকজন স্নেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁদের মধ্যে, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, উড্রফ্‌, কার্ণডফ্‌, কক্স্‌ এবং দিগম্বরের নাম উল্লেখযোগ্য। কার্ণডফ্‌ এবং কক্স্‌ সিভিলিয়ান্‌ জজ্‌। একদিন কার্ণডফ্‌ আমাকে খাস্‌-কামরায় ডাকাইয়া বলিলেন, প্লিডারসিপ্‌ পরীক্ষার তিনি প্রেসিডেণ্ট্‌ হইয়াছেন, আমাকে পরীক্ষক নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন। আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া সম্মতি জানাইলাম। সেবার প্লিডারসিপ্‌ পরীক্ষার পরীক্ষক হইয়া আমার অত্যন্ত আনন্দ হইয়াছিল। জীবনে ঐ প্রথম আইন-পরীক্ষক হইলাম। পরে, বছরে দুইবার, কলিকাতা ও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এলের পরীক্ষক হইয়াছি, কিন্তু সেবার প্লিডারসিপের পরীক্ষক হইয়া যেরূপ আনন্দিত হইয়াছিলাম, সেরূপ মনের ভাব জীবনে আর কখন হয় নাই। আমি প্লিডারসিপ্‌ পরীক্ষা, কটক হইতে কলিকাতায় আসিয়া কিরূপ উদ্বিগ্ন-হৃদয়ে দিয়াছিলাম, ইত্যাদি, অনেক কথা মনে পড়িল।

দিনগুলি হাইকোর্টে বেশ কাটিতে লাগিল। অল্প খাটিয়া বেশি টাকা রোজগার ছাড়া, অন্য কারণেও হাইকোর্টের উকিলের জীবন সুন্দর কাটিয়া থাকে। হপ্তায়, শনিবার ও রবিবার দুইদিন বন্ধ, ইচ্ছা করিলে কাছাকাছি কোন স্থানে দুদিন বেশ কাটাইয়া আসা যায়; পূজার সময়ে বাৎসরিক বন্ধ প্রায় আড়াই মাস, জজ্‌দের অনুকরণ করিয়া, অর্থশালী ব্যারিষ্টার এবং উকিলের বিলাতে বেড়াইয়া আসা চলে; কাজ না থাকিলে, হাইকোর্টের লাইব্রেরীতে, বড় ক্লাবে সময় কাটানর মত, আড্ডা দিয়া বেশ সময় কাটান যায়—গল্পের ত কথাই নাই, আহারাদি এবং খেলাও চলে। বাঙ্গালার সকল জেলার বাছা লোকের সমাবেশের স্থান হাইকোর্টে বসিয়া, নানাবিধ বিষয়ের আলোচনার যেরূপ সুবিধা, অন্য কোন স্থানে সেরূপ সম্ভব নয়। হাইকোর্টের ন্যায় বন্ধুতা স্থাপনের সুযোগ, খুব কম স্থানে হইয়া থাকে। তিনজন উকিল বন্ধুর উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনজনের স্বভাব অত্যন্ত মধুর। তাঁদের নাম, সমতুল দত্ত, ষোড়শীচরণ মিত্র, এবং মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়। সমতুল টেগোর প্রফেসার হইয়াছিলেন, মারা গিয়াছেন, তাঁর মত

নিরহঙ্কারী সরল প্রকৃতির বিজ্ঞ উকিল খুব কম দেখিয়াছি। ষোড়শী-চরণ, জজ্ সারদাচরণের ছোট ভাই, পরে পাটনা হাইকোর্টের বড় উকিল হইয়াছিলেন। তিনিও মারা গিয়াছেন। তাঁর মত উচ্চভাবাপন্ন বিশুদ্ধ চরিত্রের লোক তখন হাইকোর্টে বেশি ছিল না। মন্মথনাথ, সার্ মন্মথনাথ হইয়া হাইকোর্টের জজ্ এবং প্রধান বিচারপতির কাজ অত্যন্ত সুখ্যাতির সহিত করিযাছেন। তাঁর মত নিরপেক্ষ, অমায়িক-হৃদয়, বন্ধু-বৎসল এবং দেশহিতৈষী লোক বাঙ্গালা দেশে বেশি নাই, তাহা সকলেই জানে।

হাইকোর্টে আসিয়া খুব বুদ্ধিমানের কাজ করিয়াছি ভাবিয়া যখন আত্ম-শ্লাঘার ভাব আসিয়াছে, হঠাৎ দেখিলাম, সব ওলট্-পালট্ হইবার উপক্রম হইয়াছে। রাজার আদেশ বাঙ্গালার ঘরে ঘরে প্রচারিত হইল যে, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ রদ্ হইয়াছে, বিহার এবং উড়িষ্যা মিশিয়া একটি নূতন প্রদেশ হইয়াছে, কলিকাতা আর রাজধানী থাকিবে না, দিল্লী রাজধানী হইল; হাইকোর্টও ঐ সঙ্গে বিভাগ করা হইবে, পাটনায় নূতন হাইকোর্ট হইবে, এবং সেখানে উড়িষ্যার মামলার বিচার হইবে। সংবাদটা প্রথম আমার পক্ষে ভীতিজনক মনে হয় নাই। ভাবিলাম, কলিকাতা হাইকোর্টে কাজ না করিয়া, পাটনা হাইকোর্টে কাজ করিতে হইবে। কিছুদিন পরে যখন সংবাদ আসিল, উড়িষ্যার মামলা, পাটনা হাইকোর্টের জজ্‌রা, বছরে তিন-চারিবার সার্কিটে যাইয়া, কটকে বিচার করিয়া আসিবেন, তখন পুনর্মূষিক হইয়া জেলার উকিলদের সঙ্গে মিশিয়া কাজ করিতে হইবে, এবং আয়ও খুব কমিয়া যাইবে, বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। আমার প্রায় সব মক্কেল উড়িষ্যাবাসী, কটকে ফিরিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

একটি সংবাদ পাইয়া মনে কিছু আশার সঞ্চার হইল। শুনিলাম, একজন বিহারীকে পাটনা হাইকোর্টের জজ্ করা হইবে, আমার বন্ধু সুলতান্ আহমদ্‌কে সরকারি এড্‌ভোকেট্ কিংবা সহকারী এড্‌ভোকেট্ করা হইবে, এবং উড়িষ্যার কোন আইন ব্যবসায়ীকে খুব সম্ভব হাইকোর্টের সরকারি উকিল করা হইবে। পাটনা হাইকোর্টের সরকারি উকিল হইতে চেষ্টা করিব, স্থির করিলাম, এবং ঐ বিষয়ে সাহায্য পাইবার উদ্দেশ্যে, কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সার্ লরেন্স্ জেন্‌কিন্সের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম।

জেন্‌কিন্সের মত ভদ্র এবং উচ্চ-হৃদয়ের প্রধান বিচারপতি খুব কম দেখিয়াছি। কিন্তু তাঁর সহিত দেখা করিতে গিয়া কিছু গোলে পড়িলাম। আগে কখন তাঁর সঙ্গে দেখা করি নাই, স্বার্থ লইয়া প্রথম যাইতেছি, তাহা ছাড়া, তিনি উড়িষ্যা বিভাগেব মামলা বার কয়েকের বেশি বিচার করেন নাই, আমাকে ভাল জানেন না, হয়ত সাহায্য করিতে আগ্রহ প্রকাশ কবিবেন না। সাদাসিধে ভাবে কথা কওয়া আমার বরাবরই অভ্যাস, ঐ দুই কারণে আমার বক্তব্য বলিতে ইতস্তত করিতেছি, তাহা প্রথমেই তাঁকে বলিলাম। উচ্চ-হৃদয়ের লোকের ধরণই অনন্য-সাধারণ। আমার প্রথম কারণ সম্বন্ধে মৃদু হাসিয়া তিনি বলিলেন, অনর্থক তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে যাই নাই, সেজন্য অসন্তোষের কোন কারণ হইতে পারে না। দ্বিতীয় কারণ সম্বন্ধে যাহা বলিলেন, তাহা শুনিব আশা করি নাই। তিনি বলিলেন, আমার কথা তাঁর বেশ স্মরণ আছে, যদিও কয়েক-বার মাত্র আমাকে কাজ করিতে দেখিয়াছেন, আমার সম্বন্ধে তাঁব ধারণা ভাল, এবং হাসিয়া বলিলেন, আইন ব্যবসায়ীদের সম্বন্ধে জজ্‌দের ধারণা করিবার জন্য, কয়েকটা মোকদ্দমাই যথেষ্ট। অতিশয় সহৃদয়ভাবে আমার সব কথা শুনিয়া বলিলেন, হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির নিয়ম নয় কাহাকেও সার্টিফিকেট দেওয়া, তবে আমার আবেদনে ইহা বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি আমার সম্বন্ধে যে কোন অনুসন্ধানের উত্তর বিহার গভর্ণমেণ্টকে দিবেন, প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, জজ্ হম্‌উড্ আমাকে জানেন কি না। আমি বলিলাম, তাঁর কোর্টে অসংখ্যবার কাজ করিয়াছি। জেন্‌কিন্স্ তৎক্ষণাৎ হম্‌উড্‌কে আমার সম্বন্ধে একখানি চিঠি দিয়া বলিলেন, বিহারে হম্‌উড্ অনেক দিন কাজ করিয়াছেন, আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারিবেন, আমি যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করি।

জজ্ হম্‌উডের সঙ্গে দেখা করিতে বাধ্য হইলাম। পূর্ব্বে তাঁর সঙ্গে কখন দেখা করি নাই। তাঁর কক্ষে প্রবেশ না করিতেই, বড় গলায় বলিয়া উঠিলেন, তাঁর সঙ্গে আমার দেখা করিবার জন্য কাহারও নিকট হইতে কি চিঠির দরকার? খুব হৃদ্যতার সহিত কথোপকথন করিয়া, সাধ্যমত আমাকে সাহায্য করিবেন বলিলেন।

কটকে ফিরিয়া আসিবার সময়ে, আমার পরিচিত জজ্‌দের সঙ্গে দেখা করিয়া বিদায় লইলাম। সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় খুব অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, কলিকাতা হাইকোর্টে থাকিলে কি আমার উন্নতি হইত না? জজ্ কক্স্ অন্য কথার সঙ্গে, কটকে তখন সিভিলিয়ান্ জজ্ কে আছেন জানিতে চাহিলেন, এবং তাঁকে আমার সম্বন্ধে চিঠি দিবার ইচ্ছা আপনা হইতে প্রকাশ করিলেন। আমি বিনীতভাবে বলিলাম, হাইকোর্টে তাঁদের নিকটে স্নেহ-ভাজন হইবার পর, জেলার জজের কাছে চিঠি লইয়া যাইতে ইচ্ছা করি না। আমার উত্তর শুনিয়া, কক্স্ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, হাইকোর্টের উকিলের যোগ্য উত্তর হইয়াছে। জজ্ বসন্তকুমার মল্লিকের সঙ্গে, ঘটনাক্রমে কটকে দেখা হইল। তাঁর কোর্টে অনেক মামলা করিয়াছিলাম, সার্‌কিট্ কোর্টে ওকালতি করিতে আসিয়াছি শুনিয়া, যতদূর সম্ভব অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, আমার কলিকাতা হাইকোর্ট ছাড়া খুবই অনুচিত হইয়াছে।

ক্ষুণ্ণমনে কটকে ফিরিয়া আসিলাম। লর্ড হার্ডিঞ্জ্, নূতন পাটনা হাইকোর্টের উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করিবেন, পাটনায় যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ পত্র পাইলাম। পাটনায় রায় বাহাদুর পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহের অতিথি হইলাম। তিনি বলিলেন, খুব সম্ভব আমি পাটনা হাইকোর্টের সরকারি উকিল হইব। তাঁর অন্য একজন অতিথি, পাটনা সরকারি দপ্তরখানার বড় কর্ম্মচারী বলিলেন, কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জেন্‌কিন্সের সুপারিশের জন্য খুব সম্ভব আমি ঐ কাজ পাইব। জওলাপ্রসাদ জজ্ হইলেন, মাসুক্ সরকারি এড্‌ভোকেট্, এবং সুলতান্ আহমদ্ সহকারী এড্‌ভোকেট্ হইলেন, তাঁরা সকলেই পাটনার লোক, উড়িষ্যা হইতে আমার সরকারি উকিল হওয়া যে একরূপ নিশ্চিত, আমার তাহাই মনে হইল। দিন কয়েক পরে শুনিলাম, পাটনা জেলা কোর্টের উকিল ফকরুউদ্দিন্, হাইকোর্টের সরকারি উকিলের কাজ পাইলেন। ফকরুউদ্দিন্ পরে পাটনা হাইকোর্টের জজ্ হইয়াছিলেন, এবং অবশেষে পাটনা গভর্ণমেণ্টের মিনিষ্টার্ হইয়া, মৃত্যু পর্য্যন্ত ঐ কাজ করেন।

কটকে ওকালতি করিতে লাগিলাম। কলিকাতায় থাকিবার সময়ে যে সব মামলা আমি একলাই পাইতাম, তাহা কটকের উকিলদের মধ্যে ভাগ হইতে লাগিল, আমি কিছু পাইলাম। ধীরে ধীরে আবার জেলার উকিল হইলাম।

দুই বছর এই ভাবে কাটিবার পর, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে, আমার বন্ধু সুল্‌তান্ আহামেদ্, সরকারের তরফ হইতে বড় একটি ফৌজদারি মামলা চালাইবার জন্য কটকে আসিলেন। তখন মানুক্ সরকারি এড্‌ভোকেটের কাজ ছাড়িয়া দিয়াছেন, এবং তাঁর স্থানে সুল্‌তান্ আহমেদ্ নিযুক্ত হইয়াছেন। সুল্‌তান্ আহমেদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া স্থির হইল, পাটনা হাইকোর্টে আমার ওকালতি করিতে যাওয়া উচিত।

সাহসে ভর করিয়া অগ্রগামী হইতে আমি সর্ব্বদা প্রস্তুত। খুব আড়ম্বরের সহিত, খৃষ্টাব্দ ১৯১৭ অক্টোবর মাসে, পাটনায় উপস্থিত হইলাম। আড়ম্বরের মানে, যাহা না লইলে চলিত, সেরূপ অনেক জিনিষ সঙ্গে লইয়া পাটনায় পৌছিলাম। আইন বই ছাড়া, অনেক আস্‌বাব্, লোক-জন, জুড়ি-গাড়ি, ইত্যাদি, সঙ্গে চলিল। একশত টাকা ভাড়া দিয়া এক্‌জিবিসন্ রোডে বাড়ি লইলাম। পাটনায় আসিয়া একজন উকিল বন্ধুর নিকট শুনিলাম, সেখানে রটিয়াছে, উড়িষ্যা হইতে একজন বড় উকিল গাড়ি-ঘোড়া এবং রাশীকৃত জিনিষ লইয়া হাইকোর্টে ওকালতি করিতে আসিতেছে! একথাগুলি আমি খুবই মনের দুঃখে লিখিতেছি, এই আশায়, আমার মত পরিমানজ্ঞানশূন্য কোন পাঠক পড়িয়া হয়ত উপকৃত হইবে। ঐ সময়ে, আমার অপেক্ষা বয়সে ছোট, কলিকাতা হাইকোর্টের দুইজন উকিল বন্ধু, পাটনা হাইকোর্টে ওকালতি করিতে আসে। একজন বাঁকিপুরের বাজারে, পঁচিশ টাকায় সামান্য একটি বাড়ি লইয়া ছিল, এবং অন্য জন এক আত্মীয়ের বাড়িতে থাকিয়া, দীনভাবে ওকালতি আরম্ভ করে। উভয়ে, বছর কয়েক পরে, রোজগারের পয়সায় বাড়ি প্রস্তুত করিয়া স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইল, আর আমি—এক বছর থাকিয়া, পাটনার লীলা সাঙ্গ করিয়া চলিয়া আসিলাম!

পাটনায় যাইবার কিছুদিন পূর্ব্বে, সাহাবাদ জেলায়, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ভয়ানক দাঙ্গা হইয়াছিল। সাহাবাদে মুসলমানের সংখ্যা কম, হিন্দুরা তাদের উপর অত্যাচার করিয়াছিল। আইন জারি করিয়া, কয়েকটি ট্রাইবুনেল্ আরায় বসান হইল, হিন্দু আসামীদের বিচারের জন্য। সুল্‌তান্ আহমেদ্ সরকার তরফ হইতে একটি ট্রাইবুনেলে মামলা চালাইতে গেলেন, আমি পাটনায় যাইবার দুই মাস পরে, অন্য একটি ট্রাইবুনেলে, একজন ব্যারিষ্টারের সঙ্গে, সরকারি উকিল নিযুক্ত হইলাম। আমার দৈনিক ফি মোটা টাকা নির্দ্ধারিত হইল। চারিমাস ট্রাইবুনেলে কাজ করিতে হইয়াছিল, তার মধ্যে

তিন মাস আব্দুল্ আজিজ্ ব্যারিষ্টারের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া কাজ করিয়াছিলাম, যিনি পরে পাটনা গভর্ণমেণ্টের একজন মিনিষ্টার্ হইয়াছিলেন। ঐ সময় হইতে আজিজের সঙ্গে আমার বন্ধুতা স্থাপন হইল।

হাইকোর্টে ওকালতি করা ছাড়া, পাটনায় যাইবার আমার আর একটি উদ্দেশ্য ছিল। তখন বিহার এবং উড়িষ্যা প্রদেশের উকিলদের ভিতর হইতে, জন কয়েক জেলার জজ্ লইবার প্রস্তাব চলিতেছিল। উড়িষ্যা হইতে নিশ্চয় একজন জজ্ হইবে, এবং হাইকোর্টে থাকিলে খুব সম্ভব আমাকে মনোনীত করা হইবে, সেজন্যও আগ্রহ করিয়া পাটনায় গিয়াছিলাম। অনুসন্ধান করিয়া যখন জানিলাম, ঐ প্রস্তাবমত কাজ হইতে অনেক দেরি আছে, কতকটা ভগ্নোৎসাহ হইলাম। তাহা ছাড়া, পাটনায় থাকা একবছর না পূরিতে, অন্য কয়েকটি কারণেও পাটনা ছাড়িবার জন্য ব্যগ্র হইলাম। পাটনায় আমার স্ত্রীর শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হওয়াতে, তাঁকে কটকে পাঠাইতে হইল; চারিদিনের মধ্যে, কটকে, আমার ছোট ছেলে প্রভাত, আমার মাতা এবং জ্যাঠার মৃত্যু হইল; ওকালতি হইতে আশানুরূপ আয় যদিও তখন হয় নাই, খরচ খুব বেশি হইতেছিল। যদি বড় চালে পাটনায় না থাকিতাম, সেখানে যাইবার পরই যত টাকা রোজগার করিয়াছিলাম, চারি বৎসর বেশ অপেক্ষা করিতে পারিতাম, এবং তাহা হইলে নিশ্চয়ই সময়ে ভাল পসার হইত। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু, কটকের উকিল জানকীনাথ বসু, পাটনা হইতে শুনিয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন, পাটনা ছাড়িয়া খুব ভুল করিয়াছি। এক হিসাবে, ভুল যে জীবনের গোড়া হইতে করিয়া আসিতেছি, তার কি কোন সন্দেহ আছে?

কাহারও সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া, আসিবার পনর মাস পরে, হঠাৎ পাটনা ত্যাগ করিলাম। কটকে ফিরিয়া আসিলে ভাল হইত, কিন্তু এত শীঘ্র কটকে যাইতে লজ্জা বোধ হইল, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে পুনরায় কলিকাতায় উপস্থিত হইলাম। মাস কয়েক পরে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল কলেজের প্রফেসারের কাজ লইতে হইল। সব ব্যবসায় অপেক্ষা ওকালতি ব্যবসায়ে, একস্থানে মন স্থির করিয়া না থাকিলে, পসার কখনই হয় না। অনেক দিন পরে, কলিকাতা হাইকোর্টে আসিয়া দেখিলাম, কাজের সেরূপ সুবিধা হইতেছে না।

রোজগার সেরূপ না হউক, আইন এবং দর্শনের গবেষণা করিয়া দিনগুলি বেশ কাটিতেছিল, কিন্তু আমার ভাই শরৎ নিশ্চিন্ত হইয়া কলিকাতায় থাকিতে

দিল না। কটকের সরকারি উকিলের পরিবর্ত্তন হইবে, আমি কটকে থাকিলে অনায়াসে সরকারি উকিল হইতে পারিব, কলিকাতায় আসিয়া সে আমাকে বুঝাইল। কিছুদিন পরে, বেশি টাকা রোজগারের মোহে পড়িয়া, অম্লান-বদনে ল কলেজের অধ্যাপকের কাজে ইস্তফা দিয়া, ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের শেষে, পুনরায় কটকে উপস্থিত হইলাম!

কটকে ফিরিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে অনেক টাকা পাইতে লাগিলাম। আমার কতগুলি বাঁধা নিয়ম ছিল, তাব কখন লঙ্ঘন হইত না। কম টাকা লইয়া কখন কাজ করিতাম না; হাইকোর্টে কাজ করিবার পর, যত টাকা দিতে মক্কেল ইচ্ছুক হউক না কেন, মুন্সেফ্ কোর্টের কাজ লইতাম না; যাব সঙ্গে বন্ধুতা আছে, তার কোর্টে কাজ করিতে যাইতাম না। শেষ নিয়ম সম্বন্ধে, ঐ সময়ের একটি ঘটনা বেশ স্মরণ আছে। একদিন সন্ধ্যার সময়ে, কটকের সর্ব্বপ্রধান মোক্তার দামোদর, আমাকে একটি ফৌজদারি মামলায় নিযুক্ত করিতে আসিলেন। আসিয়াই বলিলেন, মক্কেল আমাকে দৈনিক একশত টাকা ফি দিতে রাজি আছে, বেশি যদি চাই তাও দিতে পারে। আমি অমনি হাকিমের নাম জিজ্ঞাসা করিলাম। দামোদর কিছু ইতস্তত করিয়া বলিলেন, মামলা সদর সব্‌ডিভিজনের ডেপুটি খান্ বাহাদুর দিল্‌বার আলির কোর্টে। দিল্‌বারের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল, সে আমার অপেক্ষা বয়সে ছোট, আমাকে বড ভাইয়ের মত সম্মান করিত। দামোদর আমার নিয়মের বিনয় শুনিয়াছিলেন, তাই হাকিমের নাম বলিতে ইতস্তত করেন। আমি দিল্‌বারের কোর্টে যাইব না বলিলাম। দুইদিন পরে, দিল্‌বার আমাকে বলিল, সব বড় মামলাই তার কোর্টে, তার কোর্টে না গেলে আমার লোকসান হইবে। আমি বলিলাম, তুমি ত আর বরাবর সদর সব্‌ডিভিজনের ভার লইয়া থাকিবে না।

কটকে ফিরিয়া আসিবার একমাস পরে, কটক ম্যুনিসিপালিটির নূতন কমিশনর্ নির্ব্বাচন আরম্ভ হইল। কজিন্ সাহেব, কটকের ম্যাজিষ্ট্রেট্, আমাকে কমিশনর মনোনীত করিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন, স্থানীয় লোকেরা আমাকে পছন্দ করে এবং আমাকে চেয়ারম্যান্ নির্ব্বাচন করিতে পারে। তাহাই হইল। কটকে পুনরায় ওকালতি করিতে আসিবার মাস কয়েক পরে, আমি ম্যুনিসিপালিটির চেয়ারম্যান্ নির্ব্বাচিত হইলাম।

কথায় যা বলে, মানুষের চেষ্টা একদিকে এবং ভাগ্য অন্য দিকে। ম্যুনিসিপালিটিতে না ঢুকিলে, অল্প সময়ের মধ্যে, কটকের সর্ব্বপ্রধান উকিল না হই, ভাল পসারওয়ালা উকিলদের মধ্যে যে একজন হইতাম, তার কোন সন্দেহ ছিল না। চেয়ারম্যান্ হইয়াও ক্ষতি হইত না, যদি প্রচলিত রীতি অনুযায়ী কেবল সই করিয়া, অন্যলোকের উপর কাজের ভার দিয়া, খাতিরের সাহায্যে নিজের ওকালতি পরিপুষ্ট করিয়া লইয়া দিনগুলি কাটাইতাম! কিন্তু জীবনে কাজের ভার লইয়া ঠকাইতে কখন পারি নাই। ফলে হইল, মক্কেলরা সব সময়ে আমাকে বাড়িতে পাইত না, এবং তাদের ধারণা হইল, আমি ম্যুনিসিপালিটি লইয়া ব্যস্ত আছি, ওকালতি করিবার অবসর কম। যেরূপ কাজ বাড়িবার কথা, না বাড়িয়া, ক্রমশ কমিতে লাগিল।

সেজন্য চিন্তিত হইলাম না। দেখিলাম, স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের আমার সম্বন্ধে যেরূপ ভাল ধারণা, শীঘ্র সরকারি উকিল হইব, এবং তার পর ম্যুনিসিপালিটিতে আর না ঢুকিয়া, মন দিয়া ওকালতি করিলে সব পুষাইয়া যাইবে।

সরকারি উকিল পরিবর্ত্তনের সময় আসিল। আমি একজন প্রার্থী হইলাম। আমার প্রধান পৃষ্ঠপোষক, উড়িষ্যাবিভাগের কমিশনর্, জেলার জজ্ এবং ম্যাজিষ্ট্রেট্‌কে লইয়া, কমিটি করিয়া, কেবল আমার নাম উপরে পাঠাইলেন। কিছুদিন পরে, ঐ কমিশনর অবসর লইয়া বিলাতে ফিরিয়া গেলেন। একমাস পরে জানিলাম, আমি সরকারি উকিল না হইয়া, আমার অপেক্ষা দশ বছরের জুনিয়ার্ একজন উড়িয়া উকিল ঐ কাজ পাইয়াছেন।

ম্যুনিসিপালিটির কাজ শেষ হইবার পর, ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ওকালতির অবস্থা দেখিয়া মনের ক্ষোভ বাড়িয়া উঠিল। জীবনে কোন দুঃখ আমাকে বেশি দিন কষ্ট দেয় নাই, কিন্তু ওকালতির উপর বিতৃষ্ণা জন্মিল। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে সরকারি চাকুরি লইলাম, ওকালতি করিব না, যুক্তি করিয়া। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে, ঐ কাজ হইতে অবসর লইবার পর, ওকালতি করিতে পারিতাম, কিন্তু এ পর্য্যন্ত করিতে ইচ্ছা হয় নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দেশের সেবা

রাজনীতিক উন্নতির জন্য জনসাধারণের চেষ্টা, আমাদের দেশে বেশি দিন হয় নাই। ভারতবর্ষ যখন হিন্দুর অধীনে ছিল, রাজা এবং তাঁর মন্ত্রীরাই দেশের মঙ্গল চিন্তা করিতেন, সাধারণের মধ্যে, আন্দোলনের দ্বারা, শাসন সম্বন্ধীয় কোন কাজ অনুষ্ঠিত হইত না। দেশে কোন একটি বাঁধা সম্প্রদায় ছিল না, যারা সজাগ থাকিয়া শাসনপ্রণালীর দোষগুণ বিচার করিত। প্রজারা রাজার অহিতকর কাজে তাদের অসন্তুষ্টি অবশ্য জানাইত, কিন্তু এখনকার মত একটা প্রতিপক্ষ দল ছিল না, যাদের প্রধান কাজ, অজনপ্রিয় ব্যবস্থা রোধ করিতে চেষ্টা করা। দেশ যখন মুসলমানের করতলগত হইল, অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। যাহা কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, ধর্ম্ম লইয়া, শাসনকর্ত্তাদের পক্ষ হইতে। মুসলমান শাসনকর্ত্তারা. যতদূর পারিলেন, হিন্দুদের মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করাইতে চেষ্টা করিলেন। যারা স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিল না, তারা শাসন-কর্ত্তাদের প্রীতি-ভাজন হইতে পারিল না। তবুও সাধারণ হিন্দুরা, মিলিত হইয়া তাদের রাজনীতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে কখন চেষ্টা করে নাই। ম্লেচ্ছ বলিয়া হিন্দুরা মুসলমানকে অবজ্ঞার চোখে দেখিয়াছে, মুসলমান শাসনকর্ত্তার স্থানে হিন্দু শাসনকর্ত্তা কামনা করিয়াছে, কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্য, হিন্দুসাধারণ কখন একযোগ হইয়া, দেশশাসনের পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটন করাইতে চেষ্টা করে নাই। ইহার প্রধান কারণ যে, জনসাধারণের মধ্যে রাজনীতিক উপলব্ধির অভাব, তার কোন সন্দেহ নাই। ব্যক্তিবিশেষের হৃদয়ে স্বদেশপ্রীতি জাগিয়া উঠিয়াছে—বাঙ্গলায় প্রতাপাদিত্য, রাজপুতানায় রাণা প্রতাপ ও রাজসিংহ, দেশকে স্বাধীন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—কিন্তু দেশকে উন্নত এবং স্বাধীন করিবার সার্ব্বজনীন ইচ্ছা, এবং তার জন্য আত্মবলি দিবার উদ্দীপনা, আমরা ইয়োরোপবাসীদের সংসর্গে আসিয়া শিখিয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্র, "বন্দেমাতরং" রচনা করিয়া অমর হইয়াছেন, কিন্তু তাঁর উপন্যাসের অনেকগুলি চরিত্র যেরূপ পাশ্চাত্যভাবে পরিষিক্ত, তাঁর ঐ প্রসিদ্ধ দেশ-প্রীতিব্যঞ্জক গান, সেইরূপ পাশ্চাত্য দেশ-প্রীতি কল্পনায় অনুপ্রাণিত। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী

গানগুলিও পাশ্চাত্য আদর্শে রচিত। ইংরাজী শিক্ষার প্রথম ফল হইতেছে, আমাদের হৃদয়ে স্বদেশ-প্রীতির জাগরণ। তার জন্য লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই। মানবজাতিকে আমরা যতই কেন খণ্ড খণ্ড করিয়া কল্পনা করিতে চেষ্টা করি, আসলে কিন্তু তাহা করা যায় না। মানবজাতি একটি অভিন্ন সমষ্টি; ভিন্ন ভিন্ন দেশের মধ্যে, আদর্শ, রীতি-নীতির আদান প্রদান অবশ্যম্ভাবী, এবং ঐরূপেই মানবজাতির একতা এবং চরম উন্নতি সম্ভব। কয়েক শতাব্দী আগে, কিংবা কয়েক শতাব্দী পরে, কোন দেশ উন্নতির পথে প্রথম অগ্রসর হইয়াছে, তার জন্য আত্মশ্লাঘা কিংবা আত্মগ্লানির বিশেষ কোন কারণ নাই। প্রত্যেক দেশের অন্য দেশকে দিবার বিশিষ্ট জিনিষ আছে। যদি আমরা ইয়োরোপবাসীদের নিকট রাষ্ট্রনীতিক কল্পনার জন্য ঋণী, ইয়োরোপ, এমন কি সমস্ত পৃথিবী, ভারতের নিকট, জ্ঞানজগতে এরূপ ঋণী হইয়া পড়িবে, যার তুলনায় আমাদের ঋণ অতি সামান্য। সেদিনের আর বেশি বিলম্ব নাই।

অরবিন্দ এবং তাঁর সমসাময়িক জনকয়েকের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে, স্বদেশপ্রীতি অগ্নিশিখার ন্যায় বাঙ্গালীর হৃদয়ে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে নাই। মানবের সব চেষ্টাই প্রথমে একদিকের শেষ সীমায় গিয়া পড়ে, ক্বচিৎ উচিত মধ্য-পথ অবলম্বন করিয়া থাকে। অরবিন্দের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে যারা রাজনীতি আলোচনা করিত, তারা বছরের কয়েকটা দিনের জন্য জাগিয়া উঠিয়া, আবেদন নিবেদনের পালা অভিনয় করিয়া, বাকি সময় সুষুপ্তির কোলে আশ্রয় লইত। যথার্থ দেশ-সেবার জন্য যত ব্যগ্র না হউক, দেশের লোকের চোখে দেশ-হিতৈষী হইবার আকাঙ্ক্ষা তাদের পূর্ণমাত্রায় ছিল। চাঁদার খাতার বহর খুব ছিল, কিন্তু হিসাব-নিকাশের দায়িত্ব ছিল খুব কম! অরবিন্দের যুগে, দেশ শীঘ্র অপর দিকের শেষ সীমায় গিয়া পড়িল। আগেকার অনেক দোষ সংশোধিত হইল, দেশের জন্য আন্তরিক প্রীতি এবং আত্মত্যাগ কর্ম্মীদের অনুপ্রাণিত করিল, কিন্তু পন্থার অনুসন্ধান করিতে গিয়া, পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে, অনেকে বিপ্লববাদী হইয়া উঠিল। যেরূপ বুদ্ধির ভ্রমে লোকেরা এক সময়ে মনে করিয়াছিল, শাসনকর্ত্তাদের অনুকম্পার প্রার্থী হইলে দেশের মঙ্গল সাধন হইবে, আবার বুদ্ধির ভ্রমে, নিরস্ত্র দেশকে বিপ্লবের পথে লইয়া গেলে উন্নতির চরম হইবে, লোকেরা ভাবিল। এক ভ্রান্তি হইতে মুক্ত হইয়া অন্য এক ভ্রান্তিতে লোকদের চিন্তা জড়াইয়া পড়িল।

তারপর গান্ধীর যুগ আসিল। আচার-নীতির সহিত রাজনীতির অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, আমি নয় বছর পূর্ব্বে, আগেকার দৈনিক "ফরওয়ার্ড" কাগজে আলোচনা করিয়াছিলাম। রাজনীতি, আচারনীতি বা ধর্ম্মপথ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে, কখনই দেশের স্থায়ী মঙ্গল হয় না। অবশ্য, ধর্ম্মের দ্বারা, এখানে কোন জাতিগত ধর্ম্ম বুঝায় না। ধর্ম্ম বা সৎনিয়মের যে কল্পনা গ্রহণ করিলে, জগৎ ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হয়, ধ্বংসের পথে নয়, ধর্ম্মের দ্বারা এখানে তাহাই বুঝিতে হইবে। সাম্প্রদায়িক যাজকের আশীর্বচন দ্বারা, যুদ্ধকে ধর্ম্মযুদ্ধে পরিণত করিয়া লইয়া, কিছুদিনের জন্য রাজ্যবিস্তার করিতে পারিলে ধর্ম্মপথ অনুসরণ করা হয় না। উপস্থিত যে কোন পন্থার দ্বারা উদ্দেশ্য সাধন হইলে, তাকে সৎপন্থা বলা যায় না। যে নিয়মের অধীন হইয়া অগ্রসর হইলে, জগতে সকলের সমভাবে উন্নতি হইতে পারে, সেজন্য যতই কেন সময় লাগুক, তাকেই ধর্ম্মপথ বলে। কত শত রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে, কয়টা ধ্বংসের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়াছে? জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, ধর্ম্মবিরোধী কোন রাষ্ট্র-সমষ্টি, বেশি সময়ের জন্য জীবিত থাকে নাই। কোন একটি রাষ্ট্র, জনকয়েক লোকের মঙ্গলের জন্য গঠিত হইয়া কখনই স্থায়ী হইতে পারে না। প্রত্যেকটি মানব-প্রাণ, যাহা পশুর ন্যায়, অগণিত সংখ্যায়, বলির জন্য যুদ্ধে পাঠান হয়, অভিব্যক্তির জন্য উন্মুখ রহিয়াছে। যে নীতি অবলম্বনের ফলে, দেশী, বিদেশী, স্বধর্ম্মী, বিধর্ম্মী, প্রত্যেক মানুষের জন্য, হৃদয়ে সমবেদনা ফুটিয়া উঠে না, সে নীতি ক্ষণস্থায়ী হইতে বাধ্য, কারণ তাহা জীবন-বিকাশ নিয়মের বিরোধী। সে নীতি রাজনীতিতে পরিণত হইলে, কখনই দেশের স্থায়ী মঙ্গল হইতে পারে না। অনেকে বিদ্রূপ করিয়া বলিয়া থাকে, রাজনীতি অনুসরণ করিতে গিয়া আবার ধর্ম্মের দোহাই! যেন ইহা একটি স্ববিরোধী কল্পনা! তাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে কল্পনা যেরূপ পরিষ্কার, রাজনীতি সম্বন্ধে ধারণা সেইরূপ গভীর! যতদিন রাজনীতি, আচারনীতি বা ধর্ম্মের উপর স্থাপন না হইতেছে, ততদিন রাজনীতি ক্ষণভঙ্গুর হইয়া থাকিবে।

গান্ধীর যুগে দেখা যায়, রাজনীতির এককোণে ধর্ম্ম স্থান পাইয়াছে। পাশ্চাত্য ধরণে যারা রাজনীতি অনুশীলন করিতে চায়, তাদের ইহা পছন্দ না হইলেও, যতদিন গান্ধী বাঁচিয়া থাকিবেন, ভারতীয় রাজনীতি হইতে ধর্ম্ম একেবারে নির্ব্বাসিত হইবে না।

কিন্তু সম্মুখে দেখিতে পাই, নূতন এক যুগের সূত্রপাত হইয়াছে, যাহা সময়ে বিপ্লবের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে। এই স্বদেশীর দিনে, ইহা সম্পূর্ণ বিদেশী আমদানি! এই নবযুগের বার্ত্তাকে, প্রচলিত কথায়, সমাজতন্ত্র, সমষ্টিবাদ বা সাধারণ-সত্ববাদ, বলা হইয়া থাকে। কার্ল মার্ক্স্‌কে এই নব বাণীর প্রবর্ত্তক বলা যাইতে পারে। তাঁর মতে, ধন এবং ভূমিতে ব্যক্তিবিশেষের সত্ব রহিত করা দরকার, দেশের উপার্জ্জিত অর্থ সকলের মধ্যে সমভাবে বিতরিত হওয়া উচিত। দেশের সমস্ত ধন শ্রমিকদের দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে, অতএব তাহা তাদেরই ন্যায্য প্রাপ্য। এই মত, রুশ্‌দেশে যোল আনা, এবং ইয়োরোপের অন্য সব দেশে, কম-বেশি প্রবেশ লাভ করিয়াছে। সম্প্রতি, জহরলাল, এই মতাবলম্বী হইয়াছেন, এবং কংগ্রেসের সভাপতি হইয়া ঐ মতের পোষকতা লাভ করিবার জন্য খুবই চেষ্টা করিতেছেন।

এক শ্রেণীর শিক্ষিত লোক আছে, যারা নূতন কোন চিন্তার স্রোত আসিলে, তার পক্ষপাতী শীঘ্র হইয়া পড়ে। কেবল আমাদের দেশে নয়, সব দেশে ইহা ঘটিয়া থাকে। তার প্রধান কারণ, তারা ভাবিতে শিখিয়াছে, যাহা কিছু পুরাতন তাহা অকর্ম্মণ্য, তার উপকারিতার দিন চলিয়া গিয়াছে, নূতন ভাবে, নূতন ধরণে, জাতিকে, সমাজকে, গড়িয়া তোলা দরকার। কোন একটি নূতন ধারণা, ইহাদিগকে সহজে প্রলুব্ধ করে এবং অনেক সময়ে তারা মনে করে, নূতন ধারণা বা প্রণালীর পক্ষপাতী হইয়া অপেক্ষাকৃত অধিক বিবেচনার পরিচয় দিতেছে। স্পষ্টভাবে তারা যে এইরূপ চিন্তা করে, তাহা নয়, কারণ কথাটা আমি যে ধরণে বলিলাম, তাহাতে হাস্যাস্পদ হইবার সম্ভাবনা বেশি, কিন্তু ঐরূপ ধারণা প্রচ্ছন্নভাবে তাদের মনে যে থাকে, তার কোন সন্দেহ নাই। ঐ ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, তারা মনে বল পায়, নূতন মতের আংশিক সত্যের দিক্‌ হইতে। বস্তু বিষয় সম্বন্ধে সত্য, চিরকালের জন্য, কোন এক সময়ে আবিষ্কৃত হইতে পারে না, কারণ, জ্ঞান ক্রমবিকাশ নিয়মের অধীন। কিন্তু ইহা হইতেছে, অনেক সময়ে, বিষয়ের সূক্ষ্ম এবং ব্যবহারিক দিকের কথা। স্থূলভাবে কতগুলি সত্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে, যার পরিবর্ত্তন কখন সম্ভব নয়। দৃষ্টান্ত না দিলে, কথাটা ভাল বুঝান যায় না। যে অপরকে নিজের মত ভালবাসে, সে যথার্থই মহৎ। এই ধারণার মধ্যে, চিরকালের জন্য যে

একটি গভীর সত্য নিহিত আছে, কোন দেশের লোক, কোন সময়ে, তাহা অস্বীকার করিবে না। যীশু খৃষ্ট বলিয়াছেন, তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসিবে। তার বহু পূর্ব্বে উপনিষদে, অধিক সুন্দর এবং মর্ম্মস্পর্শী-ভাবে বলা হইয়াছে, সর্ব্বদা সব মানুষকে আত্মাতে এবং আত্মাকে সব মানুষে অবস্থিত মনে করিবে। এ সত্যের কি কখন পরিবর্ত্তন হইতে পারে? না। এ সম্বন্ধে যাহা কিছু পরিবর্ত্তন সম্ভব, তাহা ব্যবহারিক দিক হইতে। কোন একটি সত্য কথায় গ্রহণ করিলে, তার দাবি পূরণ করা হয় না, কর্ম্ম-জগতে তাকে ব্যবহারে আনা দরকার।

যারা মনে করে, জগতে সমাজ-তন্ত্রের যুগে, সমদর্শীভাব প্রথম দেখা দিয়াছে, তাদের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। বহুকাল হইতে জ্ঞানী লোকেরা বলিয়া আসিতেছেন, সকলকে সমান ভাবে দেখা উচিত, কিন্তু কোন দেশে, কর্ম্ম-জগতে, ইহার উচিত প্রয়োগ হয় নাই। যীশুর দেশে শতকরা নব্বুই জন লোককে পদদলিত করিয়া রাখা হইয়াছে, আর যে আর্য্য-ভূমিতে, আত্মা সব মানুষে আছেন, এই চিরসত্যবাণী, মানবজাতির শৈশব-কালে উচ্চারিত হইয়াছিল, সেখানে কোটি কোটি লোক অস্পৃশ্য! সব দেশে, অধিকাংশ লোকেরাই শ্রমজীবী, এবং তারা সমাজের মেরুদণ্ড, কিন্তু সেই শ্রমজীবীদের অবস্থা শোচনীয়, মুষ্টিমেয় উচ্চশ্রেণীর লোকেরা তাদের উপর অত্যাচার করিয়া আসিয়াছে। এখন শ্রমজীবীরা, শিক্ষার আলোক পাইয়া, সমাজে তাদের উচিত স্থান লইতে চেষ্টা করিতেছে। জগতে এ পর্য্যন্ত যে সব ইতিহাস লিখা হইয়াছে, এবং যাহা লোকেরা আগ্রহ করিয়া পড়ে, তাহাতে সমাজের শতকরা নব্বুই জনের কথা, অর্থাৎ শ্রমজীবীদের কথা, কিছুই পাওয়া যায় না। তাদের পীড়নের কথা, অনা-হারের কথা, সমাজের অতি অল্পসংখ্যক লোক তাদের সহিত কিরূপ পশুর মত ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে, ইতিহাসে তাহা লিখা নাই। ইতিহাসে লিখা আছে, রাজার দরবারের কথা, রাজার রাজ্যবিস্তারের কথা—যার মহৎ উদ্দেশ্য, শতকরা দুই তিনজনের আয় বৃদ্ধি করা—আর লিখা আছে, রাণী এবং জনকয়েক ধনীর ঘরের স্ত্রীলোকের হীরা, মুক্তা এবং মূল্যবান আভরণের কথা! যদি সমাজের ইতিহাস উচিতভাবে লিখা হইত, সমাজের শতকরা নব্বুই জনের কথা যদি ইতিহাসে স্থান পাইত, জগতের মুষ্টিমেয় লোক ছাড়া আর সকলে কিরূপ হাহাকারে দিন কাটাইয়াছে,

তাহা যদি প্রকাশ পাইত, বহুকাল পূর্ব্বে আগুন জ্বলিয়া উঠিত, এবং তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর লোকদের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইত। জগতে সে সময় এখন আসিয়াছে, শ্রমজীবীদের জাগরণ হইয়াছে।

সব বুঝিলাম, কিন্তু রোগের অপেক্ষা চিকিৎসা যে অতি ভয়ঙ্কর হইবার উপক্রম হইয়াছে! সমাজ-তান্ত্রিকেব সর্ব্বপ্রথম অমার্জ্জনীয় অসত্য বা ভুল হইতেছে, মানুষকে যন্ত্রস্বরূপ মনে করিয়া, সমাজ নামে একটি বড় যন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়া, তার ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যকে নষ্ট করা। ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য যে সব উন্নতির মূলে, এবং তাহা নষ্ট হইলে সমাজ যে একটা প্রাণশূন্য, আত্মাবর্জ্জিত, কারখানার কলের মত হইয়া দাঁড়াইবে, এই মতাবলম্বী লোকেরা তাহা বুঝিতে পারে না। সকলে সমান পরিমাণে অর্থের অধিকাবী হইবে, এক ধবণে খাইবে, একভাবে থাকিবে, একভাবে আনন্দ করিবে, একভাবে চিন্তা করিবে, এমন কি এক প্রকাবেব স্বপ্ন দেখিবে, ইহাতে অনাহার অদৃশ্য হইতে পারে, গৃহশূন্য হইয়া বৃক্ষতলে বাস বন্ধ হইতে পারে, কিন্তু আঁট-ঘাঁট বাঁধা মানুষেব জীবন পশুব জীবনে পরিণত হইবে। ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য নষ্ট না করিয়া কি শ্রমজীবীদের উন্নতি-সাধন হইতে পারে না? লোক অশিক্ষিত থাকিয়া যদি দিন না কাটায়, আহারের অভাবে কেহ কষ্ট না পায়, কেহ আশ্রয়শূন্য হইয়া না থাকে, সহায়তার অভাবে কেহ অর্থ উপার্জ্জন করিতে অক্ষম না হয়, শ্রমিক তার উচিত লভ্যাংশ পায়—এই উদ্দেশ্যগুলি সাধন হইলে যে উন্নতির পরাকাষ্ঠা হয়, তাহা নিশ্চয় কেহ অস্বীকার করিবে না। সাধারণতন্ত্র বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পক্ষপাতী দলের লোকদের উদ্দেশ্যও তাহাই। তবে ইহা সত্য, পৃথিবীর যে সব দেশে সাধারণতন্ত্র আছে, সাধারণের উন্নতির জন্য যাহা করা উচিত তাহা মুখের কথায় রহিয়াছে, কাজে খুবই কম হয়। তার প্রতিকার হইতেছে, কাজে যাহা করা উচিত ছিল, কড়া নিয়মের দ্বারা সেগুলি করা, তার প্রতিকার নয়, নূতন নামে একটি শাসণতন্ত্র চালাইয়া ঐ কাজগুলি করা, এবং ঐ সঙ্গে, যেন বহুকালের অত্যাচারের প্রতিশোধের জন্য, মানুষের ব্যক্তিত্ব লোপ করিবার ভীষণ একটি ষড়যন্ত্রের প্রশ্রয় দেওয়া! সকলের সাধারণ অভাব পূরণের পর, ব্যক্তিগত উদ্যম এবং ইচ্ছামত জীবন কাটাইবার কথা উঠিয়া থাকে। কেহ যদি চেষ্টার দ্বারা বেশি অর্থ উপার্জ্জন করে, তার

অর্থ কাড়িয়া লইয়া, যে আলস্যে দিন কাটাইয়া উপার্জ্জন করিতে পারে নাই, তাকে দেওয়া কখনই উচিত হইতে পারে না। লোকের সাধারণ অভাব পূরণ করা বেশ বুঝিতে পারি, কিন্তু তার অন্যায় দাবির প্রশ্রয় দেওয়া কখনই চলে না। তাহা হইলে, যত্ন, উদ্যম, ঐকান্তিক চেষ্টা, দেশের অর্থ বৃদ্ধির প্রধান কারণগুলির মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। তার পর, রাষ্ট্রের উপর ভার দিলে কি দেশের কখন স্থায়ী উন্নতি সম্ভব? রাষ্ট্রের ত স্বতন্ত্র হাত পা নাই, কিংবা মস্তিষ্ক বা বুদ্ধি চালনার ক্ষমতা নাই! রাষ্ট্র মানে, সরকার পক্ষীয় কতগুলি লোক লইয়া একটি বড় দল। একচটিয়া কোম্পানির যে দোষ, রাষ্ট্রের দ্বারা পরিচালিত কাজের সে দোষ অবশেষে হইতে বাধ্য, না হয় কিছুকাল পরে। জগতের শেষ ত আর এক শত কিংবা দুই শত বছরে হইতেছে না? যে সমাজ বহুকাল ধরিয়া থাকিবে, ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে, সর্ব্বদা তার মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার করিতে না পারিলে, এক হাজার বছর পরে যে সমাজ সেই সমাজই রহিবে! যাহাতে বেসরকারি কোম্পানি, অনুচিত ভাবে, জিনিষের দর বাড়াইতে না পারে, শ্রমিককে উচিত লভ্য অংশ দেয়, সেজন্য কড়া আইন জারি করিলে চলিবে। উদ্দেশ্য সাধন, ভালরূপে এবং স্থায়ীভাবে উদ্দেশ্য সাধন, যদি সকলের ইচ্ছা হয়, কোন একটি বিশেষ উপায় লইয়া কলহ বা বিপ্লবের সৃষ্টি করা, কখনই উচিত হয় না। কিন্তু মানুষ তাহা বুঝে না, যাদের বুদ্ধি উপস্থিত কয়েক বছরের সীমা অতিক্রম করিতে পারে না, যাদের অনুকরণের অধিক ক্ষমতা নাই, তারা নূতন একটা আবিষ্কৃত উপায় আঁকড়াইয়া ধরিয়া মনে করে, সর্ব্বদুঃখহর একটি প্রতিকার পাইয়াছে!

যদি বলি, সমষ্টিবাদীদের প্রচলিত কল্পনা, কেবল একটা সাদৃশ্যের উপর খাড়া করা হইয়াছে, তাহা কি কেহ বিশ্বাস করিবে? খুব সম্ভব, নয়। কিন্তু, বাস্তবিক তাহাই হইয়াছে। শরীর-বিজ্ঞান আলোচনা করিতে গিয়া, মানুষের দেহ যে একটি মণ্ডলীবদ্ধ বা ব্যবস্থাবদ্ধ সমষ্টি, স্থির করিতে বেশি সময় লাগে না। পাশ্চাত্য সমাজতান্ত্রিকেরা, সমাজের বিভিন্ন অংশগুলির, পরস্পরের সহিত নিকট সম্বন্ধ দেখিয়া, সমাজকেও মানবদেহের সমষ্টির মত, একটি ব্যবস্থাবদ্ধ সমষ্টি মনে করিতে লাগিলেন। যেমন মানুষের হাত, পা, পাক-যন্ত্র ইত্যাদির, অস্তিত্বের কল্পনা, দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বাধীনভাবে করা যায় না, পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা বলিতে আরম্ভ করিলেন, সমাজ ঠিক

সেইরূপ। ব্যক্তিগুলিকে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে কল্পনা করা ঠিক নয়, অর্থাৎ, সমাজই আসল সমষ্টি, ব্যক্তিগুলি তার অবিচ্ছেদ্য অংশস্বরূপ। সমাজ-সমষ্টির উন্নতিই মানবজাতির মুখ্য উদ্দেশ্য, এবং ঐ উদ্দেশ্য সাধন হইলে, ব্যক্তি বিশেষেরও উন্নতি সাধন হইল, মনে করিতে হইবে।

জগতে যখনই কোন কল্পনা বহুবিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাহাতে সত্য অল্প পরিমাণে আছে। কিন্তু, সব সময়ে তার দাবি, ন্যায্য দাবি অপেক্ষা বহু উচ্চে স্থাপন করা হয়, এবং ঐ কারণেই জগতে অশান্তি এবং বিপ্লবের সূচনা হয়। মানুষ যে একটি সমাজ-বদ্ধ জীব, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, এবং কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। জগতের উপস্থিত যেরূপ অবস্থা, এবং যে অবস্থা এখনও বহু শতাব্দী ধরিয়া থাকিবে, অধিকাংশ লোকই নিজের কিসে উন্নতি হইতে পারে, তাহা বুঝে না এবং সেজন্য চেষ্টাও করে না। তাদের উন্নতির জন্য সমাজ চেষ্টা না করিলে, তাদের অধোগতি অনিবার্য্য। জাতীয় জীবন কখনই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না, যদি তাদের উর্দ্ধে তুলিতে চেষ্টা করা না হয়। এই ভাবে দেখিলে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমাজের অন্তর্গত করিয়া চিন্তা, এবং তদনুযায়ী প্রতিকারের চেষ্টা, খুবই প্রয়োজন। ইহাই হইতেছে, সমষ্টিবাদীর প্রধান সত্য এবং একমাত্র আকর্ষণ। মানুষের মনের দুর্ব্বলতা এরূপ, এবং বিবেচনা শক্তি এরূপ সীমাবদ্ধ, একটি দাবির সত্যে মুগ্ধ হইয়া, ঐ সঙ্গে অন্য অনেকগুলি দাবিও সত্য, ধরিয়া লইতে ইচ্ছুক হয়। কতগুলি জনহিতকর কাজে, সমাজ-সমষ্টির প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া, মানুষ ধীরে ধীরে ভ্রমে পড়িয়া, মনে করিতে শিখে, সমাজ-সমষ্টির একাধিপত্য অস্বীকার করিয়া ব্যক্তিবিশেষের কোন মঙ্গল কল্পনা করা যায় না, যেন ব্যক্তিগুলির সমষ্টি লইয়া সমাজ নয়, যেন বিভিন্ন লোকদের মঙ্গলের দ্বারা সমাজের মঙ্গল হয় না, সমাজ একটি মন-গড়া সমষ্টি, যার মধ্যে, এক ছাঁচে প্রস্তুত করিয়া মানুষ-গুলিকে ঢুকান দরকার! সৃষ্টি-বৈচিত্র্য যে একটি মহান সত্য, এবং স্বাধীন-ভাবে কাজ করিবার ক্ষমতা যে মনুষ্যত্বের এবং পারমার্থিক জীবনের মূলস্বরূপ, সমষ্টিবাদীরা তাহা বুঝিতে পারে না। আমি যতদূর আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি, সমষ্টিবাদীরা প্রায় সকলেই জড়বাদী, তাদের ধারণা, অবশ্য-প্রয়োজনীয় কয়েকটি জিনিষ সংগ্রহ করিয়া, দল বাঁধিয়া পেট ভরিয়া খাইয়া দিন কাটাইতে পারিলে, এবং দেশের বিপদের সময়ে, শত্রুদের বিরুদ্ধে

একযোগ হইয়া যুদ্ধে তাদের হারাইয়া দিতে পারিলে, মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধন হইল। এগুলি যে প্রয়োজন নয়, তাহা একেবারেই বলিতে চাই না, কিন্তু কেবল দৈহিক স্বচ্ছন্দতা-লাভ যে মানবজীবনের পরাকাষ্ঠা, ইহা অত্যন্ত হীন কল্পনা। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লোপ করিলে, মানুষকে এরূপ বিকল করিয়া ফেলা হয় যে, আর বড়াই করিবার কোন কারণই থাকে না। সমাজের দাবি প্রবল করিতে গিয়া, ব্যক্তিত্বের দাবিকে অগ্রাহ্য করা, একটি বিশাল ভ্রম। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নাশই আসল পরাধীনতা। যে স্বাধীন জীবন মানুষের এতকাল আরাধনার বস্তু ছিল, সমষ্টিবাদীর যুগে তাহা ধূলায় গড়াগড়ি যাইতেছে। যখন সমাজের দাবির সহিত ব্যক্তিত্বের দাবি সমানভাবে গ্রাহ্য হইবে, তখন মানুষ বুঝিতে পারিবে যে সে বড় ধরণের একটি কল বা পশু নয়, তখন সে উপলব্ধি করিবে, সমাজ-গঠন ব্যক্তিত্বের হিতের জন্য, তাকে গ্রাস করিবার জন্য নয়, তখন তার জ্ঞান হইবে, প্রত্যেক মানুষই সৃষ্টির কেন্দ্রস্বরূপ, সমাজকে কেন্দ্র মনে করা অলীক কল্পনা মাত্র। আসলে, প্রাণ সমাজের নয়, প্রাণ ব্যক্তিগত, যার উৎকর্ষ সাধন, সমাজ এবং জাতির চরম উদ্দেশ্য।

আর একটি বিদেশী ধারণা রাজনীতিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছে: বর্ত্তমান যুগ যুবকের যুগ, পরিণতবয়স্ক লোকের স্থান সেখানে নাই! বেশি বয়সের লোকের দৃষ্টি বেশি দূর যায় না, তাদের বুদ্ধি ও বিবেচনা ক্ষীণ হইয়া আসে, যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা অকর্ম্মণ্য কল্পনায় জড়াইয়া পড়ে, সমাজ এবং দেশকে তারা উন্নতির পথে লইয়া যাইতে পারে না! যুবকই কেবল তার সতেজ চিন্তা এবং বুদ্ধির বলে, নূতন পথ আবিষ্কার করিয়া, অল্প সময়ের মধ্যে, দেশ ও সমাজকে শীর্ষস্থানে লইয়া যাইতে পারে। আমাদের দুর্ভাগ্য, স্কুল এবং কলেজের জনকয়েক ছেলেদের উপর দেশ উদ্ধারের ভার গিয়া পড়িয়াছে, তার সঙ্গে এই নূতন আবিষ্কৃত সত্য সংযুক্ত হইলে, দেশ দেখিতে দেখিতে পক্ষযুক্ত হইয়া ব্যোমে উড়িতে আরম্ভ করিবে, তার কি কোন সন্দেহ আছে? এতদিন জগতে, বুদ্ধি এবং বিবেচনার মাপ হইয়া আসিতেছিল, উপযুক্ত ক্ষেত্রে কার্য্য-ক্ষমতার দ্বারা, অর্থাৎ ফলের দ্বারা, এখন হইতে বয়সের হিসাবে, বুদ্ধি এবং বিবেচনার সারবত্তা নির্দ্ধারিত হইবে! বৃদ্ধ কবিও, স্রোতের জলে ভাসিয়া, করতালি দিবার দলের খাতির রাখিয়া, গাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, "ওরে কাঁচা, আমাকে বাঁচা"! আমার "শ্রমিকের ছেলে" উপন্যাসের

একটি পরিচ্ছেদ, 'নবজীবন' নাম দিয়া, এই প্রসঙ্গের আলোচনা করিয়াছি। বুদ্ধি এবং বিবেচনা, কোন জাতি, সম্প্রদায়, কিংবা ব্যক্তিবিশেষের একচেটিয়া নয়, কোন এক বয়সে নিবদ্ধ থাকা দূরের কথা। যুবক বৃদ্ধের অধিক প্রলাপ বকিতে পারে, এবং বৃদ্ধ যুবকের অধিক তেজস্কর যুগান্তরকারী পথ নির্দ্দেশ করিতে পারে। দেশ, কাল, উচিত, অনুচিত, প্রয়োজন, উপকারিতা, ইত্যাদি, কারণগুলির দ্বারা বিষয়ের গুরুত্ব ঠিক করা হয়, তরুণ কিংবা বৃদ্ধের উক্তি, পুরাতন কিংবা নূতন যুগের বচন, কারণ ধরিয়া নয়। দূরদর্শিতা লাভ কোদাল-পাড়া কাজ নয় যে, বাহু এবং কব্জির জোরে, দেখিতে দেখিতে জমি শস্য-শ্যামলা হওয়ার মত, বুদ্ধি সর্ব্বতোমুখী হইয়া উঠে! রাজনীতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে, অনেক আজগুবি কল্পনা সহজে স্থান পাইয়া থাকে, সেজন্য এরূপ খামখেয়ালী কথার অবতারণা সম্ভব, জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের জগতে, এক মুহূর্ত্তের জন্য, এরূপ প্রলাপ উক্তি কেহ করিতে ভরসা করে নাই কিংবা করিবে না।

ছাত্রজীবন হইতে আমি ইতিহাস পাঠের পক্ষপাতী। অন্যান্য দেশের ইতিহাসের সহিত, আমাদের হতভাগ্য দেশের যাহা কিছু ইতিহাস আছে, পড়িয়াছি। যদিও রাজপুতানার ইতিহাস পড়িযা, মন অল্প সময়ের জন্য উৎফুল্ল হইয়া উঠে, কিন্তু যে ধর্ম্মের বড়াই করা হিন্দুদের চিরকালের অভ্যাস, তার জন্য, যুদ্ধের ফল যাহাই হউক, কখন যে তারা প্রাণ দিবার জন্য একযোগ হইয়া দাঁড়ায় নাই, ভাবিলে মন ঘৃণায় পরিপূর্ণ হয়। মুসলমানদের একতার জন্য আমি তাদের সম্মানের চোখে দেখিয়া থাকি। খৃষ্টীয়ানদের দৃষ্টান্তও অতুলনীয়। জেরুজুলম্‌কে বিপন্ন দেখিয়া, ইয়োরোপের খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বীরা যেরূপ পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ ভুলিয়া, ধর্ম্মের জন্য একপ্রাণ হইয়া, জেরুজুলমের উদ্ধারের জন্য গিয়াছিল, সে কীর্ত্তির কথা ইতিহাসে জলন্ত অক্ষরে লিখা আছে। গৌরবের পথে দেশকে কিরূপে লইয়া যাইতে হয়, আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে পাশ্চাত্য দেশবাসীর দৃষ্টান্তে দেখিতেছি। তবে আমরা হইতেছি দর্শকের দল, বীরের মত কাজ করিতেছে তারা, আমরা নিশ্চল ভাবে থাকিয়া কখন বাহবা দিতেছি, কখন বা নিরীহভাবে তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া মনে তৃপ্তিলাভ করিতে চেষ্টা করিতেছি! এতদিন ইংরাজের মত এত বড় একটি জাতি, আমাদের মধ্যে আসিয়া রহিয়াছে, আমরা তাদের নিকট কি শিক্ষা লাভ করিলাম? আমরা কেবল বলিতে শিখিয়াছি, ইংরাজ

দেড় শত বছরের অধিক আমাদের উপর রাজত্ব করিয়াও আমাদের সেরূপ উন্নত করিতে পারিল না। হায় অদৃষ্ট! এ জাতির কি কখন উন্নতি হইবে? ইংরাজ আমাদের কাপড় পরিতে শিখাইবে, হাত ধরিয়া লইয়া চলিতে শিখাইবে, মুখের নিকট আহার ধরিয়া খাইতে অনুরোধ করিবে, দেশহিতৈষী হইতে শিক্ষা দিবে, এবং তার পর যদি একদিন মধুর প্রভাতে, তাদের বোচকা বাঁধিয়া, গলায় বস্ত্র জড়াইয়া, আমাদের নমস্কার করিয়া, নিজের দেশে ফিরিয়া না যায়, তাদের কি মহৎ বলিতে পারা যায়? আমরা কেবল তালিকা করিতে শিখিয়াছি, ইংরাজ আমাদের জন্য কি করিল না, আমাদের কি করা উচিত ছিল এবং করি নাই, তার যদি কেহ একটা তালিকা প্রস্তুত করিত, তাহা হইলে বুঝা যাইত আমাদের দেশহিতৈষীতার বহর কিরূপ। ইংরাজ আমাদের অবস্থা দেখিয়া মুচকিয়া হাসিয়া থাকে! আমরা আর একটা কথা পাখীর মত বলিতে শিখিয়াছি: কর্ম্মচারিতন্ত্র প্রতি পদে বাধা দিয়া আমাদের কোন উন্নতি করিতে দেয় না! ইংরাজেদের দেশেও সমাজতন্ত্রীর দল, শাসনপ্রণালীর বিরুদ্ধে, ঠিক ঐরূপ অভিযোগ আনিয়া থাকে। যখন কেয়ার্ হার্ডি, শ্রমিকের টুপি পরিয়া, বিলাতের পার্লেমেণ্টে প্রথম প্রবেশ করিয়াছিলেন, চারিদিকে হাসির রোল উঠিয়াছিল, কিন্তু কয়েক বছর পরে, শ্রমজীবীর দল শাসন-ক্ষমতা পাইয়াছিল। সব কাজে প্রতিবন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়, সামাজিক, রাজনীতিক, নৈতিক, পারমার্থিক, যে কোন কাজে অগ্রসর হইতে গেলে, বাধা, বিপত্তি সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়। প্রতি-বন্ধ উল্লংঘন কিরূপে করিতে হয়, তার আলোচনা করিয়া কাজে প্রবৃত্ত হওয়ার দরকার, প্রতিবন্ধের জন্য কিছুই করিতে পারা গেল না, আপশোষ করিলে কোন ফল হয় না। হিন্দুরা যেরূপ ঘরের এক কোণে বসিয়া, প্রয়োজন মত, অধিক সংখ্যায়, তুলসী এবং বেল-পাতার সাহায্যে, ঠাকুরকে প্রসন্ন করিয়া, অভিষ্ট সাধন করিতে চেষ্টা করে, শাসনপ্রণালীর পরিবর্ত্তন ত ঐ ভাবে হয় না? স্বাধীন দেশেও, শাসনপ্রণালীকে, জনহিতকর দিকে পরিচালন করিতে, বহু শতাব্দী ধরিয়া বিরাট চেষ্টা করিতে হইয়াছে। যথার্থ স্বদেশপ্রীতি কি এখনও আমাদের হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে? যখন পরস্পরের প্রতি ঘৃণা, হিংসা, অবিশ্বাসের ভাব গিয়া, আমাদের মধ্যে একতা হইবে, দেশের জন্য স্বার্থ ত্যাগ করিতে শিখিব, আমাদের উন্নতি কেহ রোধ করিতে পারিবে না। আমাদের উন্নতি, আমাদের দ্বারাই হইবে, অপরের সাহায্যে

নয়। সব দেশই, নিজের চেষ্টায়, স্বাধীন এবং বড় হইয়াছে। অপরের সাহায্যে, স্বাধীন এবং বড় হইবার কল্পনা, পাগলের প্রলাপ।

আমাদের সময়ে স্কুল কিংবা কলেজের ছেলেরা, রাজনীতিক আন্দোলনে যোগ দিত না, আন্দোলনের ধরণও ভিন্ন প্রকারের ছিল। তখন, আইন ব্যবসায়ীরা অগ্রণী হইয়া ঐ আন্দোলনের ভার লইত। উকিল হইবার পর যার খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা থাকিত, বড়দিনের ছুটির পূর্ব্বে সে কংগ্রেসের প্রতিনিধি হইতে চেষ্টা করিত। উকিল হইয়া, অনেক কারণে, আমি রাজনীতিক আন্দোলনে যোগ দিতে পারি নাই। বেশি বয়সে, নিয়মে থাকিয়া আমার স্বাস্থ্য ভাল আছে, কিন্তু ষোল বছর হইতে পঁয়ত্রিশ বছর পর্য্যন্ত, একসঙ্গে বেশি দিন আমি সুস্থশরীরে কাটাইতে পারি নাই। কিছুকাল হাঁপানিতে কষ্ট পাইয়াছিলাম—ঐ রোগ আমি মাতার নিকট পাইয়াছিলাম; অল্প সময়ের জন্যও রোদে বাহির হইলে, ঠিক পিতার মত আমার শরীর উত্তপ্ত হইয়া উঠিত, যেন জ্বর হইয়াছে—এখনও শরীরের সে ভাব একেবারে যায় নাই। শারীরিক কষ্ট, উভয় কারণে, কখনই সহ্য করিতে পারি নাই, এবং যে কাজে শারীরিক পরিশ্রমের দরকার, সে কাজে কখন অগ্রসর হই নাই। প্লিডারসিপ্ পাশের পর উকিল হইয়া, আমার প্রধান উদ্দেশ্য হইল, কিরূপে বড় পাশগুলি করিয়া ভাল উকিল হইব। সেজন্য, অবসর পাইলেই পড়িয়া কাটাইতাম। তাহা ছাড়া, আমি একস্থানে সুস্থভাবে বেশি দিন কাটাইতে পারি নাই; কটক হইতে কলিকাতা, কলিকাতা হইতে কটক, কটক হইতে পাটনায়, পাটনা হইতে আবার কলিকাতায়, এইভাবে সময় কাটাইয়াছি। দেশের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ সত্ত্বেও, কাজের দ্বারা সে অনুরাগ প্রথম জীবনে প্রকাশ করিতে পারি নাই।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে, কলিকাতা হইতে কটকে আসিয়া, দেশ-সেবার প্রথম সুযোগ পাইলাম। তখন এম্, এ, বি, এল্ হইয়াছি, এবং হাইকোর্টে কাজ করিয়া সকলের নিকট পরিচিত হইয়াছি। ম্যুনিসিপ্যালিটিতে যোগ দিব স্থির করিলাম। কটকে আসিবার দুই মাস পরে, নূতন কমিশনরদের নির্ব্বাচনের সময় আসিল। আমি কমিশনর নির্ব্বাচিত হইলাম। তার পর, ভাইস্-চেয়ারম্যান্ পদের প্রার্থী হইলাম। তখন, সরকার পক্ষ হইতে, এক-তৃতীয়াংশ কমিশনর মনোনীত করা হইত। তাহা সত্ত্বেও, আমি ভাইস্-চেয়ারম্যান্ নির্ব্বাচিত হইলাম।

কয়েকমাস কাজ করিবার পর, আমার সম্বন্ধে কটকের ম্যাজিষ্ট্রেট্ এবং উড়িষ্যা বিভাগের কমিশনরের ধারণার পরিবর্ত্তন হইল। উড়িষ্যার কমিশনরের সদর মোকাম কটক ছিল, সেজন্য ম্যুনিসিপ্যালিটির কাজের প্রতি তাঁরও তীব্র দৃষ্টি থাকিত। আমার কাজের নিয়ম ছিল, সকলের সঙ্গে মিশিয়া উচিত ভাবে কাজ করিয়া যাওয়া, কেহ আমার প্রিয়পাত্র কিংবা শত্রু ছিল না। ম্যাজিষ্ট্রেট্ এবং কমিশনর্ ক্রমশ আমার পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। চেয়ারম্যান্ ছিলেন একজন অল্প শিক্ষিত জমিদার, তিনি কোন রকমে ইংরাজীতে দুই চারিটা কথা কহিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারিতেন এবং সেরূপ কর্ম্মপটুও ছিলেন না। সুতরাং, উড়িষ্যার কমিশনরের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা বাড়িল, এবং মাঝে মাঝে ম্যুনিসিপ্যালিটির উন্নতির জন্য বিবিধ বিষয়ের আলোচনা তিনি আমার সহিত করিতে লাগিলেন।

আমি শীঘ্রই মিউনিসিপ্যালিটির পঙ্কোদ্ধারের জন্য, উড়িষ্যার কমিশনরের সাহায্য চাহিলাম। আমি জানিতাম, চেয়ারম্যান্‌কে ডিঙ্গাইয়া ভাইস্-চেয়ারম্যানের কোন কাজ করা বড় সহজ নয়, সেজন্য তাঁর সাহায্য চাহিয়াছিলাম। তিনি প্রীত হইয়া আমাকে সাহায্য করিবেন, বলিলেন। ম্যুনিসিপ্যালিটির আদায় বিভাগের দুর্নাম তখন সকলের মুখে শুনা যাইত, কিন্তু কাহারও প্রতিকার করিবার যেন সাধ্য ছিল না! ঐ বিভাগের পুরাতন বড় কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলিতে ভরসা করিত না। আমি কমিশনরকে সব কথা বলিলাম। তিনি আমাকে আদয় বিভাগ সম্বন্ধে একটি রিপোর্ট দিতে বলিলেন। অনেক অসুবিধা এবং বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও, রিপোর্ট দিলাম। তাহার বিপক্ষে কাহারও কিছু বলিবার সাধ্য রহিল না। আদায় বিভাগের কর্ম্মচারী পরিবর্ত্তনের পর, ম্যুনিসিপ্যালিটির কাজ শৃঙ্খলার সহিত চলিতে লাগিল।

ঐ সময়ে, উড়িষ্যার ম্যুনিসিপ্যালিটির পক্ষ হইতে একজন প্রতিনিধি, লাট্ সভায় লইবার নিয়ম ছিল। মিউনিসিপ্যালিটি হিসাবে ভোট দেওয়া হইত এবং কেবল কমিশনরেরা ভোট দিতে পারিত। আমি প্রতিনিধি হইবার জন্য দাঁড়াইলাম। আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেন, গোপবন্ধু দাশ। উড়িষ্যার তৎকালীন প্রধান নেতা, মধুসূদন দাস, সি, আই, ই, গোপবন্ধুকে যথাসাধ্য সাহায্য করিলেন, তাহা সত্বেও আমার কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা বেশি রহিল। কিন্তু মধুসূদনের পাকা হাড়, কাঁচা হাড় অবশেষে হারিয়া

গেল। নির্ব্বাচনের জন্য অনেক টাকা আমাকে খরচ করিতে হইয়াছিল, ঠিক সময়ে কিছু বেশি খরচ করিতে পারিলে, আমি কৃতকার্য্য নিশ্চয় হইতাম।

আমি না হইয়া গোপবন্ধু নির্ব্বাচিত হওয়াতে, দেশের অধিক উপকাব হইয়াছিল। আমাব মত গোপবন্ধুও উকিল, এবং রাজনীতিক ক্ষেত্রে নূতন আসিতেছিলেন, কিন্তু তিনি ওকালতি ছাড়িয়া সমস্ত সময় দেশের কাজে নিযুক্ত করিবেন, স্থির করিয়াছিলেন। আমি তাহা করিতাম না, ওকালতি বজায় রাখিয়া যতদূব সম্ভব দেশের কাজ করিতাম। সময়ে গোপবন্ধু উড়িষ্যার একজন নেতা হইয়াছিলেন এবং সর্ব্বান্তঃকরণে দেশের সেবা করিয়াছিলেন। তাঁর অকালমৃত্যুতে দেশের খুবই ক্ষতি হইয়াছে।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে, উড়িষ্যার তৎকালীন সর্ব্বপ্রধান সম্মিলনী, "উড়িষ্যা এসোসিএসেন্"র প্রতিনিধি হইযা, আমি বিফর্মস্ কমিটিব নিকট সাক্ষ্য দিয়াছিলাম। নির্ব্বাচন এবং বিষয় বিভাগ, উভয় কমিটি, আমাব সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। গোপবন্ধু দাশও সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। আমরা উভযে পরামর্শ করিয়া উড়িষ্যা সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য স্থির করিয়াছিলাম। ঐ সময়ে, পাটনায়, সচ্চিদানন্দ সিংহের বাড়িতে, তেজ্‌বাহাদুর সপ্রুর সহিত পরিচয় হইয়াছিল। তিনি রিফর্মস্ কমিটিব একজন সদস্য ছিলেন। তাঁব তেজস্বী ধরণ এবং দেশের প্রতি ঐকান্তিক প্রীতি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে, কটকে ফিরিয়া আসিলাম, ঠিক ম্যুনিসিপ্যালিটির নূতন নির্ব্বাচনের সময়ে। কজিন্ তখন কটকের ম্যাজিষ্ট্রেট্। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না, কিন্তু লোকের মুখে তিনি আমার কটকে ফিরিয়া আসিবার সংবাদ পাইলেন, এবং আমি এক সময়ে ভাইস্-চেয়ারম্যান্ ছিলাম, তাহাও শুনিলেন। তিনি আমাকে ম্যুনিসিপ্যালিটির কমিশনর মনোনীত করিলেন। পুরাতন কমিশনরেরা, যাঁরা আমার কাজের নিয়ম জানিতেন, আমাকে চেয়ারম্যান্ নির্ব্বাচনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। আমি চেয়ারম্যান্ নির্ব্বাচিত হইলাম। কটক ম্যুনিসিপ্যালিটিতে, সরকার পক্ষের মনোনীত কমিশনর হইয়া, আমিই কেবল চেয়ারম্যান্ নির্ব্বাচিত হইয়াছি। কংগ্রেস্-দলের একজন ভাইস্-চেয়ারম্যান্ নির্ব্বাচিত হইলেন।

ভাইস্-চেয়ারম্যান্‌কে সঙ্গে লইয়া নিয়মমত কাজ আরম্ভ করিলাম, কিন্তু কিছুদিন পরে দেখিলাম, কংগ্রেসদলের কয়েকজন কমিশনরের ইচ্ছা নয়, ভাইস্-চেয়ারম্যান্ আমার সহিত একযোগ হইয়া কাজ করেন।

ভাইস্-চেয়ারম্যানের অসহযোগিতার জন্য কাজের অত্যন্ত ক্ষতি হইল, এবং আমাকে উদ্বিগ্ন হইয়া সময় কাটাইতে হইল। যখন ভাইস্-চেয়ারম্যান্‌কে অনেক প্রকারে বুঝাইয়াও উচিত পথে আনিতে পারিলাম না, এবং শৃঙ্খলার সহিত কাজ করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল, কমিশনরদের সঙ্গে পরামর্শ করিলাম। তাঁরাও ভাইস্-চেয়ারম্যানের ব্যবহারে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ভাইস্-চেয়ারম্যান্‌কে পদচ্যুত করা স্থির হইল এবং দুই তৃতীয়াংশ ভোটের দ্বারা তাঁহাকে সরান হইল। নূতন ভাইস্-চেয়ারম্যান্ নির্ব্বাচনের পর, ম্যুনিসিপ্যালিটির কাজ যথারীতি চলিতে লাগিল।

যদি কাহার মনে হয়, মনোনীত কমিশনর, সুতরাং সরকারের ইঙ্গিতে পরিচালিত হইয়া কাজ করিতেছিলাম, তাহা হইলে আমার সম্বন্ধে খুব ভুল ধারণা করা হইবে। চেয়ারম্যান্ হইবার দিন কয়েক পরে, যাদের নিকট ট্যাক্স্ বাকি, তাদের একটি তালিকা আমার সম্মুখে রাখা হইল। দেখিলাম, বিলাত-প্রত্যাগত উড়িষ্যা বিভাগের একজন ভূতপূর্ব্ব কমিশনরের নামও ঐ তালিকার মধ্যে আছে। আমি একই আদেশ সকলের সম্বন্ধে দিলাম দেখিয়া ট্যাক্স্‌দারোগা আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। যথাসময়ে, বিলাত হইতে, অবসর প্রাপ্ত কমিশনর ট্যাক্স্ পাঠাইয়া দিলেন।

চেয়ারম্যান্ হইবার কয়েক মাস পরে, ম্যাজিষ্ট্রেট্ কজিন্ কটক হইতে স্থানান্তরে গেলেন। তাঁর মত বিচক্ষণ এবং ভদ্র ইংরাজ কর্ম্মচারী, আমি খুব কম দেখিয়াছি। একবার একটি কাজের জন্য, আমার সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার হইয়াছিল, আমাকে সংবাদ না দিয়া, নিজেই আমার বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে নূতন পুলিস সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট্‌কে আমার সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিবার জন্য আনিয়াছিলেন। জানি না, আগেকার দিনে, দেশী লোকের সহিত, কয়জন বড় ইংরাজ কর্ম্মচারী, ঐরূপ ভদ্রতা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু কজিনের পর জেলার কর্ত্তা যে ইংরাজ হইলেন, দেশী লোকদের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা দেখিলাম সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁর মনের ভাবের আস্বাদ পাইতে আমাকে বেশি সময় অপেক্ষা করিতে হইল না। কটকে তখন প্রথম ম্যালেরিয়া দেখা দিয়াছে। স্থানীয় ইংরাজ সিভিল্ সর্জ্জনের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, সহরের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা করিবার জন্য একটি সভা আহ্বান করা স্থির করিলাম। ম্যাজি-ষ্ট্রেটের সহযোগিতা পাইবার জন্য, এবং নিজে সভা আহ্বান করিয়া সভাপতি

হওয়া ভাল দেখায় না, উভয় কারণে, ম্যাজিষ্ট্রেট্‌কে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার জন্য একখানি চিঠি লিখিলাম। তিনি তার উত্তরে, আমাকে অবজ্ঞাসূচক একখানি চিঠি লিখিলেন, এবং দেশীয় লোকেরা স্বায়ত্বশাসনের অযোগ্য, চিঠিতে উল্লেখ করিলেন! আমি অবাক হইয়া চিঠি পড়িলাম। তৎক্ষণাৎ তীব্র প্রতিবাদ করিয়া চিঠির উত্তর দিলাম, এবং লিখিলাম, তাঁর মত জেলার কর্ত্তাদের সহানুভূতির অভাবেই দেশে স্বায়ত্বশাসনের উন্নতি হইতেছে না। আমাব ঐ চিঠি পড়িয়া, আমার একজন উচ্চ রাজ-কর্ম্মচাবী বন্ধুর নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল, এবং বিজ্ঞের মত, ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়িতে গিয়া তাঁর মনটা নরম করিয়া আসিতে পরামর্শ দিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁর কথায় কর্ণপাত করিলাম না। কিছুদিন পরে, আমি বাড়িতে একটি পার্টি দিয়াছিলাম। হাইকোটের জজ্‌, সহরের দেশী এবং ইংরাজ ভদ্রলোকেরা, ঐ পার্টিতে আসিয়াছিলেন। ঐ ম্যাজিষ্ট্রেট্‌কেও নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। তিনি আমাব বাড়িতে আসিযা পার্টিতে যোগ দিয়াছিলেন, এবং আমিও তাঁর মত অতিথির উচিত সমাদর করিয়াছিলাম।

আর একটি ঘটনার কথা বলিব। একদিন, উড়িষ্যার কমিশনরের পার্শনেল্‌ এসিস্‌টেন্ট্‌, আমার সঙ্গে দেখা করিয়া বলিলেন, কমিশনর জানিতে চাহিয়াছেন, একখণ্ড ম্যুনিসিপ্যালিটির জমি, শিক্ষা বিভাগের প্রয়োজনের জন্য, আমি দিতে ইচ্ছা করি কি না; আপত্তি নাই জানিতে পারিলে, আমাকে যথানিয়মে চিঠি লিখা হইবে। আমি কিছু বিস্মিত হইয়া, ঐরূপ ভাবে প্রথম কথা তুলিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। জানিলাম, কথাপ্রসঙ্গে কমিশনর বলিয়াছেন, 'Sures is very humble, but he is very independent,'—সুরেশ খুব বিনয়ী, কিন্তু অত্যন্ত স্বাধীন প্রকৃতির লোক—তার মত জানিয়া চিঠি লিখিলে ভাল হয়।

ম্যুনিসিপ্যালিটির নূতন এসেস্‌মেণ্টের প্রস্তাব উঠিল। ঐ এসেস্‌মেণ্ট্‌ আমার পূর্ব্ববর্ত্তী চেয়ারম্যানের করা উচিত ছিল, কিন্তু তিনি বুদ্ধি খাটাইয়া অপ্রিয়কর কাজটা নিজে না করিয়া, ভবিষ্যতে অপরের জন্য রাখিয়াছিলেন! কংগ্রেস দলের কমিশনরেরা, এসেস্‌মেণ্ট্‌ স্থগিত রাখিতে চেষ্টা করিলেন। আমি তাঁদের বুঝাইয়া বলিলাম, অনেকে বহুকাল হইতে অল্প ট্যাক্স্‌ দিয়া ফাঁকি দিয়া আসিতেছে এবং আয়ের অভাবে অনেক প্রয়োজনীয়

কাজ করিতে পারা যাইতেছে না। তাঁরা তবুও প্রতিবাদ করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। নূতন এসেস্‌মেণ্ট্‌ আরম্ভ করিলাম। প্রথমেই, গভর্ণমেণ্ট্‌ এবং স্থানীয় একজন ধনী জমিদারের দেয় ট্যাক্স্‌ অনেক বৃদ্ধি করিতে হইল। এরূপ নিয়মে এবং অনুসন্ধানের দ্বারা এসেস্‌মেণ্ট্‌ কার্য্য সম্পন্ন করা হইল, ম্যুনিসিপ্যালিটির এক-চতুর্থাংশ আয় বৃদ্ধি হইল, অথচ অনুচিতভাবে উল্লেখযোগ্য কাহারও ট্যাক্স্‌ বৃদ্ধি করা হয় নাই, মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। আমার এসেস্‌মেণ্টের পর পুনরায় এসেস্‌মেণ্ট্‌, সরকারি আমলে, ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে হইয়াছে।

কটকে কোন পার্ক নাই দেখিয়া, সাধারণের ব্যবহারের জন্য একটি পার্ক প্রস্তুত করিব স্থির করিলাম। ম্যুনিসিপ্যালিটির যেরূপ দৈন্যাবস্থা, করদাতাদের অর্থে ঐ উদ্দেশ্য সাধন হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, উড়িষ্যার কমিশনরের নিকট সাহায্যের প্রার্থী হইলাম। একখণ্ড সরকারি জমি পাইলাম, এবং দুই দফায় গভর্ণমেণ্টের নিকট চারি হাজার টাকা পাইয়া, রাভেন্সা বালিকা বিদ্যালয় এবং পুরাতন আদালত গৃহের সম্মুখে, "গৌরীশঙ্কর পার্ক" নাম দিয়া একটি পার্ক স্থাপন করিলাম। রায় বাহাদুর গৌরীশঙ্কর রায়, কটকের অধিবাসীদিগকে 'টাউন হল' দান করিয়াছিলেন, এবং উড়িষ্যার প্রথম উড়িয়া সাপ্তাহিক কাগজ, 'উৎকল দীপিকা'র প্রতিষ্ঠাতা এবং আজীবন সম্পাদক ছিলেন। "গৌরীশঙ্কর পার্ক", তেমন বড় না হইলেও, কটকের প্রথম পার্ক।

আমার সময়ে, কটকে জলের কলের প্রস্তাব উঠিয়াছিল। তখন গভর্ণমেণ্ট্‌ কেবল কিছু টাকা ধার দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। হিসাব করিয়া দেখিলাম, ঐ টাকার সুদ দিবার পর, সাধারণ কাজের জন্য অতি সামান্য টাকা থাকে। পুরীর মত কটকে, রেলওয়ে যাত্রীদের নিকট, অন্তঃসীমার ট্যাক্স্‌ লইবার সুবিধা ছিল না। সরকার কিংবা দেশহিতৈষী কোন ধনী ব্যক্তি দানের দ্বারা সাহায্য না করিলে, কটকে জলের কল ম্যুনিসিপ্যালিটির দ্বারা শীঘ্র হওয়া সম্ভব নহে, বেশ বুঝিতে পারিলাম।

আমার শেষ কাজ হইল, কটকে বৈদ্যুতিক আলোক প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব সমর্থন করা। করবৃদ্ধি না করিয়া বৈদ্যুতিক আলোক আনা চলে, হিসাব প্রস্তুত করিয়া দেখাইলাম। আমার প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা কাজে পরিণত করিতে আরও তিন বছর সময় লাগিল।

জনসাধারণের কাজ করিয়া মনে যে প্রসন্নতা আসে, তার তুল্য আনন্দ আর নাই, কিন্তু সচরাচর এত বাধা-বিঘ্নের ভিতর দিয়া ঐ কাজ করিতে হয়, অনেক সময়ে, প্রকৃতি হিসাবে, লোক বিশেষের মনে হয়, ঐরূপ ঝঞ্ঝাটের মধ্যে না গেলে ভাল হয়। আমার বয়স বাড়িতেছিল, শান্তভাবে সময় কাটাইবার ইচ্ছা প্রবল হইতেছিল, ভাবিলাম, সভা-সমিতিতে যোগ দিয়া বক্তৃতা করিয়া না বেড়াইলে, কিংবা প্রচলিত কোন একটি জন-সাধারণের কাজে নিযুক্ত না থাকিলে কি দেশের কাজ করা হয় না? দেশের সেবা কি ঐরূপ ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে? তখন মনে হইল, দেশের কাজ এরূপ বিস্তৃত এবং এত প্রকারের, যারা একদিনের জন্যও রাজনীতিক আন্দোলনে যোগ দেয় নাই, তারাও দেশের কাজে জীবন কাটাইতেছে, স্বীকার করিতে হইবে। যারা সাহিত্যের চর্চ্চায় নিযুক্ত, যারা দেশের জ্ঞানশাস্ত্রের উন্নতির জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছে—বাণিজ্য, কৃষি ও শ্রমশিল্পের দ্বারা ধনবৃদ্ধির কাজে নিযুক্ত কর্ম্মীদের ন্যায়—তারাও দেশসেবায় নিযুক্ত রহিয়াছে, নিশ্চয়ই বলিতে হইবে। দেখিলাম, বেশি বয়সে, আমার দেশসেবার আকাঙ্ক্ষা, প্রকৃতিগত পথ অনুগমন করিবার জন্য ব্যগ্র। আমি সেই পথ অবলম্বন করিব—বাকি জীবন সাহিত্য এবং হিন্দু দর্শনের চর্চ্চার দ্বারা মাতৃভূমির সেবা করিব—স্থির করিলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অধ্যাপন

কুড়ি বছর বয়সে, একদিন বন্ধুদের নিকট তর্কের বিষয় করিয়াছিলাম— অধ্যবসায়ের সহিত চেষ্টা করিলে এমন কাজ নাই যাহা বুদ্ধিমান লোক সুচারুরূপে করিতে পারে না। বন্ধুদের পক্ষ হইতে ঘোর প্রতিবাদ হইয়াছিল। আমি নিজের মনের ভাব আলোচনা করিয়াই কথাটা বলিয়াছিলাম, এবং জীবনে কোন কাজে হাত দিই নাই, যাহা কি সুসিদ্ধ করিতে পারি নাই, পরে অবস্থাচক্রে পড়িয়া যাহাই ঘটুক। তথাপি আমার মনে হয়, প্রত্যেক লোকের উপজীবিকা নির্ব্বাচন করা দরকার। সকলে যে একই ধরণের জীবনোপায় অবলম্বন করিয়া কৃতকার্য্য হইবে, কখন সম্ভব নয়। নিজে বুঝিতে না পারিলেও, আন্তরিক পছন্দ বলিয়া একটা জিনিষ আছে, যাহা অগ্রাহ্য করা চলে না। ওকালতি করিয়া সুখ্যাতি লাভ করিয়াছি। জটিল বিষয় বোধগম্য করিয়া বলিবার খুবই ক্ষমতা আছে, কিন্তু তর্কের ছটায় অপরকে হাস্যাস্পদ করিয়া মনে কখন যথার্থ আনন্দ পাই নাই। কিছুদিন ঘৃতের কারবার করিয়াছিলাম, কাজ চালাইলাম পাকা ব্যবসায়ীর মত, বেশ লাভও হইয়াছিল, কিন্তু ঐ কাজ করিয়া মনে সন্তোষ লাভ করিয়াছিলাম, বলিতে পারি না। বিচারকের কাজ করিলে বেশ স্নিগ্ধভাবে সময় কাটিত, মনে হয়, কিন্তু কখনও বিচারক হই নাই, কর্ম্মক্ষেত্রে কিরূপ হইত, বলিতে পারি না। অধ্যাপকের কাজ করিয়াছি, বেশ বলিতে পারি, পড়াইয়া যে আনন্দ পাইয়াছি, ঐরূপ আনন্দ অন্য কোন কাজ করিয়া পাই নাই। আমার মনের ভাবের গূঢ় কারণ ধরিতে চেষ্টা করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, যে কাজে নিযুক্ত থাকিয়া, ইচ্ছামত চিন্তা করিবার বেশি অবসর পাওয়া যায়, তাহাই আমার পক্ষে আনন্দদায়ক। আমার প্রকৃতি চিন্তাশীল, অপরের সঙ্গে হিসাব-নিকাশ করা অপেক্ষা, নিজের সঙ্গে হিসাব মিটানর বেশি প্রয়োজন। যে কাজে, আনুষঙ্গিক চিন্তার চাপে দিন কাটিয়া যায়, নিশ্চিন্তভাবে হৃদয়ের ভাবগুলির সঙ্গে সময় কাটাইবার অবকাশ পাওয়া যায় না, সে কাজ আমার তেমন মনের মত নয়। অধ্যাপনের দ্বারা দেখিয়াছি, মনের স্বচ্ছন্দতা নষ্ট হয় না, তাই বোধ হয়

অধ্যাপকের জীবন আমার খুব ভাল লাগিয়াছে। জানি না, ইহার ভিতর, বংশগত কোন কারণ আছে কি না, কেননা আমার পূর্ব্বপুরুষেরা অনেকে জ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনা এবং বিদ্যাদান করিয়া জীবন কাটাইয়াছিলেন।

প্রথমে অধ্যাপকের কাজ লইতে হইয়াছিল, অবস্থাচক্রে পড়িয়া। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে, বুদ্ধির দোষে পাটনা হাইকোর্ট ছাড়িয়া, কলিকাতা হাইকোর্টে কাজ করিতে আসিয়া দেখিলাম, কেবল ওকালতি করিয়া দিন চলে না, সেজন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল কলেজের অধ্যাপকের কাজ লইতে হইয়াছিল।

অধ্যাপক হইয়া নিয়ম করিলাম, ক্লাশে ছাত্রদের কেবল নম্বর ধরিয়া না ডাকিয়া, তাদের নাম ধরিয়া ডাকিব। যদিও ছাত্র-সংখ্যা পঞ্চাশ ছিল, কিছুদিনের মধ্যে, প্রত্যেক ছাত্রের গলার আওয়াজের সঙ্গে মোটামুটি পরিচয় হইল। একদিন, একটি ছাত্রের নাম ডাকিবার পর, এরূপ একটি গলায় তার উপস্থিত থাকার উত্তব পাইলাম, সন্দেহ হইল আসল ছাত্র ঐ উত্তব দেয় নাই। পুনরায় ঐ ছাত্রের নাম ডাকিলাম, কিন্তু সেবাব কোন উত্তর আসিল না। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া, দুঃখিত হইয়া কেবল বলিলাম যে, তাদের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকি, তার প্রতিদান ঐরূপ পাইব, আশা করি নাই। পড়াইয়া সন্ধ্যার সময়ে ট্রামে বাড়ি ফিরিতাম। ঐ ঘটনার পব, দুই দিন দেখিলাম, একটি ছাত্র কিছু দূরে থাকিয়া, ট্রাম পর্য্যন্ত আমার পশ্চাতে আসিতেছে। তৃতীয় দিন, ট্রামের অপেক্ষায় গোলদীঘির ধারে ফুটপাথে দাঁড়াইয়া আছি, অন্ধকার হইয়াছে, হঠাৎ সেই ছাত্র আসিয়া আমার পাযে হাত দিয়া বলিল, তাকে ক্ষমা করিতে হইবে। আমি প্রথমে কিছু বুঝিতে পারি নাই, তার ঐরূপ ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন সে বলিল, কয়েক দিন পূর্ব্বে সে অপরের হইয়া ক্লাশে উপস্থিত থাকার উত্তর দিয়াছিল, সেজন্য মনে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছে। আমি আহ্লাদিত হইয়া বলিলাম যে, সে দোষ স্বীকার করিয়া যেরূপ সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছে, সেদিন হইতে সে আমার চোখে খুব মহৎ হইয়া উঠিল, এবং নিশ্চয়ই তার ভবিষ্যত উজ্জ্বল হইবে। ছাত্রদের প্রতি আমার ব্যবহার দেখিয়া সে দোষ স্বীকার করিয়াছিল, নতুবা কখনই আত্মপ্রকাশ করিত না।

একবার গরমের ছুটির বেশি দেরি নাই, কয়েকজন ছাত্র আসিয়া প্রস্তাব করিল, ছুটির পূর্ব্বে আমাকে লইয়া তারা একটি ষ্টীমার-পার্টি করিতে ইচ্ছা করে। তখন দুইজন অধ্যাপকের উপর দুটি শ্রেণী, একশত ছাত্রের, এক

বছরের বিষয়গুলির পড়াইবার ভার থাকিত। আমার সহযোগীর নাম ছাত্ররা করিল না দেখিয়া, আমি তাঁর সহিত একবার দেখা করিতে তাদের বলিলাম, কারণ তাঁকেও সঙ্গে লইয়া যাওয়া উচিত। তারা তখন আমার কথার কোন উত্তর না দিয়া, পরে সাক্ষাৎ করিবে বলিয়া গেল। আমার সন্দেহ হইল, আমার সহযোগীর সম্বন্ধে তাদের মনের ভাব ভাল নয়। সন্দেহ করিবার আমার কিছু কারণও ছিল। আমার সহযোগী, মাঝে মাঝে, ছাত্ররা আমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করে, জিজ্ঞাসা করিতেন, এবং আমাকে পরামর্শ দিতেন, তাঁর মত আমি যেন ছেলেদের খুব চাপের নীচে রাখি, কারণ তাদের ব্যবহার ভাল নয়, ভারি গুমর, ধরাকে যেন সরার মত দেখে! আমি প্রত্যেকবারই উত্তর দিয়াছিলাম, ছেলেরা আমার সহিত কোন মন্দ ব্যবহার করে না। তিনি তৎক্ষণাৎ বলিয়াছিলেন, আমি ছাত্রদের সম্বন্ধে ঠিক ধারণা করিতে পারি না, তারা বাহিরে যেরূপ দেখিতে, আসলে সেরূপ নয়। যে যাহা হউক, আমার সহযোগীর সহিত দেখা করিয়া ছাত্রদের পুনরাগমনের প্রতীক্ষায় রহিলাম। কিছুদিন পরে, জনকয়েক ছাত্র দেখা করিয়া বলিল, আমাকে লইযা তারা ষ্টীমার-পার্টি করিতে ইচ্ছা করে, আমার সহযোগীকে সঙ্গে লইবার সম্বন্ধে তাদের মধ্যে খুব মতভেদ হইয়াছে। আমি তাদের বুঝাইয়া বলিলাম, সহযোগীকে বাদ দিয়া আমি একাকী ষ্টীমারপার্টিতে যাইতে পারিব না, তাহা হইলে তাঁর প্রতি আমার খুব অভদ্র ব্যবহার করা হয়। তার পর, ছাত্ররা ষ্টীমার-পার্টির কথা আর তুলে নাই।

আমি কখনই নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ছাত্রদের প্রিয়পাত্র হইতে চেষ্টা করি নাই। উচিত নিয়মগুলি এরূপভাবে পালন করি, কেহ তাহাতে অসন্তুষ্টির কারণ দেখিতে পায় না, ধীরে ধীরে নিয়মগুলির অধীন হইতে অভ্যাস করে। কথার ধরণে শিক্ষকের মনের ভাব বুঝিবার ছাত্রদের এরূপ ক্ষমতা আছে, কে তাদের ভালবাসে এবং তারা কাহাকে ভালবাসিবে কিংবা ভালবাসিবে না, স্থির করিতে তাদের সময় লাগে না। কোন অন্যায় কাজ দেখিলে আমি তৎক্ষণাৎ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া থাকি, কিন্তু কখনও কোন ছাত্রের প্রতি আমার ঐ মনের ভাব স্থায়ী হয় না। অনেক সময়ে দেখিয়াছি, যে ছাত্রের প্রতি কোন কারণে অসন্তুষ্ট হইয়াছি, তার প্রতি মনের ঐ ভাব ঘটনার পর আর নাই বুঝিতে পারিয়া, সে আমার অত্যন্ত অনুগত হইতে চেষ্টা করিয়াছে।

দুঃখের সহিত কিন্তু বলিতে হইল, গত কয়েক বছরের মধ্যে, ছাত্রদের মনের পরিবর্ত্তন দ্রুত আরম্ভ হইয়াছে—তাদের স্বাভাবিক সরলতা এবং গুরুজনের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা হ্রাস হইতে আরম্ভ করিয়াছে। এই অবস্থা হইয়াছে, ছাত্রদের রাজনীতিক ক্ষেত্রে টানিয়া আনিবার নির্ব্বোধ চেষ্টার ফলে। গান্ধীজীর অহিংসা আদর্শ সত্ত্বেও, এক দল "দেশ-হিতৈষী" গুণ্ডামির সাহায্যে তাদের মত প্রবল করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যগ্র। তাদের অনুকরণ করিয়া, সভা-সমিতিতে, এমন-কি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে, দেশ-সেবা উৎসাহে উন্মত্ত ছাত্রের দল গুণ্ডামি করিতে দ্বিধা করে না। এইরূপ অবাধে চলিলে, রোগ সময়ে ভীষণ আকার ধারণ করিবে।

কয়েক বছর ল কলেজে কাজ করিয়া অধ্যাপকের জীবন ভাল লাগিল, বাকি জীবন অধ্যাপন করিয়া কাটাইবার ইচ্ছা হইল। ঐ সময়ে তার সুযোগও আসিল। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে, পাটনা ল কলেজের প্রিন্সিপ্যালের কাজ খালি হইয়াছে জানিয়া, ঐ কাজের প্রার্থী হইলাম। পাটনায় আমাকে সকলে চিনিত, আইন সম্বন্ধে যে নূতন গবেষণা করিয়াছিলাম, আবেদনের সঙ্গে পাঠাইয়া দিলাম। ঐ কাজের আর কোন সংবাদ না পাইয়া, কটকে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় ওকালতি করিতে লাগিলাম। পাটনা হাইকোর্টের জজ্, কুলবন্ত্ সহায়, কটকে সার্কিট্ কোর্টে বিচার করিতে আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পাটনা ল কলেজের কাজ লইবার কি আমার ইচ্ছা আছে? তাঁর নিকট শুনিলাম, পাটনা ল কলেজের যিনি ভাইস্-প্রিন্সিপ্যাল্ ছিলেন, তাঁকে প্রিন্সিপ্যাল্ করা হইয়াছে, এবং আমাকে ভাইস্-প্রিন্সিপ্যালের কাজের জন্য মনোনীত করা হইয়াছে। কয়েক দিন পরে, সুল্তান্—পরে সার্ সুল্তান্—আহমদের সঙ্গে দেখা হইল, তিনিও বলিলেন আমি সম্মত হইলে আমাকে ভাইস্-প্রিন্সিপ্যালের কাজে নিযুক্ত করা হইবে। সুলতান্ আহমেদ্ এবং কুলবন্ত সহায়, পাটনা ল কলেজের গভর্ণিং-বডির সদস্য ছিলেন। তখন কটকে ফিরিয়া আসিয়া বেশ রোজগার হইতেছিল, এবং শীঘ্র ম্যুনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান্ হওয়া সম্ভব, আমার ভাই শরৎ পাটনার কাজ লওয়া সম্বন্ধে খুবই আপত্তি করিল। আমার স্ত্রী তখন কলিকাতায় ছিলেন, লিখিয়া জানাইলেন, আমার পাটনার কাজ লওয়া উচিত, কারণ সে পর্য্যন্ত ওকালতিতে আমার যেরূপভাবে দিন কাটিয়াছে, আর তার উপরে নির্ভর করা উচিত নয়,

সরকারি বেশি মাহিনার কাজ যেন ছাড়িয়া না দিই। অবশেষে শরতের সঙ্গে একমত হইয়া পাটনার কাজ লইলাম না। যদি স্ত্রীর ইচ্ছামত ঐ কাজ লইতাম, কাজের শেষে কিছু পেন্‌সন্‌ পাইতাম এবং অর্থ সম্বন্ধেও স্বচ্ছন্দচিত্তে দিন কাটিত।

কয়েক বছর পবে ঘুরিযা ফিরিয়া আবার সেই অধ্যাপকের কাজ লইতে হইল। কটক ম্যুনিসিপ্যালিটির কাজ শেষ হইবার কয়েক মাস পবে, কটক রাভেন্সা কলেজেব আইন বিভাগের ভার লইবার জন্য, একজন বিলাতেব উপাধিধারী আইনজ্ঞ লোকের প্রয়োজন হইল। আমি তখন কলিকাতায় ছিলাম, ঐ কাজের জন্য কলিকাতা হইতে আবেদন করিলাম। বিজ্ঞাপনে, মাসিক বেতন, ৫০০—২৫—৭৫০, উল্লেখ করা হইয়াছিল। আবেদনকারীর মধ্যে আমি যখন সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য বিবেচিত হইলাম, শিক্ষাবিভাগের ইংরাজ ডিরেক্টাব্‌ একটি চাল্‌ চালিলেন। যদিও আইন সম্বন্ধীয় গবেষণার জন্য, তাঁর দেশের লর্ড চ্যান্‌সেলার্‌ আমাকে ইয়োরোপ এবং এমেরিকার প্রসিদ্ধ ব্যবহার শাস্ত্রবিদ্‌দের সমকক্ষ গণ্য করিযাছিলেন, সমুদ্র অতিক্রম করিয়া বিলাত ঘুরিয়া আসি নাই, অর্থাৎ আমার বিলাতী উপাধি নাই, সেজন্য ঐ কাজের মাহিনা ৪০০-২৫-৫০০ দিবার নূতন প্রস্তাব করিয়া, আমাকে চিঠি লিখিলেন। আমার পাটনার বন্ধুরা ঐ নূতন প্রস্তাবের সংবাদ পাইয়া আমাকে অনুরোধ করিলেন, যেন রাগ করিয়া কাজ লইতে অস্বীকার না করি। মানসিক শান্তি এবং আর্থিক নিশ্চয়তার জন্য ব্যগ্র হইয়া, আমি কোন আপত্তি করিলাম না। খৃষ্টাব্দ ১৯২৮ জুলাই মাসে, কটকে যাইয়া কার্য্য-ভার লইলাম।

চেষ্টার দ্বারা উদ্দেশ্য সাধন করিবার বড়াই মানুষ করিয়া থাকে। চেষ্টা অপ্রয়োজনীয় বলিতে চাই না, কিন্তু কেবল চেষ্টার দ্বারা অনেক সময়ে অভিষ্ট সিদ্ধ হয় না। আমি যে অবশেষে সরকারি চাকরি লইয়া, অবসর পাইয়া, জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে গবেষণা সম্পূর্ণ করিতে পারিব, কখন কল্পনা করিতে পারি নাই।

রাভেন্সা কলেজের আইন বিভাগের ভার লইয়া দেখিলাম, সেখানে আইন শিক্ষার্থীদের অবস্থা শোচনীয়। শিক্ষার বিশৃঙ্খলা সম্বন্ধে আমার বেশি কিছু বলা ভাল দেখায় না, তবে ইহা বলিলে যথেষ্ট হইবে, টাকা বাঁচাইবার জন্য, যে কাজে আমি নিযুক্ত হইলাম, তাহা কয়েক বছর খালি

রাখিয়া কোন রকমে শিক্ষার কাজ চালান হইতেছিল। ছাত্রদের নৈতিক অবস্থা দেখিয়া অধিক দুঃখিত হইলাম। তারা বলিল, কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ আইন-ছাত্রদের সন্দেহের চোখে দেখিয়া থাকেন, সেজন্য তারা লাঞ্ছিত হইয়া অন্য ছাত্রদের মধ্যে থাকিয়া কোন রকমে দিন কাটায়। অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, কিছুদিন পূর্ব্বে, একজন আইন শিক্ষার্থীর সহিত কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্ঘর্ষ হইয়াছিল, কিন্তু উপরওয়ালারা ঐ ছাত্রকে সমর্থন করিয়াছিলেন, সেই অবধি তাদের দুর্দ্দশা আরম্ভ হইয়াছে। আইন ক্লাশের ছাত্ররা সকলে উপাধিধারী, তাদের আত্ম-সম্মান জ্ঞান হইয়াছে, অন্যায় ব্যবহার কিংবা হীনতা সহ্য করিতে তারা অনিচ্ছুক। আমি বেশি কিছু না বলিয়া, আইন শিক্ষার্থীদের একত্র করিয়া, তাদের মধ্যে উৎসাহ সঞ্চার করিবার জন্য, অবিলম্বে একটি সমিতি "ল ইউনিয়ন্" নাম দিয়া স্থাপন করিলাম। ছাত্রদের আনন্দের সীমা রহিল না। ইউনিয়নের আলোচনার বিষয়গুলির মধ্যে, বেশির ভাগ, আইন সংক্রান্ত বিষয় রাখিলাম, কিন্তু যাহাতে সেগুলি আধুনিক শিক্ষিত যুবকদের চিত্ত আকর্ষণ করে, সে দিকেও লক্ষ্য রাখিলাম। কয়েকটি নির্ব্বাচিত বিষয়ের উল্লেখ করিলাম: "নাগরিকের নির্দ্দিষ্ট পোষাক ব্যবহারের জন্য আইন প্রচলন," "বেত্রাঘাত দণ্ড," "নির্জ্জন কারাবাস," "ভারতবর্ষের উপযোগী শাসনতন্ত্র"। শেষ বিষয় যে দিন ইউনিয়নে আলোচিত হইল, প্রিন্সিপ্যাল্‌কে সভাপতি হইবার জন্য আহ্বান করিলাম। সেদিন সভার কাজ শেষ হইতে অনেক সময় লাগিয়াছিল, প্রিন্সিপ্যাল্ ডিউক্ সভাপতির আসন হইতে অনেকক্ষণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, এবং ছাত্রদের কৃতিত্ব দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কোন বিষয় আলোচনার জন্য নির্দ্ধারিত হইলে, আমি মোটামুটি তার একটা ধারণা করাইয়া দিতাম, এবং সেজন্য যে সব বইয়ের দরকার, তাহাও বলিয়া দিতাম। সকলের আগে, আমি একটি প্রবন্ধ লিখিয়া, আলোচনা করিবার নিয়ম দেখাইয়া দিয়াছিলাম।

"ল ইউনিয়নের বার্ষিক অধিবেশন" নাম দিয়া একটি অনুষ্ঠানেরও প্রবর্ত্তন করিলাম। ঐ অধিবেশন উপলক্ষে, উপযুক্ত আইনজ্ঞ লোককে আনিয়া সভাপতি করা হইত, এবং স্থানীয় ভদ্রলোকদের নিমন্ত্রণ করা হইত। সচরাচর, জেলার জজ্ সভাপতির আসন গ্রহণ করিতেন। একবার, পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, সার্ কুট্‌নি টেরেল্‌কে আহ্বান করিয়া সভাপতির পদে বরণ করিয়াছিলাম। বার্ষিক অধিবেশনের সময়ে, ছাত্ররা

ইংরাজীতে অভিনয় করিত। ইংরাজীতে অভিনয় প্রচলনের উদ্দেশ্য, আমোদ উপভোগের সঙ্গে, ছাত্ররা যেন কতক পরিমাণে, তাদের ইংরাজী জ্ঞান এবং উচ্চারণের উন্নতি করিতে পারে। রাভেন্সা কলেজে, ইংরাজীতে অভিনয়, আমিই প্রবর্ত্তন করিয়াছিলাম। সেজন্য, আমাকে কিছু পরিশ্রম করিতে হইত। অধিকাংশ সময়ে, সেক্সপিয়রের কোন নাটকের অংশ নির্ব্বাচিত হইত। একবার ডিকেন্সের "পিক্‌উইক্ পেপার্স্" হইতে, "মিসেস্ বার্ডেল বনাম পিক্‌উইকের" বিচার-দৃশ্য অভিনয় করা হইয়াছিল। সেবার একজন ইংরাজ, জেলার জজ, সভাপতি হইয়াছিলেন। ছাত্রদের অভিনয়ের ধরণ দেখিয়া, বিস্মিত হইয়া, আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কে তাদের ঐ সব ধরণ শিখাইয়াছে? বার্ষিক অধিবেশনের জন্য কলেজ হইতে কোন সাহায্য পাইতাম না, নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলিয়া তাহা সম্পন্ন করিতাম।

ছাত্ররা ইংরাজীতে অভিনয় করিয়া সন্তুষ্ট হইত না, ঐ সঙ্গে উড়িয়াতে অভিনয় করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিত। সম্পূর্ণ একটি নাটক অভিনয় করিবার সময় পাওয়া যাইত না, কোন উড়িয়া প্রহসন নির্ব্বাচন করিতে বলিতাম। ছাত্ররা দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিত, উড়িয়াতে হাস্যরসাত্মক নাটক কিংবা প্রহসন সেরূপ নাই, যার অভিনয় করিয়া তারা সন্তোষ লাভ করিতে পারে। আমি বাঙ্গালায় উপন্যাস লিখিয়া থাকি জানিতে পারিয়া, একবার ছাত্ররা, অভিনয়োপযোগী একটি উড়িয়া প্রহসন লিখিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিল। আমি পূর্ব্বে কখন উড়িয়াতে প্রবন্ধ কিংবা বই লিখি নাই। অবশ্য, বরাবরই উড়িয়া ভাল জানি, এবং স্থানীয় লোকের মত নির্ভুল উচ্চারণে উড়িয়াতে কথা কহিতে পারি। আমার উড়িয়া ছাত্রদের সঙ্গে উড়িয়াতে কথা কহিতে ভালবাসিতাম। ছাত্রদের আবদার আমি বরাবর পূরণ করিয়া আসিয়াছি, একখানি উড়িয়া প্রহসন দিব বলিলাম, তবে আমি রচনা করিয়া বলিয়া যাইব, তাদের লিখিয়া লইতে হইবে। তারা তাহা করিতে সম্মত হইল, এবং চার বৈঠকে, একখানি প্রহসন প্রস্তুত হইল। প্রহসনের নাম দিলাম, "দশ অণা ছ' অণা" (দশ আনা ছয় আনা)। সম্বল-বিহীন নূতন উকিল, অর্থাভাবে, দালালের হাতে পড়িয়া, টাকায় দশ আনা তাকে দিয়া, নিজে ছয় আনা মাত্র লইয়া দিন কাটাইয়া থাকে, এবং সেজন্য তার চরিত্র কিরূপ কলুষিত হয়, হাস্যরসের সাহায্যে প্রহসনে তাহা দেখান হইয়াছে। প্রহসনটি ছেলেদের খুব মনের মত হইয়াছিল, এবং তার

অভিনয় দেখিতে খুব ভিড় হইত। আমার বন্ধু, উড়িষ্যার সর্ব্বপ্রধান চিন্তাশীল বিজ্ঞ অধ্যাপক, প্রাণকৃষ্ণ পরিজা, আই, ই, এস্, প্রহসনের দ্বিতীয় বার অভিনয়ের দিন, অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও আসিয়া অভিনয় দেখিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

রাভেন্সা কলেজে থাকিবার সময়ে, আমার প্রতি ছাত্রদের শ্রদ্ধার পরীক্ষা একবার হইয়াছিল। দেশব্যাপী অসহোযোগীতার ঢেউ, যথাসময়ে কটকে আসিয়া ছেলেদের মন চঞ্চল করিয়া তুলিল। দূরস্থান হইতে স্বেচ্ছাসেবকেরা, কলেজের সম্মুখে, ছাত্রদের গতিরোধ করিয়া তাদের কলেজে আসিতে নিষেধ করিল। সব বিষয়ে ছাত্ররা আমার সহানুভূতি পাইত, তারা দল বাঁধিয়া আসিয়া, উপস্থিত অবস্থায় কি করা উচিত, আমার মত জানিতে চাহিল। পাঠ্যাবস্থায়, ছাত্রদের রাজনীতি আলোচনায় কোনই দোষ দেখি না, কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যোগ দিয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া অত্যন্ত অনুচিত এবং অনিষ্ঠজনক মনে করি। স্কুল এবং কলেজের ছাত্রদের সাহায্যে, যারা রাজনীতিক আন্দোলন বিস্তার করিতে চায়, তাদের আমি খুবই নির্ব্বোধ মনে করি। তারা দেশের ইষ্ট অপেক্ষা বেশি অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে। উত্তেজনার বশীভূত হইয়া, চিন্তাশূন্য ভাবে কাজ করিতে, ছাত্র মাত্রেই প্রস্তুত থাকে। তাদের নাচাইয়া তুলিতে পারিলে বিষয়ের গুরুত্ব সাব্যস্ত হইল, যারা মনে করে, তারা খুবই ভ্রান্ত। যে সব ছাত্ররা রাজনীতিক ক্ষেত্রে যোগ দেয়, তারা কেবল অন্ধভাবে করতালি দিবার দল পরিপুষ্ট করিয়া থাকে। কেবল উৎসাহ প্রকাশের দ্বারা মহৎ কিংবা স্থায়ী কোন কাজ হয় না। বুদ্ধি এবং বিবেচনা ভালরূপ বিকাশ হইবার পূর্ব্বে, যারা কোন স্রোতের ভিতর গিয়া পড়ে, তারা স্রোতের টানে ভাসিয়া যায়, পরিচালক হইয়া কাজ করিবার ক্ষমতা তাদের কখন হয় না। আমাদের দেশ যখন স্বাধীন এবং উন্নত ছিল, দেশের শিক্ষার্থীরা ছাত্রজীবনের অপব্যবহার করিত না। তারা সংসারের নানাবিধ স্রোত হইতে দূরে থাকিয়া, ব্রহ্মচর্য্যপালন করিয়া, শিক্ষার শেষে, যখন গার্হস্থ্য আশ্রমে আসিত, অপ্রতিহতভাবে যে কোন উচিত কাজ করিবার ক্ষমতা কিংবা বুদ্ধির অভাব তাদের হইত না। এখন ছাত্রজীবনে, ব্রহ্মচর্য্য ত নাই, দেশ উদ্ধার করিবার সমস্ত ভার তাদের অপরিপক্ক স্কন্ধের উপর আসিয়া পড়িয়াছে! শিক্ষা শেষ করিতে জীবনের কত সময়ই বা লাগে? বার বছর পর্য্যন্ত, একরূপ অজ্ঞানে কাটে, তার পর আট-দশ বছর, একাগ্রচিত্তে

বিদ্যাভ্যাস করিলে, শিক্ষা-জীবন শেষ হইয়া যায়। জীবনে, এই কয়টা বছর অপেক্ষা না করিয়া, দায়িত্বশূন্যভাবে অপরের ইঙ্গিতে পরিচালিত হইলে বুঝি খুব মহৎভাবে জীবন কাটান হয়? শিক্ষা-জীবন শেষ করিয়া, দেশের সেবায় জীবন নিয়োগ করিলে, দেশকে অধিক গৌরবান্বিত করিতে পারা যায়। দেশের ভবিষ্যত মঙ্গলের জন্য, উচ্চশিক্ষিত যুবককের প্রয়োজন কত বেশি, তাহা জার্ম্মানীর দৃষ্টান্ত দিয়া, ছাত্রদের বুঝাইলাম। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ইয়োরোপে যখন ভীষণ যুদ্ধানল প্রজ্বলিত হয়, যে সব দেশ যুদ্ধে যোগ দিয়াছিল, তাদের কলেজের ছাত্রদেরও যুদ্ধে যাইবার জন্য নেতারা উৎসাহ দিয়াছিল, কেবল জার্ম্মানী তাহা করে নাই। জার্ম্মানী তার কলেজের ছাত্রদের বলিয়াছিল: যদি কখন শত্রু আসিয়া তোমাদের গৃহ আক্রমণ করে, নিশ্চয়ই অস্ত্র ধরিয়া, যতদূর পার, গৃহরক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে, কিন্তু এখন স্বল্পসংখ্যক তোমরা রণে যাইবা মাত্রই শত্রুর হাতে প্রাণ হারাইবে, তাতে দেশের কোন লাভ নাই, বরঞ্চ ভবিষ্যৎ অত্যন্ত খারাপ হইবে; সাধারণ লোকদের জীবনের সঙ্গে তোমাদের জীবনের তুলনা হয় না; তোমরাই দেশের ভবিষ্যৎ শাসনকর্ত্তা; দেশ হইতে যদি শাসনকর্ত্তা শ্রেণীর লোক কিছুকালের জন্য বিলুপ্ত হয়, দেশে শাসনের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়ে, সাধারণ লোকের অভাবে সেরূপ হয় না। যুদ্ধের শেষে, যখন ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে, যোগ্য লোকের অভাবে শাসনকার্য্য বিশৃঙ্খল হইতে লাগিল, কেবল জার্ম্মানী পূর্ণতেজে শাসনাকার্য্য চালাইয়াছিল। পনর বছর পূর্ব্বে, কলেজের ছাত্র, আমার একজন খুব নিকট আত্মীয়কে, রাজনীতিক আন্দোলনে ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া, যেরূপ সহৃদয়ভাবে তার সঙ্গে সব বিষয় আলোচনা করিয়াছিলাম, ছাত্রদের সঙ্গে ঠিক সেইভাবে বিষয়ের সব দিক আলোচনা করিলাম। আহ্লাদিত হইয়া দেখিলাম, তারা আমার উপদেশ গ্রহণ করিল এবং কলেজ হইতে অনুপস্থিত হইবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিল। কেবল একজন ব্রাহ্মণ যুবক আমাকে গোপনে বলিল, সে কংগ্রেসের সঙ্গে যেরূপ সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, কলেজ না ছাড়িলে তাকে খুব অপদস্থ হইতে হইবে, এবং ঐ দলের লোকদের নিকট যে সাহায্য পাইয়া থাকে, তাহা হইতে বঞ্চিত হইবে।

কটকে পড়াইবার সময়ে, কলিকাতার ল কলেজ অপেক্ষা, ছাত্রদের সংস্পর্শে অধিক আসিতে হইয়াছিল। তাদের খেলার সংবাদও কিছু রাখিতাম। প্রায়

আড়াই শত বিঘা জমির উপর, চৌদ্দ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া, রাভেন্সা কলেজের গৃহ, ছাত্রনিবাস এবং অধ্যাপকদের থাকিবার স্থান, নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। ছাত্রদের প্রশস্ত খেলিবার মাঠ, কলেজের সংলগ্ন রহিয়াছে। আমাদের সময়ের তুলনায়, পড়ার ধরণের ন্যায়, খেলার নিয়মেরও, সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তখন যে কোন বি, এ, উপাধিধারী, শিক্ষিত লোক বলিয়া গণ্য হইত, এখন অধিকাংশ বি, এ, উপাধিধারীকে সাধারণ কেরানী কাজের অধিক যোগ্য, কেহ মনে করে না। কিন্তু ছাত্রজীবনে, খেলার বিষয়ে অসাধারণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কর্ত্তৃপক্ষের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে। কিছুদিন লক্ষ্য করিয়া বুঝিলাম, প্রিন্সিপ্যালের নিকট অধ্যাপকের সুখ্যাতি পাইবার ইচ্ছা থাকিলে, ছেলেদের খেলার তত্ত্বাবধান করা দরকার! একজন অল্পবয়স্ক অধ্যাপক পড়াইতে ভাল পারিতেন না, কিন্তু ছেলেদের খেলার ব্যাপারে খুব যোগ্যতার পরিচয় দিয়া, অল্প সময়ের মধ্যে প্রিন্সিপ্যালের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন এবং চাকরির বেশ সুবিধা করিয়া লইলেন! একজন বয়স্ক অধ্যাপক, তিনিও ভাল পড়াইতে পারিতেন না, শীঘ্র উচ্চ গ্রেডে প্রবেশ করিতে পারিবেন কেহ আশা করে নাই, কিন্তু ছেলেদের খেলার তত্ত্বাবধায়কের কাজ সন্তোষজনক ভাবে করিয়াছিলেন, সেজন্য যোগ্য অধ্যাপক বিবেচিত হইয়া, প্রথম চেষ্টায় উচ্চগ্রেডে প্রবেশ করিলেন!

ছেলেদের মধ্যে খেলার জন্য, অত্যধিক উত্তেজনা জাত করিবার গভীর উদ্দেশ্য আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও বুঝিতে পারি নাই। স্বাস্থ্যের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা দরকার, বেশ বুঝি, এবং স্বাস্থ্যের জন্য ব্যায়ামের প্রয়োজন, তাহাও ভাল বুঝি। শারীরিক সুস্থতালাভের জন্য নিয়ম করিয়া দুই বেলা ব্যায়াম করিতে, দেড় ঘণ্টার বেশি সময় লাগে না। কিন্তু, দল বাঁধিয়া, দিনের মধ্যে, চারি-পাঁচ ঘণ্টা খেলায় নিযুক্ত থাকিয়া, এবং সকাল-সন্ধ্যা আরও কয়েক ঘণ্টা খেলোয়াড়দের সম্বন্ধে জটলা করিয়া, স্বাস্থ্যের কি অসাধারণ উন্নতি, এবং ছাত্রজীবনের কি প্রথম শ্রেণীর সংস্কার সাধন করা হয়, আমি বুঝিতে পারি নাই! ইহাতে অনুকরণের প্রবৃত্তি মিটান হয়, তার কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু এই মত্ততার উপকারিতা আমি খুঁজিয়া পাই না। আমাদের ইহা একটা বড় রকমের ভুল ধারণা, ছাত্র-জীবনে—জীবনের গোণা কয়টা বছরের মধ্যে—জীবনের সব সাধ মিটান চাই! শিক্ষার শেষে, ইচ্ছামত, যে কোন ক্রীড়ায়

যোগ দিয়া পারদর্শিতা লাভ করার পক্ষে কোন বাধা নাই। নানাবিধ খেলার শত শত দল, দেশ ছাইয়া ফেলিলে কেহ আপত্তি করিবে না, কিন্তু যাহা স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য প্রয়োজন নয়, যার প্রধান উদ্দেশ্য, উদ্দাম আমোদের দিকে মনকে উত্তেজিত করা—যাহা তরলপ্রকৃতি ছাত্রদের মন চঞ্চল করিয়া পাঠে অমনোযোগিতা আনিয়া থাকে—সেরূপ পথে তাদের লইয়া গিয়া কেবল অনিষ্ট সাধন করা হয়। দৈবাৎ দু'একজন ছাড়া, যে ছাত্র, আধুনিক ধরণে, খেলার নেশার অধীন হয়, তাকে সরস্বতীর নিকট চিরকালের জন্য বিদায় লইতে হয়।

আমাদের ছাত্রদের অশেষ দুর্গতি। কেহ কোন নূতন বিষয়ের প্রবর্ত্তক হইয়া প্রসিদ্ধিলাভের ইচ্ছা করিলে, বাঁধা অবিরোধী ছেলের দল আছে, আবিষ্কারটা তাদের উপর দিয়া চালান হয়! ছেলে-চরের পর, এখন ব্রতাচারীর পালা জোরে চলিতেছে! খুব আশা করা যায়, উদ্ভাবনশীল কেহ তার উপর টেক্কা দিয়া, নূতন একটা হুজুক শীঘ্রই ছেলেদের স্কন্ধে চাপাইতে পারিবে!

খৃষ্টাব্দ ১৯৩৫ এপ্রেলের শেষে, রাভেন্সা কলেজের কাজ হইতে অবসর লইতে হইল। সাত বছরের কিছু কম কাজ করিয়াছিলাম, পেনসন্ পাইলাম না। অনেকে মনে করিয়াছিল, আমি পুনরায় কটকে ওকালতি করিব, কিন্তু আমি স্থির করিলাম, কলিকাতায় ছেলেদের নিকট আসিয়া থাকিব, এবং সাহিত্য ও দর্শনের চর্চ্চা এবং অধ্যাপন করিয়া, বাকি জীবন কাটাইব। খৃঃ ১৯৩৫ জুন মাসে, অবসর লইবার এক মাস পরে, আমি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পোষ্ট্-গ্রাজুয়েটের আর্ট বিভাগে, অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সাহিত্য চর্চ্চা

অন্য সব লালসার মত, খ্যাতির লালসা সহজে কাটান যায় না। এক শ্রেণীর লোক, লেখক হইযা খ্যাতিলাভের লিপ্সা অতিক্রম করিতে পারে না। আমার মনে হয়, ইহা তাদের প্রকৃতিগত। সুন্দর ছাপা, মনোরম বাঁধাই এবং মলাটের গায়ে সোনালী অক্ষরে নিজের নাম দেখিলে, তাদের এরূপ তৃপ্তি হয়, যার তুলনায় অন্য সব আনন্দ তুচ্ছ হইয়া যায়! ঐরূপ একটা মনের ভাব যে আমার কখন হয় নাই. বলা বড় শক্ত, তবে অযথা বড়াই না করিয়া বলিতে পারি, পাঠ্য-জীবন হইতে, যে কোন বিষয় লইযা লিখিতে ইচ্ছা করিয়াছি, গুছাইয়া লিখিতে পারিয়াছি। জীবনের শেষভাগে, অকপটচিত্তে বলিতে পারি, লিখিয়া যে আনন্দ পাই, খুব কম কাজে সেরূপ তৃপ্তি লাভ হইয়া থাকে।

কটকে, ছাত্রজীবনে—সে আজ চল্লিশ বছরের কথা—আমরা কয়জন বন্ধু মিলিয়া একটি সাহিত্য সমিতি স্থাপন করিয়াছিলাম। তার নাম ইংরাজীতে আমরা "অবজর্ভার্ ক্লাব" রাখিয়াছিলাম। ঐ সমিতির প্রথম সম্পাদক ছিলেন, রায় বাহাদুর গোপালচন্দ্র প্রহরাজ, যিনি উড়িয়া বিশ্বকোষ লিখিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন; কিছুদিনের জন্য সম্পাদক ছিলেন, অভিরাম ভঞ্জ, যিনি উড়িয়াদের মধ্যে প্রথম মুন্সেফ্ হইয়া অল্পবয়সে মারা গিয়াছেন; তার পর, আমি সম্পাদক হইয়া, শেষ পর্য্যন্ত ছিলাম। সভার স্থান ছিল, কালীগলিতে পুরাতন বালিকা বিদ্যালয়ের গৃহ, যেখানে এখন কটকের উকিলখানা হইয়াছে। কোন কারণে সেখানে অধিবেশনের সুবিধা না হইলে, আমাদের গৃহে সভা বসিত। মাঝে মাঝে গণ্যমান্য লোকেরা আসিয়া সভাপতির আসন অলংকৃত করিতেন এবং আমাদের বাৎসরিক অধিবেশন, খুব আড়ম্বরের সহিত পুরাতন রাভেন্সা কলেজ-হলে সম্পন্ন হইত। একবার মাদ্রাজের বিখ্যাত বক্তা ও কংগ্রেসের সভাপতি, আনন্দ চার্লু, এবং কয়েকবার রাভেন্সা কলেজের বিজ্ঞ এবং সুবক্তা প্রিন্সিপ্যাল, নীলকণ্ঠ মজুমদার, বক্তৃতা দিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। আমাদের নিয়ম ছিল, সাপ্তাহিক অধিবেশনে, একজন বক্তৃতা দিবে, একজন

প্রবন্ধ পাঠ করিবে, এবং সুবিধা হইলে, কেহ নিজের রচিত গল্প বা কবিতা পাঠ করিবে। প্রত্যেক সভ্য, কিছু লিখিতে কিংবা বক্তৃতা দিতে বাধ্য ছিল, তবে আমরা তিনজন—ইংরাজীতে বক্তৃতা দিবার জন্য বন্ধু অভিরাম, বাঙ্গালায় কিংবা ইংরাজীতে গল্প লিখিবার জন্য আমি, এবং বাঙ্গালায় কবিতা রচনা করিবার জন্য আমার ভাই শরৎ—সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতাম। কোন কারণে, কেহ লিখিবার কিংবা বক্তৃতা দিবাব পালা রাখিতে না পারিলে, আমাদের তিনজনেব মধ্যে টান পড়িত, এবং আমরা কখনও অসম্মত হইতাম না। তখন, অল্প সময়েব মধ্যে, ইংরাজীতে কিংবা বাঙ্গালায়, ছোট গল্প লিখিয়া বন্ধুদের মনোরঞ্জন করিতে পারিতাম, তবে বেশি বযসে সে রচনাগুলি আমার তেমন ভাল লাগে নাই।

প্রথম জীবনে বাঙ্গালায় লিখিবার অবকাশ পাই নাই, সেজন্য অভ্যাস করিয়া লেখক হইতে চেষ্টা করি নাই। বেশি বয়সে, যখনই কোন বাঙ্গালা বই লিখিয়াছি, উদ্দীপনার বশীভূত হইয়া কোন উদ্দেশ্য ধরিয়া লিখিয়াছি, খ্যাতি-লাভের জন্য নয়। আমাদের দেশে সাহিত্যিকদের অবস্থা যেরূপ, প্রথম হইতে অভ্যাস রাখিলে, লেখক হইয়া খ্যাতিলাভ কবিতে বেশি চেষ্টার দরকার হইত না।

অল্প বয়সে, একবাব কেবল ইংরাজী শিলিং উপন্যাসের অনুকরণে, কতগুলি ছোট উপন্যাস বাঙ্গালায় লিখিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। ঐ পর্য্যার প্রথম উপন্যাস, "কাশ্মীরে বাঙ্গালী যুবক" নাম দিয়া লিখিয়াছিলাম। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে, কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করিতে আসিবার ঠিক পূর্ব্বে, বই-খানি বাহির হয়। বাঙ্গলার প্রথম বিখ্যাত প্রকাশক, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, তখন জীবিত ছিলেন। তিনি প্রথম সংস্করণের কতগুলি বই বিক্রয় করেন, বাকি বইগুলি, "বসুমতী"র প্রবর্ত্তক এবং সত্বাধিকারী, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মোট কিছু দিয়া কিনিয়া লইয়াছিলেন। ঐ বইয়ের নূতন সংস্করণ বাহির করিবার কিংবা কল্পনামত ঐ ধরণের অন্য উপন্যাস লিখিবার, অবকাশ কিংবা ইচ্ছা, আর হয় নাই।

"কাশ্মীরে বাঙ্গালী যুবক" উপন্যাসে, কেবল অনাবিল বন্ধনশূন্য কল্পনা খেলা করিয়া বেড়াইয়াছে। বেশি কিছু সার নাই, আছে কেবল প্রেমের স্বচ্ছ দিকের কথা, যাহা আমার খুব মনের মত, কিন্তু যাহা আমাদের দেশের বড় কিংবা ছোট লেখক পছন্দ করে না, কিংবা সাধারণ পাঠক উপভোগ্য

করিতে শিখে নাই, এবং যাহা এক শ্রেণীর লোকের মতে, অবাস্তব বলিয়া বিবেচিত হয়। গল্পের নায়ক, সামাজিক কারণে, নায়িকার সঙ্গে মিলনের আশা নাই দেখিয়া, কেবল তার মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া জীবন কাটাইবে ভাবিয়া যখন বলিল, "পরিতৃপ্তি শরীর হইতে আত্মার চালিত হইলে তাহার বিনাশ নাই", ইহাতে কি রক্তের স্রোত ধমনীতে বেগে প্রবাহিত হয়, না উপন্যাস জাঁকিয়া উঠে? ঐরূপ বই লিখিয়া কিংবা পড়িয়া, কেহ কি এখনকার দিনে সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছা করে? হাইকোর্টে আসিয়া, পুরাতন "সাধনা"র ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, আমার বন্ধু সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ঐ বই পড়িতে দিয়াছিলাম, এবং তাঁর দ্বারা, তাঁর বিখ্যাত কাকা রবীন্দ্রনাথকে একখানি বই উপহার পাঠাইয়াছিলাম। কিছুদিন পরে, সুধীন্দ্রনাথ বলিলেন, বইখানি তাঁর এবং তাঁর স্ত্রীর ভাল লাগিয়াছে, তবে তাঁর কাকা পড়িয়া কিছু বলেন নাই।

কলিকাতা হাইকোর্টে আসিবার পর, দিন দিন কাজ যেরূপ বাড়িতে লাগিল, বাঙ্গলায় লিখিবার আন্তরিক ইচ্ছার সুযোগ যে জীবনে কখন ঘটিবে, সে আশা বড় রহিল না, কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে, জীবনের শেষ ভাগে, মাতৃভাষা চর্চ্চা করিবার সুবিধা হইল। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে, কটক ম্যুনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের কাজ শেষ হইবার পর, এবং রাভেন্সা কলেজে অধ্যাপকের কাজ লইবার পূর্ব্বে, প্রচুর অবসর পাইলাম। আমার অবসরের সময় কখন আলস্যে কাটে না। কাজের বোঝা নামিবার সঙ্গে সঙ্গে, কল্পনার রাশি আসিয়া চিত্তকে অধিকার করিল। জীবনে চিন্তা করিয়া সময় কাটাইয়া, আমি সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দ পাইয়াছি। একলা বসিয়া, যদি সুযোগ থাকে, প্রকৃতির কোন সুন্দর দৃশ্যের সাহায্যে, প্রীতিকর বিষয়গুলি চিন্তা করিয়া মনে যেরূপ স্বচ্ছন্দতা লাভ করি, অন্য কোন প্রকারে সেরূপ আনন্দ পাই না। আমার পরম আনন্দের কল্পনা হইতেছে, সুর কিংবা প্রাণপূর্ণ প্রকৃতির সাহায্যে, নিজেকে চিন্তার মধ্যে নিমগ্ন করিয়া রাখা। পূর্ব্বে দীর্ঘ অবসর কখন ভোগ করি নাই, জীবনে প্রথম ঐ অবসর পাইয়া, আমার কল্পনার জগৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল।

কল্পনা কে না করিয়া থাকে? কার প্রাণ কল্পনার কোমল স্পর্শে পুলকিত না হয়? কিন্তু সকলের কল্পনা একই রূপ ধরিয়া জগিয়া উঠে না। আমার চিন্তা নির্দ্দিষ্ট একটি দিক আশ্রয় করিয়া চলিতে লাগিল। লোক কিংবা সমাজের পক্ষে যাহা হিতকর নহে, সেরূপ চিন্তার প্রতি আমার আকর্ষণ

নাই। মনের গঠন যেরূপ হইয়া উঠিয়াছে, সমাজের দ্বারা আমাদের সঙ্কীর্ণ বাঙ্গালী কিংবা হিন্দু সমাজ বুঝি না, আমার কল্পনা বিশ্বব্যাপী মানব সমাজ আলিঙ্গন করিবার জন্য ব্যগ্র। দেশ-কালের গুরুত্ব উপেক্ষা করিবার ইচ্ছা নাই—কেবল ইচ্ছা করিলেই একটা বাঁধা সময়ের মধ্যে, কোন সমাজ আদর্শস্থানীয় হইয়া উঠিতে পারে না—সবই ক্রমবিকাশ নিয়মের অধীন। কিন্তু দেশ-কালের দোহাই দিয়া, বহুকালের অহিতকর নিয়মগুলিকে প্রশ্রয় দিবার ইচ্ছা অদৃশ্য হইয়াছে। যাহা যথার্থ মানবের পক্ষে হিতকর নয়, তাহা কোনও সমাজ, অতএব হিন্দু সমাজের পক্ষেও, হিতকর হইতে পারে না, আমার চিন্তা ঐ আকার ধারণ করিয়া লেখনীর আশ্রয় লইবার জন্য ব্যগ্র হইল।

যে সুখের জন্য মানুষ সর্ব্বদা লালায়িত, ঐ সুখের আলোচনা করিয়া, তার মূল সংযম, শীঘ্রই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সংযমই মানুষের প্রকৃত বল এবং আনন্দের কারণ, সংযমী না হইলে সুখী হওয়া যায় না, বেশ বুঝিতে পারিলাম। যে লোক কিংবা সমাজ, সংযমের পথ ত্যাগ করিয়াছে, সে লোক কিংবা সমাজ, কখন সুখের পথে অগ্রসর হইতে পারে না, আমার ধারণা বদ্ধমূল হইল।

সংযম যে সুখের মূলে রহিয়াছে, আমাদের প্রাচীন ঋষিরাই প্রথম বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সংযমের অভাবে প্রাণ শুষ্ক তরুর ন্যায় হইয়া উঠে, মনে কোন সবল ধারণা স্থান পায় না, সুখের পথ রোধ হয়, আর্য্যঋষিরা তাহা বুঝিতে পারিয়া, সংযমের স্থান সর্ব্বোচ্চে স্থাপন করিয়াছিলেন। সংযমের বলেই তাঁরা ভূত ও ভবিষ্যতের মধ্যে প্রবেশলাভ করিতে পারিতেন। মানবের শৈশবে, মূল বিষয় সম্বন্ধে, তাঁরা যেরূপ গভীর চিন্তা করিয়াছিলেন, এখন লোকেরা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না, সংযমের অভাবে মানুষের স্মৃতিশক্তি এরূপ ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে! মানুষ বড়াই করে, তার বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ—সে নিত্য কত অদ্ভুত জিনিষ আবিষ্কার করিয়া জ্ঞানের সীমা বাড়াইতেছে—কিন্তু সে যদি বুঝিতে পারে, সংযমের দ্বারা, জ্ঞানের সীমা কত শীঘ্র এবং কত অধিক বাড়াইতে পারা যায়, নিশ্চয়ই সে জীবনে সর্ব্বপ্রথম সংযম অভ্যাসে মন নিয়োগ করিত।

আমাদের দেশে এখন দেখিতে পাই, প্রাচীন ঋষিদের অনুকরণ করিবার ইচ্ছা এক শ্রেণী শিক্ষিত লোকের মনে স্থান পাইয়াছে। তারা মনে করে,

নগর হইতে দূরে আশ্রম করিয়া, বৃক্ষতলে কিংবা মৃত্তিকা গৃহে সময় কাটাইলে, ঋষিদের আদর্শ অনুকরণ করা হইল! তারা বুঝে না যে, সংযমই ঋষিদের প্রাণস্বরূপ ছিল, সংযমের পথে না গিয়া, কেবল কয়েকটা বাহ্যিক বিষয় অনুকরণ করিলে, ঋষি-জীবন কাটান হয় না।

কেহ যেন মনে না করে, সুখের অন্বেষণে সফলকাম হইবার জন্য, মানুষকে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হইতে বলিতেছি। সন্ন্যাসধর্ম্মের উপযুক্ত স্থান মানব-জীবনে আছে, অস্বীকার করি না, কিন্তু গার্হস্থ্য আশ্রম যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আশ্রম, তার কোন সন্দেহ নাই। তাহা না হইলে জগৎ-সৃষ্টি উদ্দেশ্যহীন এবং ব্যর্থ হইয়া যায়। গৃহস্থের অর্থাৎ সংসারের মঙ্গলের জন্য, যখন সন্ন্যাস-ধর্ম্ম নিযুক্ত হয়, তখনই তার সার্থকতা লাভ হইয়া থাকে। সংযম অভ্যাস করিয়া গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করিলে, গার্হস্থ্য জীবনের সুখ এবং সাফল্য লাভ হয়। ইন্দ্রিয় সেবার জন্য দার গ্রহণ করা হয় না, স্পষ্ট বুঝাইবার জন্য, ঋষিরা বলিয়াছেন, 'পুত্রার্থে ক্রীয়তে ভার্য্যা'। স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী বলিবার পর, ঐ বাক্যের তাৎপর্য্য এই, স্ত্রীর সহিত শরীরগত সম্বন্ধ, কেবল সন্তান লাভের জন্য। স্ত্রীর সহিত পারমার্থিক সম্বন্ধ, হিন্দুরা যেরূপ বুঝিয়াছে, অন্য কোন জাতি তাহা উপলব্ধি করিয়াছে, মনে হয় না।

সমাজে, বিবেচনা পূর্ব্বক, পুরুষ-নারীর মিশ্রণের নিয়ম স্থির করিতে না পারিলে, সংযম অভ্যাসের যে অত্যন্ত ব্যাঘাত হয়, দেশের মঙ্গলকামী চিন্তাশীল লোকেরা এখনও উপলব্ধি করিতে পারে নাই। পুরুষ-নারীর নির্ব্বিশেষ মিশ্রণ, সংযমের মূল শিথিল করে, যদি তারা বুঝিতে পারিত, দিন দিন সভ্যতার নামে, অবৈধ মিশ্রণের প্রশ্রয় দিয়া, কখনই সমাজকে বিশৃঙ্খলের পথে লইয়া যাইত না। ঐরূপ মিশ্রণের ফলে, গার্হস্থ্য আশ্রমের আদর কমিয়া আসে, ব্যক্তিগত লালসা বাড়ে, সমাজ দুর্ব্বল ও ক্ষীণ হইয়া পড়ে, এবং অবশেষে দেশ অবনতির শেষ সীমায় আসিয়া, যেরূপ ঘোর অসংযমী ইতালী দেশ এক সময়ে ধ্বংস হইয়াছিল, সেইরূপ ধ্বংস হয়।

সংযমের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই আমাদের দেশের চিন্তাশীল লোকেরা সমাজকে গড়িয়া তুলিয়াছিল। নারীর স্থান পুরুষের অপেক্ষা কোন অংশে হীন, তারা কল্পনা করে নাই, নারীরূপে ঈশ্বরকে আরাধনা করিয়া, নারীত্ব এবং মাতৃত্বের গৌরব চরমে তুলিয়াছিল। কিন্তু, তারা পুরুষ-নারীর অবৈধ মিশ্রণের ঘোর বিরোধী ছিল। উচ্চ অঙ্গের বিবাহ, দানের দ্বারা এবং দান

গ্রহণের দ্বারা, সম্পন্ন হইত। পিতা, ষোড়শী কন্যাকে, দান করিত, এবং জামাতা তাকে বধূরূপে গ্রহণ করিত। পত্নীর অন্বেষণে পুরুষ ঘুরিয়া বেড়াইত না, কিংবা নারী স্বামী পছন্দ করিয়া লইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া সময় কাটাইত না। সমাজে, সকল শ্রেণীর লোকদের একভাবাপন্ন হওয়া সম্ভব নয়, সেজন্য বিবাহের নানাবিধ প্রথা ছিল। যখন রাজকন্যার বিবাহ রাজপুত্র ছাড়া অন্য কাহারও সঙ্গে হইত না, এবং সুন্দরী রাজকন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য রাজাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইত, তখন রাজকন্যা স্বয়ংবরা হইয়া স্বামী বাছিয়া লইবার পর, রাজাদের কলহ মিটিত। আবার কোন পুরুষ, রূপের লালসায় বিদ্ধ হইয়া, অপেক্ষা না করিয়া, কেবল মালা বদল করিয়া, নিজের ইচ্ছা পূর্ণ করিত। কন্যা কেনা-বেচাও চলিত।

আমাদের বিবাহে স্বাধীন পছন্দের স্থান নাই, মনে করা অত্যন্ত ভুল। লালসার পছন্দ, যাহা স্বাধীন পছন্দ নামে প্রচলিত, তাহা অবশ্য আমাদের মধ্যে নাই। বুদ্ধিহীন লোকেরা, স্বেচ্ছাচারিতা বা উচ্ছৃঙ্খলতাকে স্বাধীনতা মনে করিয়া থাকে। উচিত অনুচিত বিচার করিয়া কাজ করিতে না পারিলে, স্বাধীনভাবে কাজ করা হইল, কখন বলা যায় না। স্বাধীনতার প্রধান লক্ষণ, উচিত কাজ করিবার প্রবল ইচ্ছা। লালসার বশীভূত হইয়া কাজ করিলে, স্বাধীনভাবে কাজ করা হইল, কখনই বলা চলে না। যদি উচিত পছন্দকে স্বাধীন পছন্দ বলে, তাহা হইলে স্বাধীন পছন্দ, বরাবরই আমাদের মধ্যে আছে, স্বীকার করিতে হইবে। কন্যার অনুরূপ বর, বরের অনুরূপ কন্যা, অধিকাংশ সময়ে নির্ব্বাচিত হয়। কন্যার অনিচ্ছায়, কোন পুরুষের সহিত বিবেচক পিতা তার বিবাহ দেয় না, কিংবা পুত্রের অনিচ্ছায়, কোন কন্যার সহিত তার বিবাহ হয় না। পিতা ক্ষমতার অপব্যবহার যেরূপ আমাদের দেশে করিয়া থাকে, স্বাধীন পছন্দের দেশেও, লোভে পড়িয়া অভিভাবকেরা, ক্ষমতার অপব্যবহার প্রত্যহ করে। ইহা কখন সম্ভব নয়, কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, এক উপায় চিরকাল অবলম্বন করিতে হইবে। লালসার পথে না গিয়া, আমাদের আদর্শ বজায় রাখিয়া, পাত্র-পাত্রী নির্ব্বাচন প্রথার পরিবর্ত্তন, সময়ে প্রয়োজন হইতে পারে। সেরূপ পরিবর্ত্তনের সূচনা হইয়াছে। আমি এখানে কেবল আমাদের দেশের আদর্শের বিষয় আলোচনা করিতেছি।

আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা বিজিত জাতি। এই শতাব্দীর প্রারম্ভে, রুশের সঙ্গে জাপানের ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়াছিল। একটি যুদ্ধে, জাপান পঞ্চাশ হাজার

রুশ সৈন্য নিহত করিয়া জিতিবার পর, জাপানের প্রতিনিধিকে সম্বোধন করিয়া ফরাসী দেশের প্রতিনিধি বলিলেন, জাপান যথার্থই বড় একটি জাতি! ঐ প্রশংসা-বাক্য শুনিয়া, জাপানের প্রতিনিধি উত্তর দিয়াছিলেন: জাপান বহু-দিন হইতে সভ্যতার কত নিদর্শন ইয়োরোপে পাঠাইয়াছে, তবুও সভ্য গণ্য হয়নি; এক যুদ্ধে, পঞ্চাশ হাজার লোক নিহত করিয়াছে, তাই সভ্যজাতি হওয়ার দাবি হইয়াছে শুনিয়া, তাঁর অত্যন্ত দুঃখ হইল! যে জাতি, বাহুবলের দ্বারা কিংবা যেরূপ করিয়া হউক, পৃথিবীর কতক অংশ দখল করিতে পারে, সেই জাতি সভ্য এবং বড় জাতি বলিয়া জগতে গণ্য হইয়াছে! পরাক্রমের স্তুতিবাদ, অধিকাংশ লোকেরাই করিয়া ধন্য হইতে চায়, যদি কেহ করিতে না চায়, পরাক্রম শীঘ্রই খোঁচা মারিয়া বুঝাইয়া দেয়, প্রশংসা করিবার কারণ আছে কি না! ঘৃণার চোখে, বিজীত জাতির সবই মন্দ ধরিয়া লইবার যেরূপ একটা তীব্র ইচ্ছা হয়, সেইরূপ বিজয়ী জাতি সব গুণের আধার, মনে করিবার প্রবল ইচ্ছাও হইয়া থাকে। মানুষ মনে করে, তাহা না হইলে, এক জাতি অপর এক জাতিকে পদানত করিতে পারিবে কেন? বলের চারিপাশে, গুণের রাশি এবং সৌন্দর্য্যের ছটা ঘুরিয়া বেড়ায়! অসংখ্য বীরে পরিপূর্ণ, কিন্তু একতাবিহীন হিন্দুস্থান, যখন মুষ্টিমেয় মুসলমানের অধীন হইল, মুসলমানের বাহুবলের চারি-দিকে গুণ এবং সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিল। হিন্দু মুসলমানকে অনুকরণ করিয়া ধন্য হইল। মুসলমান রমণীর অনুকরণে, হিন্দুরমণীকে অসূর্য্যম্পর্শা করিয়া বড়াই করিতে লাগিল! তার পর হতভাগ্য হিন্দুস্থান, মুসলমান অধিবাসীদের সহিত, যখন ইংরাজের অধীনে আসিল, গুণের অন্বেষণে তখন প্রবল পরাক্রান্ত ইংরাজের ঘরে, হিন্দু, এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও, নূতন বিজীত মুসলমান, ছুটিল! লালসার জয় সর্ব্বত্র এবং শীঘ্র হইয়া থাকে। সে লালসা যদি আবার মায়াবী সাজিয়া, উন্নতির পথে লইয়া যাইতেছে, দাবি করিয়া, মোহনবেশে লোকের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়, তার জয় অনিবার্য্য, মানুষ নতজানু হইয়া বিমুগ্ধহৃদয়ে তার উপাসনা করে! আজ হিন্দু, তার কোন গুণ কিংবা বড়াই করিবার কারণ আছে, দাবি করিতে লজ্জা বোধ করে, সে পাশ্চাত্য দেশের লোককে অনুকরণ করিয়া ধন্য হইবার জন্য ব্যগ্র!

ইয়োরোপবাসীদের নিশ্চয়ই কতগুলি গুণ আছে, যাহা আমাদের নাই, যেগুলি অনুকরণ করিলে আমাদের সাংসারিক জীবনের উন্নতিসাধন হইতে পারে। কতগুলি অসাধারণ গুণ আছে, তাই তাদের দোষগুলি

আমাদের চোখে দোষ বলিয়া মনে হয় না। তাদের গুণের সঙ্গে দোষগুলি এরূপ জড়ান আছে, দোষগুলিকে দোষ মনে করিতে ইচ্ছা হয় না। যখন ইংরাজ প্রথম আমাদের দেশে আসিল, আমাদের নারীদের অবস্থা—যে কোন কারণে হউক, যার আলোচনা করিয়া এখন কোন লাভ নাই—কতক বিষয়ে মন্দ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইংরাজ নারীদের তুলনায়, আমাদের নারীদের অবস্থা যে কতক বিষয়ে মন্দ, ইংরাজেরা বুঝিল এবং আমারাও বুঝিলাম। ঐ মনের ভাব লইয়া, অনুকরণের পালা আরম্ভ হইল। একবার কোন জাতিকে ভাল মনে করিয়া অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিলে, তাদের কোন্ রীতি-নীতি অনুকরণ করা উচিত, এবং কোন্গুলি অনুকরণ করা উচিত নয়, সে ক্ষমতা বড় থাকে না। একসময়ে আমাদের যুবকেরা অনুকরণের স্রোতে ভাসিয়া গিয়া, নূতন স্থাপিত ইংরাজী বিদ্যালয়ে পড়িয়া, মানসিক উন্নতির সঙ্গে, গোলদীঘির ধারে বসিয়া, মদ এবং নিষিদ্ধ মাংস খাইয়া, শারীরিক এবং নৈতিক উন্নতি করিতে চেষ্টা করিয়াছিল! নারীমহলেও, ধীরে ধীরে, কিন্তু নিশ্চিত-রূপে, অনুকরণের স্রোত বহিতে লাগিল। দোষ গুণের বিচার করিয়া, অনু-করণের ইচ্ছা বড় রহিল না, ইচ্ছা যোল আনা অনুকরণ করা, যাহা কিছু বাদ দেওয়া হইল, সমাজের চাপে পড়িয়া। একবার সমাজের মূল শিথিল হইলে, সম্পূর্ণ অনুকরণ যে জোরে চলিবে, সে সম্ভাবনা খুবই রহিল। আমাদের নিজেদের দোষে, এবং পাশ্চাত্য আদর্শের বাহ্যিক চাক-চিক্যের ফলে, সে সময় এখন আসিয়াছে, সমাজের মূল বেশ শিথিল হইয়াছে। জাতিভেদের জন্য, এবং ব্রাহ্মণ-প্রতিষ্ঠিত নিয়মের চুলমাত্র পরিবর্ত্তন প্রকাশ্যভাবে হওয়ার সম্ভাবনা না থাকার দরুণ, পুরাতন হিন্দু সমাজ টল্‌মল্ করিতেছে। এদিকে দেড় শত বছর ধরিয়া, নিজের মৌলিক চিন্তা একরূপ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া, এবং পাশ্চাত্য চিন্তারাশির প্রভাবের অধীনে থাকিয়া, পাশ্চাত্য আদর্শের একতরফা জয় চলিয়াছে। সংযমের কথা দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে, যদি কেহ তোলে, সে কেবল হাস্যাস্পদ হয়! অন্তরের লালসা, ভদ্র আবরণে ঢাকিয়া, অসংযমের পথে তৃপ্তিলাভ করিবার জন্য দেশের লোক ব্যগ্র! এই সপ্তাহের কাগজ হইতে একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি: দেশে লোক-সংখ্যার বৃদ্ধির কারণ দিয়া, জন্ম-নিরোধ প্রথা, দেশ জুড়িয়া বিস্তার করিবার জন্য, পুরুষেরা, এমন কি আলোকপ্রাপ্তা কতগুলি নারীও, চিৎকার আরম্ভ করিয়াছে। এক-ধারে গান্ধীজী এবং জনকয়েক খৃষ্টীয়ান প্রচারক, প্রতিকার স্বরূপ, সংযমের পথে

আসিবার জন্য উপদেশ দিয়া কেবল বিষম খাইতেছেন! বাকি থাকিল, শোভিয়েটের অনুকরণে, অল্প দিনের ভ্রূণ-নাশের এবং গর্ভবতী কুমারীকে যথাসময়ে খালাস করিবার হাঁসপাতাল স্থাপন! নিশ্চয়ই উন্নতিশীল লোকেরা, পালিস্ করা নির্দ্দোষ কারণ দেখাইয়া, এই দুটি অভাব শীঘ্র মোচন করিতে পারিবে!

অন্ধ অনুকরণের পথে চলিয়া আমরা কখন ভাবিয়া দেখি নাই, পাশ্চাত্য দেশে স্ত্রী-পুরুষ মিশ্রণের প্রথা, তাদের সমাজের গঠনের সহিত দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে। তাদের সামাজিক জীবন ঐ মিশ্রণের উপর গড়িয়া তোলা হইয়াছে। যেরূপ আমরা, অনেক কালের প্রথার অধীনে থাকিয়া সামাজিক জীবন কাটাইতেছি, মন্দ বুঝিলেও তাহা ত্যাগ করিতে পারিতেছি না, তারাও সেইরূপ মিশ্রণ প্রথার কুফল স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াও, তাহা তুলিয়া দিবার কথা ভাবিতে পারিতেছে না। ঐ প্রথা বজায় রাখিয়া, যতদূর সম্ভব তার কুফলের প্রতিকার করিতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু তাহা কেবল গোড়া কাটিয়া আগায় জল সিঞ্চনের ন্যায় বিফল হইতেছে। বিবাহের পূর্ব্বে, যে পুরুষ ভ্রমরের মত সমাজে উড়িয়া বেড়াইয়াছে, বিবাহের পর, তার স্ত্রীকে অন্য পুরুষের কুটিল দৃষ্টি হইতে রক্ষা করিতে গিয়া দেখে, পর্ব্বতের ন্যায় দুর্ভেদ্য প্রথা মাথা তুলিয়া তার গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে! যে প্রথার সাহায্যে সে লালসার আস্বাদ ভোগ করিয়া নিজের দিন কাটাইয়াছে, তার সাধ্য কি অপরের পথে কণ্টক হইয়া দাঁড়ায়? সে হতাশ হইয়া প্রথার আঘাতে অনেক সময়ে হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করিয়া, অবশেষে অবনত মস্তকে প্রথার দাবি পূরণ করে। অভ্যাস এরূপ জিনিষ, আমাদের দেশে, দ্বারের আড়ালে দিবারাত্রি কাটাইয়া, নারী যেরূপ সুখে দিন কাটাইতেছে বিশ্বাস করে, সেইরূপ পাশ্চাত্য দেশের বিবাহিত পুরুষ, চোখের উপরে নানাবিধ অভিনয় দেখিয়াও, বড় কিছু দোষের নয় মনে করিতে শিখে, এবং যথার্থই দোষ নাই, অবশেষে বিশ্বাস করে! শুধু তাই নয়, স্ত্রী-পুরুষরা অবাধে দিনগুলি কাটান, জীবনের একটা দাবি মনে করিতে শিখিয়াছে, যাহা হইতে বঞ্চিত হইতে হইলে মনে করে, জীবনটা নীরসভাবে কাটিল! বাহিরের পর্দ্দা বজায় রাখিয়া, যতদিন চলিতে পারে চলে, যদি না চলে, কারুর বরদাস্ত না হয়, সমাজ আইন পাশ করিয়া রাখিয়াছে, জঞ্জাল সাফ্ করা চলে। অধিক সভ্য দেশে চিৎকার উঠিয়াছে, পরিণয়চ্ছেদ আইনের কড়া নিয়মগুলি—যার সংখ্যা অবশ্য এখন খুবই কম—তুলিয়া দিবার সময়

আসিয়াছে। কেহ কিন্তু রোগের গোড়ার কথা আলোচনা করিতে চায় না, তাহা করিলে সমাজকে যে ওলট্-পালট্ করিয়া ফেলিতে হয়—যেরূপ আমাদের দেশে, জাতিভেদের নিয়ম, যদিও অন্তঃসারশূন্য হইয়াছে, তুলিয়া দিবার কথা কেহ ভাবিতে পারে না, কারণ তাহা হইলে সমাজকে যে ওলট্-পালট্ করিতে হয়।

মানুষের প্রকৃতি এরূপ, নিজের সবই, দোষটি পর্য্যন্ত, ভাল চোখে দেখে, এবং অপরের নিকট তার বড়াই করিতে ছাড়ে না। যদি তার রীতিগুলি কেহ অনুকরণ করে, তার আত্ম-তৃপ্তি হয়। যদি ক্ষমতা থাকে, বলে কিংবা কৌশলে, সাধারণের মধ্যে সেগুলির প্রচারের খুবই চেষ্টা করে। নিজের দলপুষ্টি হইলে, মানুষের খুবই আহ্লাদ হয়। পাশ্চাত্য দেশের লোকদের ধারণা, তাদের আচার ব্যবহার, ইত্যাদি, সবই ভাল; অন্যদেশের লোকদের মঙ্গল হইবে, যখন সেগুলি তারা অনুকরণ করিবে। তারা বিশ্বাস করিতে শিখে, তাদের যাহা কিছু আছে, অন্য দেশের লোকদের মধ্যে প্রচার করিতে পারিলে, পুণ্য সঞ্চয় করা হয়। সেজন্য আমাদের খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-প্রচারকদের ধাক্কা সামলাইতে হয়! এ তবু ভাল অঙ্গের কথা। প্রচলিত হিন্দু-ধর্ম্মের যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে—নিম্নশ্রেণীর লোকদের প্রতি উচ্চশ্রেণীর লোকদের ব্যবহার যেরূপ নিষ্ঠুর এবং অস্বাভাবিক—শীঘ্র যদি তার প্রতিকার করা না হয়, নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা, খৃষ্টীয়ান কিংবা মুসলমান হইয়া যদি মনুষ্যত্ব লাভ করে, আমি কখনই দুঃখিত হইব না। কিন্তু যখন দোষের প্রতি অন্ধ থাকিয়া, একধার হইতে নিজেদের রীতি-নীতির বড়াই করিয়া, আমাদের মধ্যে তার চলন নাই, সেজন্য আমাদের অবজ্ঞার চোখে দেখা হয়, তখন ধৈর্য্য থাকে না। যে দেশের লোকেরা, শতকরা নিরনব্বুই জন মদ্যপায়ী—যাদের দেশে, সমাজের সর্ব্বোচ্চ লোকের নিকট হইতে নিয়োগ পত্র পাইয়াছে বড়াই করিয়া, মদের ব্যবসায়ীরা অসংখ্য বিজ্ঞাপন দৈনিক দিয়া থাকে—যাদের দেশে, কিশোর বয়স হইতে কেশ পলিত হওয়া পর্য্যন্ত, অসংযমের দ্বার অবারিত, তাদের নিকট কিনা আমাদের নীতি শিক্ষা করিতে হইবে? তাদের দেশের বচন আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে যে, সভ্যলোকের লক্ষণ হইতেছে মদ্যপান করা, তবে সে মদ ভাল হওয়া যাই, যাহা কি তাদের দেশে প্রস্তুত হইয়া থাকে! আমাদের কিনা শিক্ষা করিতে হইবে, স্বাধীন এবং উন্নত জীবন কাটাইবার নিয়ম হইতেছে, রমণী-পুরুষের অবাধ মিশ্রণ!

ক্ষমতাশালী লোকদের অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করিবার শক্তি এরূপ অদ্ভুত, দিন দিন তাদের কথাগুলি কাণের নিকটে প্রতিধ্বনিত এবং আচরণগুলি চোখের সুমুখে অভীনিত হইলে, দুর্ব্বলচেতা চিন্তাশূন্য লোকেরা মনে করে, তারা যাহা বলিতেছে এবং করিতেছে, তাহা নিশ্চয়ই আদর্শস্থানীয়!

আমার একটি অধ্যাপক বন্ধু, অধ্যয়ন করিবার ছুটি পাইয়া, ইয়োরোপে গিয়াছিলেন। তিনি বর্ণনায় হিন্দু, সাধারণ হিন্দু সম্প্রদায় ভুক্ত নহেন, সেজন্য সুযোগ পাইলেই, সাধারণ হিন্দুদের প্রতি কটাক্ষ করিয়া কিছু বলিতে ছাড়েন না। অবশ্য কথাগুলি বেশ মার্জ্জিত করিয়া লইয়া বলেন, সভ্যসমাজভুক্ত বলিয়া যারা দাবি করে, তারা যেন আপত্তি করিতে না পারে। তিনি আমাকে একদিন তাঁর প্রবাসে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার কথা বলিতে লাগিলেন: দেখুন মশাই, সেখানে নারীরা পুরুষদের সঙ্গে এরূপ অসঙ্কোচে মেশে, এরূপ স্বাভাবিকভাবে তাদের সঙ্গে সময় কটায়, সুখ-দুঃখের কথা জিজ্ঞাসা করে, আমাদের—এই যাদের সুমুখে হঠাৎ একজন স্ত্রীলোক এলে জড়সড় হয়ে পড়া অভ্যাস, তাদের—তাতে খুব শিক্ষা হয়! বন্ধুটি আমার অপেক্ষা বয়সে কিছু ছোট, যখন কথাগুলি বেশ মিষ্টি-মিষ্টি করিয়া শুনাইলেন, তখন নারী-পুরুষের একসঙ্গে কাটাইয়া চিত্তপ্রসাদনের তত্ত্বটা, হোমিওপ্যাথি ঔষধের ক্রমের সাদৃশ্য দিয়া বুঝাইলাম। যেরূপ, ছয় হইতে এক হাজার ক্রমের ঔষধ, হোমিওপ্যাথিতে আছে, এবং অতি মৃদু হইতে অবশেষে খুব প্রখর ভাবে কাজ করিয়া থাকে, নারীর সঙ্গে সময় কাটাইয়া চিত্তপ্রসাদনের সেইরূপ ক্রমের বিভাগ আছে। নূতন আলাপে, দুইচারিটি কথার পর, আহ্লাদের মাত্রা ছয়ের ক্রমে থাকে; মাঝে মাঝে দেখা হইলে, ঈষৎ সম্ভ্রমযুক্ত হাসির সহিত কথোপকথনের দ্বারা, আনন্দ বারর ক্রমে উঠে; এক সঙ্গে বসিয়া, চা-পান এবং গানবাজনার পর, চিত্তপ্রসাদন ত্রিশ ক্রমে গিয়া দাঁড়ায়; পাশাপাশি বসিয়া বায়োস্কোপ কিংবা থিয়েটার দেখিলে, দুইশত ক্রমে; অবশেষে, আলাপ ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিলে, পুরুষের 'নারী-বন্ধু' এবং নারীর 'পুরুষ-বন্ধু' অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, চিত্তের প্রসাদন এক হাজার ক্রমে লাফাইয়া উঠে! যুবক হইতে পঁচাত্তর বয়সের বৃদ্ধও, এই ক্রম-নিয়মের অধীনে আসিতে বাধ্য, প্রভেদ এই, যুবকের বেলায়, ক্রম বাড়িয়া উঠিবার জন্য সর্ব্বদাই উন্মুখ হয়; পঁচাত্তর বয়সের বৃদ্ধের সময়ে, আনন্দ ছয় হইতে বার ক্রমের মধ্যে নাড়াচাড়া খাইয়া থাকে! যতই কেন নিরীহ ভদ্রকথার আবরণে ঢাকিয়া

এই মিশ্রণের বিষয় বর্ণনা করা হউক, এবং সভ্যতার লক্ষণ বলিয়া তার উপরে স্তুতিবাদ বর্ষণ করা হউক, ঐ ভাবে চিত্তপ্রসাদনের লালসা একবার হৃদয়ে স্থান পাইলে, তার মাদকতা হইতে পরিত্রাণ সহজে পাওয়া যায় না। পাশ্চাত্য দেশে, এই মিশ্রণের লালসা এরূপ আকার ধারণ করিয়াছে, যে বাড়িতে অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোক নাই, সে বাড়ির পার্টিতে লোকের সমাগম খুবই কম; যে হোটেলে, পানীয় বিক্রয় করিবার জন্য যুবতীকে নিযুক্ত করা না হয়, সে হোটেলে লোক জমে না; যুবতীর সঙ্গে নাচিবার জন্য পুরুষদের মধ্যে হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায়, অধিক বয়সের স্ত্রীলোকেরা নাচিবার সঙ্গী খুঁজিয়া পায় না; এমন কি, যে গির্জ্জায়, ভগবানের আরাধনার স্থানে, স্ত্রীলোক বেশি যায় না, সে গির্জ্জায় বসিবার অধিকাংশ স্থানগুলি খালি পড়িয়া থাকে!

সমাজের ছবি সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। সাহিত্যক্ষেত্রে, অত্যন্ত দুঃখের সহিত দেখিলাম, পাশ্চাত্য দেশের লালসার মোহে আচ্ছন্ন কতগুলি লেখক, সাহিত্যে নীতির স্থান ভুলিয়া গিয়া, বাস্তবের দোহাই দিয়া, দেশের খুবই অমঙ্গল সাধন করিতেছে। বায়ুর বীজ বপন করিলে, ঝড়ের ধাক্কা সামলাইতে হয়, দেখিলাম, দু'একজন প্রতিভাশালী লেখকের দ্বারা বায়ুর বীজ বপনের পর, বাঙ্গলা সাহিত্যে এখন ঝড়ের যুগ চলিয়াছে, এবং তার মধ্যে থাকিয়া, ছোট-বড়, নবীন-পুরাতন, তথাকথিত বাস্তববাদীর দলের লেখকরা, অট্টহাস্য করিতেছে! বাস্তববাদীই বটে! যেন একজন বিবাহিত স্ত্রীলোকের সঙ্গে অন্য এক পুরুষের আসক্তির কথা, কিংবা উচ্ছৃঙ্খল লালসার চিত্র ছাড়া, সমাজে পুরুষ-নারী সম্বন্ধে বাস্তব ঘটনা আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না! সমাজকে ঐ মন্দ লেখকদের প্রভাব হইতে রক্ষা না করিলে, অবস্থা ক্রমশ শোচনীয় হইয়া উঠিবে; অবসরকালে, মাতৃভাষার চর্চ্চা করিব স্থির করিয়া ভাবিলাম, আমার ক্ষীণ চেষ্টায়, যতদুর সম্ভব, ঐ প্রভাব ক্ষুণ্ণ করিবার জন্য লেখনী নিযুক্ত করিব। মানুষের প্রকৃতি আমি বেশ জানি, পারিপার্শ্বিক কারণে একবার সংযমের মূল শিথিল হইলে, পুনরায় তাকে সবল করিয়া তোলা সহজ নয়। কিন্তু মানুষের ভবিষ্যৎ মঙ্গলে আমার দৃঢ়বিশ্বাস, যথাসময়ে এবং ছোট-বড় চেষ্টার সংযোগে, যেরূপ মন্দ প্রভাব হউক না কেন, সমাজকে তার কবল হইতে নিশ্চয় উদ্ধার করিতে পারা যায়। এমনও হইতে পারে, যে কাজ আমি সূচনার অবস্থায় রাখিয়া যাইব, তাঁহা ক্ষমতাশালী সমাজ-হিতৈষী

লেখক এবং কর্ম্মীদের চেষ্টায় পূর্ণ সাফল্যে পরিণত হইবে। যে দেশ একসময়ে "বিদ্যাসুন্দরের" প্রভাব হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে, সে দেশ কি পাশ্চাত্য দেশের তৃতীয় শ্রেণীর গ্রন্থকারদের অনুকরণে লিখিত লালসায় সিক্ত উপন্যাসের প্রভাব কাটাইতে পারিবে না?

আমার উপন্যাস "দেবনাথ" ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছিলাম, এবং তাহা ১৯৩০ সালে প্রকাশিত হয়। আমাদের দেশের বিবাহের পরিণাম, এবং নূতন আম্‌দানি স্বাধীন পছন্দের ফল, দেবনাথ এবং দ্বিজেনের বিবাহের দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। আমার একজন বন্ধু 'দেবনাথ' পড়িয়া জিজ্ঞাসা করেন, দ্বিজেনের বিলাতি বিবাহের পরিণাম কি কোন সত্যঘটনা অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছি, কারণ, কিছুদিন আগে অবিকল ঐরূপ ঘটনা তাঁর পরিচিত একজন লোকের সংসারে ঘটিয়াছে? বলা বাহুল্য, আমি সে ঘটনার পাত্র-পাত্রীর কোন সংবাদ জানি না। দেবনাথের পিতা শিবনাথকে, আদর্শ হিন্দু গৃহস্থের কল্পনা করিয়া চিত্রিত করিয়াছি। একবারের অধিক বিবাহের আমি অত্যন্ত বিরোধী, পুরুষ কিংবা নারীর, তাই যুবক দেবনাথ, স্ত্রী এবং কন্যা বিয়োগের পর, আবার বিবাহ না করিয়া, জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য জীবন এবং অর্থ নিয়োগ করিয়াছে। দেবনাথের স্ত্রী সুরবালার ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। আমি অবতারবাদী নই, কিন্তু যাদের অবতারে বিশ্বাস, একশ্রেণী লোকদের মত, আমি তাদের ঘৃণা করি না। আমার ধারণা, ধর্ম্মবিশ্বাস যেরূপভাবে প্রথমে হৃদয়ে স্থান পাক, গোঁড়ামি বর্জ্জিত হইয়া উদারভাব ধারণ করিলে, সব ধর্ম্মের পরিণাম এক হয়। তাই তরুণী সুরবালার সরল বিশ্বাসের পাশে, সংসারত্যাগী শিবনাথ এবং পণ্ডিত মুরলী-ধরের তত্ত্বানুশীলন স্থান পাইয়াছে। দেবনাথ এবং অমিয়ের মধ্যে সম্বন্ধ, অনেকটা আদর্শ বন্ধুতার কল্পনা করিয়া বর্ণনা করিয়াছি। অমিয়কে আর্থিক সাহায্য করিবার দেবনাথের আগ্রহ, এবং দেবনাথের সাহায্য লইতে অমিয়ের অনিচ্ছা দেখাইয়া, স্বার্থবিযুক্ত করিয়া, বন্ধুতার স্বচ্ছদিক ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াছি। উপনিষদ্ বাক্যের প্রতি আমার শ্রদ্ধার পরিচয়, দেবনাথে যথেষ্ট আছে। বড় কথাগুলিকে আলাদা করিয়া একধারে রাখিবার নিয়ম করিলে, সেগুলি জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। আমাদের সুখ দুঃখের সহিত সেগুলির সম্বন্ধ কত ঘনিষ্ঠ, বুঝিতে পারিলে, তাহা জীবনের অভিন্ন অংশ করা যায়। গল্পাংশের কৌতূহল নষ্ট না করিয়া, আমার সব বইয়েতে, সুযোগমত, ঐ

কথাগুলি সন্নিবেশ করিয়াছি। যুগে যুগে রুচির পরিবর্ত্তন হইবে, সাংসারিক জীবনের কতগুলি দিক, কালের প্রভাবে ভাঙ্গিবে এবং নূতন ধরণে গড়িয়া উঠিবে, কিন্তু এরূপ কতগুলি স্থায়ী মনের ভাব আছে, যার বিনাশ নাই, সময়ের গুণে কেবল সেগুলি পূর্ণতা লাভ করে। উপন্যাস কিংবা যে কোন রচনায়, ঐ ভাবগুলি স্থান না পাইলে, তার জীবন যে ক্ষণস্থায়ী হয়, আমি কখন ভুলি নাই। খুব কম লেখকেরা তাহা স্মরণ রাখে।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে "লজ্জাদেবী" লিখিয়াছিলাম। "দেবনাথ" বাহির হইবার কয়েক মাস পরে, "লজ্জাদেবী" প্রকাশিত হয়। এই বই সম্বন্ধে আমার কৈফিয়ৎ দেওয়া খুব দরকার, কারণ লজ্জাদেবীকে আমি গৌড়ের রাণী করিয়াছি। আমি তিনটি ধারণার বশীভূত হইয়া 'লজ্জাদেবী' লিখিয়াছি; প্রথম ধারণাটি আমার খুব প্রিয়, অপরের বিবেচনায় যাহাই হউক; দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ধারণা, দেশের মঙ্গলের সহিত জড়িত। 'দেবনাথ' উপন্যাসে, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালবাসার চিত্র, দেবনাথ এবং অমিয় চরিত্রদ্বয়ের দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু নারীর প্রতি শরীরের সম্পর্ক-বিহীন স্বচ্ছ ভালবাসার একটি কল্পনা, বহুদিন হইতে আমার মনে স্থান পাইয়াছিল, যাহাকে মূর্ত্তি দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলাম। শরীর লাভের জন্য ভাল না বাসিয়া, কেবল ভালবাসিয়া সুখী হইবার কল্পনায় আমি মনে অত্যন্ত আনন্দ পাইয়া থাকি। 'কাশ্মীরে বাঙ্গালী যুবক' উপন্যাসে, মনের যে ভাব কতক পরিমাণে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, সে ভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা বরাবরই ছিল, লজ্জাদেবীতে অমরনাথের চরিত্র আঁকিয়া সে ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছি।

যতই বয়স হইতেছে, প্রচলিত সব ইতিহাসের উপর ততই অশ্রদ্ধা বাড়িতেছে। কেবল বাঙ্গলা দেশের কেন, ভারতবর্ষের কি কোন ইতিহাস আছে? আলেক্‌জান্দার্ বিশ্ব-বিজয়ী হইবার ইচ্ছা করিয়া হিন্দুস্থান আক্রমণ করিলেন, যত পারিলেন লুটিলেন, এবং নিজের খেয়ালমত হিন্দুস্থান সম্বন্ধে ধারণা করিয়া, ইয়োরোপে ফিরিয়া তার প্রচার করিতে চেষ্টা করিলেন। চীন দেশের পরিব্রাজক আসিলেন, তিনি নিজের ইচ্ছামত হিন্দুস্থান সম্বন্ধে ধারণা লিপিবদ্ধ করিলেন। মুসলমান নিজের ইচ্ছামত হিন্দুস্থানের ইতিহাস লিখিয়া সুখী হইয়াছে। ইংরাজও ঐ পথ অবলম্বন করিয়াছে। বাঙ্গালী হইয়া বাঙ্গালা দেশের অবস্থা চিন্তা করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতাম যে, গোণা

কয়েকটি লোক আসিয়া বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ করিল, এবং খিড়কীর দ্বার দিয়া দেশের রাজা পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইলেন! আমি কখনও ঐ বৃত্তান্ত বিশ্বাস করিতে পারি নাই। আমার ধারণা বদ্ধমূল, ইহা কেবল বাঙ্গালীকে অপরের চোখে হীন করিবার জন্য শত্রুপক্ষের কাল্পনিক বিবৃতি। বাঙ্গলা বিজয়ের পূর্ব্বে, বাঙ্গলা দেশের লোকদের সঙ্গে ছোট বড় কয়েকটা লড়াই যে হয় নাই, ইহা কখনই সম্ভব নয়। মুসলমান বাঙ্গলা দখল করিয়াছিল ইহা ত সত্য, কিন্তু ছেলের গালে চড় মারিয়া হাতের মোয়া কাড়িয়া লওয়ার মত, কয়েকটি সৈন্য রাজপ্রাসাদের এক দ্বার দিয়া ঢুকিল, এবং অন্য এক দ্বার দিয়া, রাজা গামছাখানি কাঁধে ফেলিয়া পীঠ্‌টান দিলেন, এই বৃত্তান্ত গ্রহণ করিতে অদ্ভুত বিশ্বাসের দরকার! তাই আমাদের জাতীয় জীবনকে অন্যায় কলঙ্ক হইতে মুক্ত করিবার জন্য, গৌড়াধিপতির সঙ্গে কুতব্‌উদ্দীনের একজন সেনাপতি আহামেদের যুদ্ধের কল্পনা করিয়া, গল্পে সন্নিবেশিত করিয়াছি। অবিকল ঐ ভাবে না হউক, গৌড় বিজয়ের পূর্ব্বে ঐরূপ দু-একটা লড়াই যে হয় নাই, জোর করিয়া বলিবার কাহারও সাধ্য নাই। গৌড়ের যে সময়ের ইতিহাস পাওয়া যায় না, ঐ সময় বাছিয়া লইয়া, আমি কয়েক বছরের জন্য লজ্জাদেবীকে গৌড়ের রাণী করিয়াছি। যদিও আমার বর্ণিত যুদ্ধে মুসলমানেরা হারিয়া গিয়াছে, তাদের শৌর্য্য এবং সম্মানের প্রতি উচিত দৃষ্টি রাখিয়া, তাদের চরিত্র কোন অংশে ক্ষুণ্ণ করি নাই। আমার উদ্দেশ্য নয়, অন্যায়ভাবে কাহাকেও লাঞ্ছিত করা, আমার সামান্য উদ্দেশ্য, বাঙ্গলা দেশের লোকেরা মেষপালের ন্যায় ভীরু, এই মিথ্যা অপবাদ মোচন করা। ইহাই হইতেছে আমার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বক্তব্য।

আমার তৃতীয় এবং শেষ উদ্দেশ্যও দেশের মঙ্গলের সহিত জড়িত। লালসাপূর্ণ রচনার দ্বারা যুবকদের নীতির ধারণা কলুষিত করিলে, জাতীয় জীবনের কতদূর ক্ষতি হয়, তাহা দেখাইবার জন্য, বীরেন্দ্রের অবতারণা করিয়াছি। দেশের রাণীর সাহায্যে ঐরূপ লেখককে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছি। স্বাধীন দেশে, অনেক সময়ে দেশের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, লেখকদের সাহায্য লওয়া হয়। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে, ইয়োরোপে ভীষণ যুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্বে, জার্ম্মান সন্তানদের চিন্তা নির্দ্দিষ্ট পথে লইয়া যাইবার জন্য, বিবিধ প্রকারের রচনার দ্বারা দেশ প্লাবিত করা হইয়াছিল। সোভিএট্ রুশিয়া, কিরূপ গ্রন্থ সাধারণ লোকদের পড়া উচিত, সেদিকে তীব্রদৃষ্টি

রাখিয়াছে, এবং যাহা দেশের কার্য্যনীতির বিরুদ্ধে যায়, তাহা প্রকাশ করিতে দেয় না। ইটালীতে মসোলনিও ঐ পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। দুর্নীতির প্রচারককে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া, আমি একেবারে অসম্ভব ব্যাপারকে সম্ভব করিতে চেষ্টা করি নাই।

নারীকে আমি কিরূপ ভাবে দেখি, তার পরিচয় লজ্জাদেবীতে যথেষ্ট দিয়াছি। পুরুষ-নারীর নির্ব্বিশেষ মিশ্রণের আমি বিরোধী, কিন্তু নারীকে পুরুষের অপেক্ষা হীনভাবে কল্পনা কখনই করিতে পারি নাই। তাই, রাজা বিজয়পালের ভ্রাতুষ্পুত্রকে রাজা না করিয়া, তাঁর কন্যা লজ্জাদেবীকে রাণী করিয়াছি। লজ্জাদেবী শাসনকর্ত্রী হইয়া, কোন অংশে পুরুষ অপেক্ষা কম দক্ষতার সহিত দেশ পরিচালন করেন নাই।

'লজ্জাদেবী' প্রকাশের কয়েক মাস পরে, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে, 'বাসবী' বাহির হয়। বাসবী হিন্দু-বিধবা। হিন্দু-বিধবা সম্বন্ধে, অন্য জাতির লোকদের ধারণা খুবই ভ্রান্ত। সে ভ্রান্তির প্রধান কারণ, আমাদের দেশের বাল্যবিবাহ প্রথা। সংযমপ্রধান হিন্দুস্থানে, বিপত্নীক হইবার পর পুরুষের, এবং বিধবা হইবার পর নারীর, সংযমের সহিত বাকি জীবন কাটান, কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। যে সব দেশের লোকেরা, যে কোন বয়সে, বিজোড় থাকিলে মনের অশান্তি ভোগ করে, তারা বৃদ্ধ বয়সে—মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বেও—পুনরায় বিবাহ করিয়া সুখী হয়। আমাদের দেশের চিন্তাশীল লোকদের ধারণা সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা, জীবনের অন্য সম্বন্ধের ন্যায়, বিবাহ সম্বন্ধকে, স্থায়ীভাবে কল্পনা করিয়া সুখী হইয়া থাকে। মানুষের পর মানুষ বদলাইয়া, মনের তৃপ্তি সাধন করিতে চেষ্টা না করিয়া, এক মানুষে মন-প্রাণ ঢালিয়া, দুর্ভাগ্যক্রমে তাকে হারাইলে, তার স্থানে তার স্মৃতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া, আমাদের দেশের লোকেরা সুখী হইতে চেষ্টা করে। শরীরের দাবিকে অন্যায়রূপে বাড়াইবার অভ্যাস না করিলে, ঐরূপ মনের ভাবের দ্বারা যে প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় এবং সুখের কল্পনাও খুব উচ্চে স্থাপন করা হয়, তার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সময়ে, দেশের এই উচ্চ আদর্শ, বাল্যবিবাহ প্রথার কলঙ্কে মলিন হইয়া উঠিল। যে নিয়ম পালন করিয়া মনে সুখসমৃদ্ধি জাত হয়, উচ্চ আদর্শ পালন করা হইতেছে ভাবিয়া লোক আনন্দে দিন কাটায়, সে নিয়ম বাল্য-বিধবার প্রতি প্রয়োগ করিয়া, পীড়নের এরূপ কটু দৃশ্য সমাজে প্রচলিত হইল, বৈধব্য-জীবনের ব্রহ্মচর্য্য, মর্য্যাদা, আত্মবিকাশের

অধিক সুযোগ, ইত্যাদি, বড় বড় কথা উপহাসের বিষয় হইয়া উঠিল, এবং বালবিধবার দুর্দ্দশা দেখিয়া লোকদের মাথা হেঁট হইতে লাগিল! আমি যেরূপ বিধবাবিবাহের বিরোধী, সেইরূপ বাল্যবিবাহেরও ঘোর বিরোধী। দুগ্ধপোষ্য বালিকার বিবাহ দিলে, পরে বিধবার বিবাহ দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তাহা আমি বাল-বিধবা তবিষাব বিবাহ দিয়া দেখাইয়াছি। কিন্তু হিন্দুর আদর্শে অনুপ্রাণিত, হিন্দু স্বামীর প্রেম সম্ভোগ করিয়া, বাসবী বিধবা হইয়া পুনবায় বিবাহ করিবার চিন্তাও করিতে পাবিল না, এবং মাধবী, বিধবা-বিবাহ প্রচারকদের পাল্লায় পডিয়া, বিবাহ করিয়া, আত্মঘাতিনী হইয়া সুখী হইল। আমার বিশ্বাস, সংযম হইতে যে সুখ পাওযা যায়, মানুষ তাহা উপলব্ধি করিতে পাবিলে, সকলেই সংযমেব পক্ষপাতী হইয়া উঠিবে। অধিকাংশ লোকেবা যেরূপ অশিক্ষিতভাবে এখনও দিন কাটাইতেছে, সাধাবণের মধ্যে উচ্চ আদর্শের প্রচার হইতে অনেক সময় লাগিবে। দুই চারি জন আদর্শ-জীবন কাটাইলে, সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধন হইল, মনে করা চলে না। জনকয়েক লোক, সৃষ্টির প্রথম হইতে, উচ্চভাবে জীবন কাটাইয়া আসিতেছে। যতদিন সকলে, একই উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সুখী হইতে না শিখিয়াছে, সৃষ্টির ক্রম-বিকাশ চলিবে। যতই দূব ভবিষ্যতে হউক, এক সময়ে, সকলে যে একই উচ্চ স্তবে উঠিবে, সে সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস অটল, যেরূপ আমার বিশ্বাস অটল, সৃষ্টিব মূলে এক অনির্ব্বচনীয় উচ্চ আদর্শের সত্তা রহিয়াছে।

বাসবীর দ্বিতীয় আলোচনার বিষয়, আধুনিক উচ্চ-শিক্ষিতা হিন্দুকুমারীদের অবস্থা। আরতি এবং অরুণা, দুইটি চরিত্রের দ্বারা, আমাদের কুমারী কন্যাদের শিক্ষার ফল কিরূপ দাঁডাইতেছে, তাহা দেখাইয়াছি। সাধাবণ লোকেরা, উদ্দেশ্য এবং তার সাধনের উপায়, উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধের ধারণা ভাল করিতে পারে না। তারা মনে করে, ভাল উদ্দেশ্য ধরিয়া কাজ করিলে যথেষ্ট হইল, তার সাধনের উপায়ের জন্য মাথা ঘামাইবার দরকার করে না, তাই প্রচলিত যে উপায় সম্মুখে পায়, তার আশ্রয় লইয়া থাকে; আমাদের কন্যাদের শিক্ষা সম্বন্ধে বিভ্রাট ঘটিয়াছে, কেবল উদ্দেশ্য সাধনের উচিত উপায়ের অভাবে। যারা মনে করে, কন্যাদের শিক্ষিতা করিবার প্রয়োজন আমরা প্রথম পাশ্চাত্য দেশের লোকদের নিকট শিখিয়াছি, তারা আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাসের কোন সংবাদ রাখে না। পুরাকালে আমাদের দেশে যেরূপ ধীশক্তি-সম্পন্না এবং উচ্চশিক্ষিতা নারী

ছিল, পাশ্চাত্য দেশে সেরূপ নারী জন্মিতে এখনও অনেক সময় লাগিবে। তবে, সাধারণভাবে নারীদের মধ্যে শিক্ষাব বিস্তার, জগতে অল্পদিন আরম্ভ হইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশেও, একশত বছর পূর্ব্বে, সাধারণ ভাবে কন্যাদের উচ্চ শিক্ষা দিবার বিষয় লোকেরা চিন্তা করিত না। স্বাধীন দেশে, কোন বিষয়ের আবশ্যকতা উপলব্ধির পর, তাহা কাজে পরিণত করিতে খুবই কম সময় লাগে, কিন্তু আমাদের হতভাগ্য পরাধীন দেশে, তার দশগুণ সময়ের প্রয়োজন। পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা অল্প সময়ের মধ্যে, নারীদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার এরূপ করিয়াছে, মনে হয় যেন নারী-শিক্ষার প্রথা তাদের মধ্যে বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। তাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে সব উপায় অবলম্বন করিয়াছে, সেগুলি তাদের সামাজিক জীবনের সঙ্গে বেশ খাপ খাইয়া রহিয়াছে, কারণ তারা নিজেদের ধরণে উপায়গুলি গড়িয়া তুলিয়াছে। সে উপায়গুলি সম্বন্ধে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। তাদের সমাজের দোষ-গুণ, তাদের অবলম্বিত উপায়গুলিতে প্রতিফলিত হইযাছে। কিন্তু, তাদের সমাজের সহিত আমাদের সমাজ, এবং তাদের আদর্শের সহিত আমাদের আদর্শের, অনেক প্রভেদ। আমাদের কন্যাদেব শিক্ষা দিবাব জন্য ব্যগ্র হইয়া, তাদের সহিত আমাদেব প্রভেদের কথা ভুলিয়া গিয়া, ঠিক তারা যে উপায়ের দ্বারা উদ্দেশ্য সাধন করিতে চেষ্টা করিতেছে, আমবা সেই উপায় অবলম্বন কবিতেছি।

আমাদের দেশে শিক্ষার কথা উঠিলে, নীতি এবং ধর্ম্ম-শিক্ষার কথা প্রথম উঠে। আগেকার দিনে, গুরুর গৃহে, শিষ্যকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া, অন্যান্য পাঠ্য বিষয়ের সহিত, ধর্ম্ম ও নীতির আলোচনা করিতে হইত। এখন শিক্ষার মধ্যে নীতি ও ধর্ম্মের স্থান নাই। সেজন্য আমাদের শিক্ষিত যুবকদের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে, অসংযম এবং উচ্ছৃঙ্খলতা বাড়িতেছে। যাহা পুরুষদের সম্বন্ধে ঘটিয়াছে, তাহা নারীদের শিক্ষা সম্বন্ধে ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে। আমরা ভুলিয়া যাইতেছি, নারীদের শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য, আত্মোন্নতি করিয়া আমাদের গৃহ অধিক উজ্জ্বল এবং পুত্র কন্যাদের যোগ্য করিয়া তোলা। নীতির দিক হইতে দেখিলে, আমাদের মেয়েদের যে ধরণে এখন শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, সে শিক্ষা বন্ধ করিলে কোন ক্ষতি ত নাই, বরঞ্চ ভাল হয়, গৃহস্থের সংসার অধিক উজ্জ্বল হয়। ঐরূপ শিক্ষার দ্বারা মেয়েদের নীতির অবনতি হইতেছে দুই কারণে : প্রথম কারণ, চরিত্র গঠনের

যে চেষ্টা আগে পিতৃগৃহে হইত, তাহা আর হয় না; দ্বিতীয় কারণ, অধিকাংশ স্কুলে, বিবিধ সম্প্রদায়ের মেয়েদের সঙ্গে মিশিয়া, নানাবিধ আদর্শের সঙ্ঘর্ষে, হিন্দুমেয়েদের ধারণা, কোমল বয়স হইতে, বিষম নাড়াচাড়া পাইতেছে। নিজেদের সামাজিক নিয়মের কারণ তলাইয়া বুঝিবার বুদ্ধি হইবার আগে, তারা সেগুলি ঘৃণা করিতে শিখে, এবং সেজন্য জীবনে অনেক সময়ে অশান্তি ভোগ করে। যে মেয়েদের শিবপূজা, এয়োসংক্রান্তি, অক্ষয় সিন্দুর, ইত্যাদি, অভ্যাস করিয়া, হিন্দুদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবার কথা, তারা বিদ্যালয় হইতে, বিধবা বিবাহ এমন কি মন্দ প্রথা, মন না মিলিলে কি স্বামীর ঘর করা চলে—তেমন বাড়াবাড়ি হইলে স্বামী ত্যাগ করা দরকার হয়—মেয়েদের দু'একজন পুরুষ-বন্ধু থাকা মন্দ নয়, ইত্যাদি, ধারণা লইয়া ফিরিয়া আসে!

আমাদের দেশের লোকেরা বরাবরই ঝোঁকের উপর সব কাজ করিয়া থাকে। আমাদের এখন মস্ত একটা ঝোঁক হইয়াছে, মেয়েদের গোটাকতক পাশ করান। এক সময়ে আমাদের ছেলেদের সম্বন্ধে ঐরূপ একটা ঝোঁক হইয়াছিল। তিনটা পাশ করা ছেলের পিতা তখন রাস্তা হাঁটিত খুব মাথা উঁচু করিয়া, ছেলের বিবাহের প্রস্তাবের সময়ে কথা কহিত খুব চিবাইয়া! এখন তিনটা পাশ করা গর্দ্দভের দল এত বাড়িয়াছে, এবং আধুনিক শিক্ষার মাহাত্ম্য এরূপ প্রচার হইয়াছে, গোটাকতক পাশ করা ছেলের বড়াই, সহরের গন্ধবণিক দোকানদার কিংবা পাড়াগাঁয়ের গরিব কৃষক ছাড়া, আর কেহ করে না। ছেলেদের শিক্ষার দুর্দ্দশা দেখিয়াও, আমরা মেয়েদের ঐ পথে লইয়া গিয়া কৃতার্থ হইতেছি। পার্কে, গঙ্গার ঘাটে, হরিসভার দালানে, এখন একটা পাশ করা—দুইটা কিংবা তার বেশি হইলে ত চরম হইয়া গেল—মেয়ের পিতা কিংবা ঠাকুরদাদা, তার বড়াই করিয়া শেষ করিতে পারে না। প্রথম যখন আমাদের ছেলেরা ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করে, তিনটা বাঙ্গালা কথার ভিতরে দুইটা ইংরাজী কথা ঢুকাইয়া যেরূপ অভিভাবকের বুক ফুলাইয়া তুলিত, আমাদের মেয়েরা এখন সেই পালা আরম্ভ করিয়াছে! আমাদের কাছে ইংরাজী ভাষার কি মাহাত্ম্য! সুন্দর বাঙ্গলায় ভাবটা যতই ভাল প্রকাশ করা হউক না কেন, যেমন-তেমন ইংরাজী বুক্‌নি দেওয়া কথার সুমুখে তাহা দাঁড়াইতে পারে না, এমনি আমাদের মনের গঠন হইয়াছে! আমাদের ধারণা হইয়াছে, ইংরাজী শিক্ষা না পাইলে, আমাদের শিক্ষাই

হইল না! আমার মাতা কেবল বাঙ্গালা পড়িতে এবং লিখিতে পারিতেন। যদি কেহ বলে, আমার মাতা শিক্ষিতা ছিলেন না, আমি তার ঘোর প্রতিবাদ করি। ভাষার সৃষ্টি ভাবপ্রকাশের জন্য, ভাষা ভাবের আজ্ঞাবাহী ভৃত্য। জগতে প্রথম শ্রেণীর ভাষা, কম করিয়া, একশত আছে। কোন ভাষার পক্ষে যদি বড়াই করিয়া বলা হয়, ভাব তার একচেটিয়া, তাহা বাতুলের প্রলাপ ছাড়া আর কিছু নয়। ধারণা, ভাবই আসল, যে ভাষায় প্রকাশ করা যায়, তাহা সাহায্যকারী মাত্র। তাহা যদি না হয়, ইংরাজী ভাষা জানে বলিয়া, ইংলণ্ডের একধার হইতে, কুলি, মুচি, ফেরিওয়ালা, ইত্যাদি, সকলকে আমাদের দেশের ইংরাজী ভাষা অনভিজ্ঞ শিক্ষিত লোকদের অপেক্ষা অধিক বিদ্বান ধরিয়া লইতে হয়! কেবল বাঙ্গলা জানিয়া আমার মাতা, ধারণায় এবং ভাবে, এত মহীয়সী ছিলেন, খুব কম ইংরাজ-মহিলা তাঁর সমকক্ষ হইতে পারে। যাহা আমার মাতার সম্বন্ধে বলা চলে, আমাদের ঘরে ঘরে ইংরাজী-অনভিজ্ঞ মহিলাদের সম্বন্ধেও তাহা বলা চলে। মনের ভাব, ধারণা, ইত্যাদি, ধরিয়া যদি বিচার করা যায়, বিজ্ঞান সম্বন্ধে কয়েকটি ধারণা বাদ দিলে, এখনকার ইংরাজী-শিক্ষিতা মেয়েদের, আমাদের ভালঘরের কেবল বাঙ্গলা জানা মেয়েদের সঙ্গে, তুলনাই করা যায় না। আমাদের আদর্শের তুলনায়, ইংরাজী-শিক্ষিতা মেয়েদের, উচ্চ ভাবের দারিদ্র্য যেরূপ, ভয়াবহ ভাবের প্রাচুর্য্যও সেইরূপ।

নারী-শিক্ষার জন্য, দেশের লোকদের চিন্তিত হইবার সময় আসিয়াছে। আমাদের কন্যাদের শিক্ষা, দেশের আদর্শ অবলম্বন করিয়া সম্পন্ন না হইলে, সামাজিক বিপ্লব হইতে বেশি সময় লাগিবে না। সমাজ সংস্কারকদের হাতে পড়িয়া,ঐ শিক্ষার গতি যেরূপ দিকে যাইতেছে, তাহা রোধ করা খুবই প্রয়োজন হইয়াছে। সহাধ্যাপনার বিষ ছড়াইলে, গার্হস্থ্য পবিত্রতা শীঘ্রই অদৃশ্য হইবে। যারা স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে, তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকের আমাদের আদর্শের সহিত আন্তরিক সহানুভূতি নাই। তারা মাঝে মাঝে, সীতা, দময়ন্তী, এবং ঐ শ্রেণীর দু'একজন ঐতিহাসিক নারীর কথা তুলিয়া লোকদের সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করে, কিন্তু তাদের আদর্শ, পাশ্চাত্য দেশের "নব-নারী"। আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য, সব কাজে আমরা সরকারের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করি। দেশের ধনী লোকেরা, অর্থ সাহায্যের দ্বারা সহানুভূতি প্রকাশ না করিলে, উদ্দেশ্য সাধন হইতে এখনও অনেক সময়

লাগিবে। এবিষয়ে কি তারা পাশ্চাত্য দেশের ধনী লোকদের অনুকরণ করিয়া দেশের মঙ্গল সাধন করিবে না ?

অরুণা এবং আরতির মত, কন্যাদের বিদেশী ধরণে শিক্ষা দিবার দৃষ্টান্ত যেরূপ বাড়িতেছে, তাদের পরেশের মত যুবক সঙ্গীদের দলও সেইরূপ বাড়িতেছে। দেশের নীতিজ্ঞান একেবারে অদৃশ্য হয় নাই, তাই অনন্তের মত যুবক এখনও যথেষ্ট আছে, যারা যুবতীদের সঙ্গে সময় কাটাইয়া মনে করে না, জীবন ধন্য হইল! কিন্তু স্রোতের টান যেরূপ বাড়িতেছে, অনন্তের সংখ্যা দিন দিন কমিয়া, পরেশের দল বাড়িয়া উঠিবে। পিতামাতাদের চক্ষু কি ফুটিবে না ? আমি তাদেরই বেশি দায়ী করিতে চাই। তারা ইচ্ছা করিলে, শিক্ষার ধরণ পরিবর্ত্তন করিতে পারে, কিন্তু একবার চাকার নীচে ফেলিয়া দিলে, ঘূর্ণ্যমান চাকা তার কাজ করিয়া চলিয়া যাইবে, জীবনের সুখ-শান্তি গুঁড়া হইয়া ব্যোমে মিশিয়া অদৃশ্য হইবে!

বাসবীতে কামিনী ও কাঞ্চনের কথা উত্থাপন করিয়াছি, যদিও নূতন হাওয়ার গুণে, বিষয়টা বকেয়ার দলে পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। রমণীর স্কন্ধে বহুকাল হইতে পৃথিবীর অনেক দোষ চাপান হইযাছে। পুরুষই লেখক কি না, সে নিজেকে বরাবর বড় করিয়া দোষ-শূন্য চোখে দেখিয়াছে! যত কিছু দোষ আছে, তার জন্য নারী ছাড়া আর কে দায়ী হইতে পারে ? সে-দিন নিশ্চয় আসিবে, যখন নারী বড় লেখিকা হইয়া, পুরুষের আসল চরিত্র বর্ণনা করিবে, এবং পুরুষকে জীবনের সুখের হন্তারক বলিয়া ঘৃণা করিতে শিখাইবে। তখন পুরুষের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইবে।

'পরিতাপ' প্রকাশিত হয় ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে, 'বাসবী' প্রকাশের কয়েক মাস পরে। বাসবীতে আধুনিক শিক্ষিতা কুমারীর চিত্র আছে, পরিতাপে আছে আধুনিক বিবাহিতা নারীর চিত্র। আমাদের গার্হস্থ্য জীবনের কিরূপ পরিবর্ত্তন হইতেছে দেখাইবার জন্য, আধুনিক চিত্রের পাশে অতীতের চিত্রও রাখিয়াছি। আমার উদ্দেশ্য নয় বলা, আগেকার সবই ভাল, এবং এখনকার সবই খারাপ। সেকালের গুণের সঙ্গে দোষের উল্লেখও করিয়াছি, যে দোষের ফলে, জ্যোৎস্নার মত আদর্শ নারীর অকালে মৃত্যু হইল। কেবল একটু বুঝিবার দোষে, মোটেই সহানুভূতির অভাবে নয়, সোনার কমল শুকাইয়া গেল। বিবাহের পর, এত নীরবে এবং সরল চিত্তে জীবনের পরিবর্ত্তন সে গ্রহণ করিয়াছিল, যদিও নিজে বুঝিতে

পারিয়াছিল, তার শরীর ভাঙ্গিতেছে কি জন্য, অন্য কেহ তাহা জানিতে পারিত না, যদি তার মৃত্যুর পর, তার গোপনে রক্ষিত রোজনামচা তার স্বামী প্রণব না পড়িত। ইহাই হইল হিন্দু নারীর প্রকৃত চিত্র, হৃষ্ট-চিত্তে নিজেকে বলি দিয়া সকলের সেবা করা। স্বার্থশূন্য কত কাহিনীর উপর প্রশংসা বর্ষণ করা হইয়াছে, কিন্তু হিন্দুব ঘরে নিত্য নিঃস্বার্থ-ভাবে নারী যে জীবন কাটাইতেছে, অন্য দেশের লোকেরা তাহা শুনে নাই, শুনিলেও ভাল বুঝিতে পারে নাই, কেবল পুরুষরা কি বর্ব্বর বলিয়া তারা সন্তুষ্ট হইয়াছে। আমরা যে এখনও বর্ব্বর আছি, তার কি কোন সন্দেহ আছে, গালি মাথায় পাতিয়া লইলাম, কিন্তু কই আমাদের দেবীদের কথা ত মোটে উঠে না!

জ্যোৎস্নার স্বামী প্রণব, পরিতপ্ত হৃদয়ে তার দুই কন্যা অম্বুজা এবং অম্বিকার জন্য, নূতন ধরণের স্বাস্থ্যকর বড বাড়ি প্রস্তুত করিল। মনে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছিল, তাই পুরাতন সবই বদলাইতে লাগিল। সকলের মনের অবস্থা ঐরূপ হইয়া থাকে। একটা বড় রকমের অন্যায় দেখিলে সকলে ধৈর্য্য হারায়, আগেকার সবই ভূমিসাৎ করিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু মনের ঐ ভাব সংযত করা দরকার। যাহা কিছু এখন আমাদের অমঙ্গলের কারণ হইয়াছে, ঐভাবে ধৈর্য্য হারানর জন্য। যেরূপ কোন অঙ্গের রোগ হইলে, তার চিকিৎসা করিতে হয়, সমস্ত দেহকে কেহ নষ্ট করে না, সেইরূপ অনিষ্টের কোন কারণ আছে বুঝিতে পারিলে, তার প্রতিবিধান করা উচিত, সমাজকে সমূলে বিনাশ করিতে উদ্যত হওয়া উচিত নয়।

জ্যোৎস্নাকে হারাইয়া শোকের আবেগে প্রণব তাহা বুঝিতে পারিল না, সে সবই নূতন করিয়া গড়িতে লাগিল। অম্বুজা এবং অম্বিকা আধুনিক ধরণে শিক্ষিত হইয়া, বিবাহের পর আধুনিক শিক্ষিতা নারীদের মত, সমাজে পুরুষদের সঙ্গে মিশিতে লাগিল। ধীরে ধীরে, অম্বুজা প্রফুল্লের ফাঁদে পা দিতে লাগিল, এবং যদি কুন্তলা সময়ে সাবধান করিয়া না দিত, তার সোনার সংসার ছারখারে যাইত। কত লোকের সুখের সংসার ঐরূপভাবে ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমি দেখাইয়াছি, নারীর পুরুষ-বন্ধু এবং পুরুষের নারী-বন্ধু সম্বন্ধ, অত্যন্ত অস্বাভাবিক কল্পনা। নারীকে কাঁসার বাসনের মত মাজিয়া শুদ্ধ করিয়া লইতে প্রস্তুত না হইলে, সমাজে ঐ সম্বন্ধ চালান যায় না। আমাদের দেশ কি অতটা অবনতির দিকে যাইতে প্রস্তুত?

কেবল পুরুষকে অনুকরণ করিয়া, রমণী স্বাধীন এবং উন্নত জীবন অনুসরণ করিতেছে মনে করিলে, পুত্রকন্যাদের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হয়, অম্বিকার দৃষ্টান্তের দ্বারা তাহা দেখাইয়াছি। ঐরূপ ফল পশ্চাত্য সামাজে এখন অনেক ঘরে দেখিতে পাওয়া যায়। নারী সভাসমিতি করিয়া মনে করিতেছে, দেশোদ্ধার করিতেছে—অর্থাৎ পুরুষদের মতের ক্ষীণ অনুকরণ করিয়া পুরুষদের মত উন্নত হইয়াছে ভাবিয়া মনে আনন্দ লাভ করিতেছে—এদিকে গৃহে পুত্র-কন্যারা, মাতার স্নেহ এবং পরিচালনের অভাবে, বেতনভোগী দাস-দাসীর নিকট থাকিয়া অস্বাভাবিক ভাবে জীবন কাটাইতেছে! শিক্ষিতা নারীর যত্নে পুত্র-কন্যারা বাড়িলে ভবিষ্যৎ সমাজের কল্যাণ সাধন হয়, নারী শিক্ষিতা হইয়া যদি তাহা বুঝিতে না পারে, শিক্ষার ফল হইয়াছে কখনই বলা যায় না। এ অবস্থার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী পুরুষেরা। তারাই ত বুদ্ধিহীনের মত রমণীদের ঐভাবে দিন কাটাইতে শিখাইয়া তাদের মাথা বিগড়াইয়া দিয়াছে। যতদিন না পুরুষেরা আবার রমণীদের বুঝাইবে যে, রমণী যতই কেন শিক্ষিতা হউক, গৃহক্ষেত্র তার প্রধান ক্ষেত্র, ততদিন পুরুষেরা তাদের দুষ্কৃতির ফল ভোগ করিবে। স্কুল কলেজের ছেলেদের মত রমণীদের রাজনীতিক ক্ষেত্রে টানিয়া আনিয়া যারা দেশের হিতসাধন হইতেছে মনে করে, তাদেরও চক্ষু ফুটিবার সময় হইয়াছে। ঐরূপ করিয়া পাশ্চাত্য দেশের ভ্রান্তির নকল করা হয়, মৌলিক চিন্তার পরিচয় দেওয়া হয় না। যে দেশের রাজনীতিক উন্নতি, পাঠ্যজীবনে আগুন ধরাইয়া জনকয়েক ছেলেদের, এবং গার্হস্থ্যজীবন ওলট্-পালট্ করিয়া জনকয়েক রমণীদের উপর নির্ভর করে, নিশ্চয়ই সে দেশের উন্নতি হইতে এখন বহু-কাল লাগিবে।

আমাদের দেশে যারা নারীর উন্নতি কামনা করে, বিবাহ বিচ্ছেদ আইনের জন্য ব্যগ্র না হইয়া, বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আইন করিবার যে ইঙ্গিত বিদ্যুৎ দিয়াছে, তাহা কাজে করিবার জন্য তারা কি মনে বল সঞ্চয় করিতে পারিবে? পাশ্চাত্য দেশের বিপত্তির কারণগুলি ঘরে ঢুকাইবার চেষ্টা হইতে বিরত হইয়া, কবে আমরা তাদের গুণগুলি অনুকরণ করিতে শিখিব?

কুন্তলা সম্বন্ধে কিছু না বলিলে, পরিতাপের পাত্র-পাত্রীদের কথা শেষ করা যায় না। কুন্তলা আমার অত্যন্ত অনুকম্পার পাত্রী। তার হতভাগ্য অবস্থার কারণ, প্রফুল্লের মত পিশাচের জন্য, সমাজ কলঙ্কিত হইতেছে। যিনি বলের ন্যায় দুর্ব্বলেরও আদি কারণ, সেই সৃষ্টির কর্ত্তাকে কুন্তলা মনের শান্তির

জন্য আহ্বান করিয়া, চিত্ত পরিশুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। আমার একজন উচ্চ-শিক্ষিত পাঠকের অভিমত, আমি কুন্তলাকে অবশেষে খুব বড় করিয়া তুলিয়াছি, যদি অন্যান্য পাঠকের মত হয়, তাহা হইলে আমার উদ্দেশ্য সাধন হইয়াছে।

'পরিতাপ' বাহির হইবার কয়েক মাস পরে, ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে, 'শ্রমিকের ছেলে' উপন্যাস প্রকাশিত হয়। উদার-মনা গান্ধীজীর সহানুভূতির স্পর্শে, অস্পর্শ্য জাতির লোকদের সম্বন্ধে আলোচনা পৃথিবী-ব্যাপী হইয়া উঠিয়াছে। তাদের নেতাদের হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিবার ইচ্ছা প্রকাশের পর, বিষয়ের গুরুত্ব খুবই বাড়িয়াছে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, উচিত পন্থা অবলম্বনের জন্য তারা ব্যগ্র নয়, কেবল গোঁড়া হিন্দুদের বিরুদ্ধে তাদের রাগের মাত্রা বাড়িয়া চলিয়াছে।

এদেশে ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের অভ্যুদয়ের দৃষ্টান্ত দিয়া আমি বিষয়টি আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। ইংরাজ এদেশে আসিবার পর, ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের সহিত দেশের লোকদের খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য বিপুল চেষ্টা হইয়াছিল। ইংরাজী-শিক্ষিত লোকেরা দেখিল, প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া তাদের তত্ত্বজ্ঞানের পিপাসা মিটিতেছে না। ঐ সময়ে, প্রচারকদের প্রচণ্ড উৎসাহের ফলে, বাঙ্গলার অনেকগুলি যোগ্য সন্তান খৃষ্টীয়ান ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। সমাজের ঐ অবস্থা দেখিয়া জনকয়েক চিন্তাশীল দেশ-হিতৈষী লোক, হিন্দুদের আদি এবং সর্ব্বোচ্চ জ্ঞানের ভাণ্ডার, উপনিষদের আলোচনা করিতে লাগিলেন। প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের সহিত তার প্রভেদ, এবং খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মের তুলনায় তার শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে পারিয়া, তাঁরা ঋষিদের পরিকল্পিত ধর্ম্মের অনুকরণে, ব্রাহ্মধর্ম্ম নাম দিয়া, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত থাকিয়া, একটি ধর্ম্ম প্রচার করিলেন। সেই সময় হইতে ইংরাজী উচ্চ-শিক্ষা প্রাপ্ত বাঙ্গালীদের মধ্যে খৃষ্টীয়ান হওয়া একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যারা ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী, তারা হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করে না, এবং আইনের চোখেও তারা হিন্দু গণ্য হইয়াছে। গোঁড়া হিন্দুদের নিকট তারা কিছুদিন নিগ্রহ ভোগ করিয়াছিল, কিন্তু তারা ভ্রূক্ষেপ করে নাই। ক্রমশ শিক্ষিত সাধারণের নিকট তারা সম্মানের পাত্র হইয়া উঠিয়াছে।

প্রভেদ কিছু থাকা সত্ত্বেও, অস্পর্শ্য লোকেদের অবস্থা অনেকটা সেইরূপ। যাঁরা ব্রাহ্মধর্ম্ম স্থাপন করেন, তাঁরা সকলেই উচ্চশিক্ষিত, কিন্তু অস্পর্শ্য জাতির অধিকাংশই লোকেরাই অশিক্ষিত। পূর্ব্বে, দেশে নানাবিধ রাজনীতিক দল

ছিল না, কিংবা এখনকার মত জন সাধারণের মধ্যে বিবাদ বাধাইয়া দিয়া দলপুষ্টি করিবার অভিপ্রায়, লোকদের মনে স্থান পায় নাই। উপস্থিত দ্বন্দ্বের প্রধান কারণ, ঐ দলপুষ্টি ব্যাপার লইয়া হইয়াছে, তা না হইলে বিষয়টি মোটেই জটিল নয়। ইংরাজ এখন দেশের রাজা, গোঁড়ামি করিয়া কেহ কাহারও অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না। গোঁড়া হিন্দুদের চোখে যদি অস্পর্শ্য জাতির লোকেরা বড় না হয়, তাতেই বা ক্ষতি কি? তারা জাতি-বিচার অগ্রাহ্য করিয়া, নিজেদের সম্মান বজায় রাখিয়া, ইচ্ছামত নিজেদের সমাজ গড়িয়া তুলিতে পারে, যেরূপ ব্রাহ্মরা করিয়াছিল, এবং ব্রাহ্মদের মত, হিন্দুধর্ম্মের সারটুকু গ্রহণ করিয়া, তাদের ধর্ম্ম-পিপাসা মিটাইতে পারে। কিন্তু তাদের তাহা করিবার ইচ্ছা নাই। তাদের স্বল্পসংখ্যক নেতারা অপরের হাতে ক্রীড়ার পুত্তলি হইয়া রহিয়াছে। তারা স্থিরচিত্তে মৌলিক হিন্দুধর্ম্মের সার-বত্তা বুঝিতে, কিংবা তাদের সমাজকে নূতন ভাবে গড়িয়া তুলিতে, ইচ্ছুক নয়। তারা চায় কেবল দলাদলি করিতে, গোঁড়া হিন্দুদের বিরুদ্ধে প্রতি-শোধ লইতে, এবং তাদের ক্ষুদ্রচেতা নেতারা চায়, অপরের উদ্দেশ্য সাধন করিয়া দিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধ করিতে!

আসল কথা যে তাই, দ্বন্দ্বের উপস্থিত প্রধান কারণ, মন্দির প্রবেশের বিষয় আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায়। গোঁড়া হিন্দুরা, তাদের মন্দিরে, অস্পর্শ্য জাতির লোকদের প্রবেশ করিতে দিতে চায় না। নাই বা দিলে? ব্রাহ্মরা ঘৃণা করিয়া হিন্দুদের মন্দিরে যাইতে চায় না, তারা নিজেদের আলাদা মন্দির করিয়া সেখানে উপাসনা করে। স্বচ্ছন্দে অস্পর্শ্য জাতির লোকেরা, তাদের ব্যবহারের জন্য শত শত মন্দির প্রস্তুত করিয়া, উপযুক্ত লোককে মন্দিরের পূজারি নিযুক্ত করিয়া পূজা চালাইতে পারে, যেরূপ ব্রাহ্মরা উপাসনা, বিবাহ, ইত্যাদি, তাদের সমাজের উপযুক্ত লোকের দ্বারা সম্পন্ন করিয়া থাকে। এখনও কি লোকের মনে সে ভ্রান্তি আছে যে, গলায় উপবীত ঝুলান লোক ছাড়া অন্য কেহ ধর্ম্মকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে না? আমি 'শ্রমিকের ছেলে'তে, উপস্থিত সমস্যার সহজ প্রতিকার নির্দ্দেশ করিয়াছি।

মাধবের মাতা গৌরী, তার নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর জন্য মনের কষ্টে দিন কাটাইতেছিল। লোকের মুখে শুনিল, মা দুর্গাকে বাড়িতে আনিলে, হারান লোক ফিরিয়া আসে। ধনী পুত্র তৎক্ষণাৎ মাতার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য, দুর্গাপূজার বিপুল আয়োজন করিল। ব্রাহ্মণদের সভায়, গ্রামের

একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত-ব্রাহ্মণ নিরঞ্জনের যুক্তিপূর্ণ আপত্তি সত্বেও স্থির হইল, কোন ব্রাহ্মণ নীচ জাতির বাড়িতে দুর্গাপূজা করিবে না। পাশাপাশি গ্রামের ব্রাহ্মণেরা গৌরীর বাড়িতে পূজা করিতে আসিবে না, বুঝিতে পারিয়া, নিরঞ্জন দূর স্থান হইতে ব্রাহ্মণ আনিবার জন্য লোক পাঠাইল। পূজার সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায়, ব্রাহ্মণেরা আসিল না। পথে যে ঐ ব্রাহ্মণদের গ্রামের লোকেরা আটকাইয়া রাখিয়াছিল, নিরঞ্জন বুঝিতে পারে নাই। পাঞ্জীর মতে পূজার শুভ সময় চলিয়া যায় দেখিয়া, উদার-চেতা যুগপরিবর্ত্তনকারী ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ নিরঞ্জন, নিজে পূজায় না বসিয়া বলিল, পূজার উদ্দেশ্য ঈশ্বরকে হৃদয়ে ধারণ করিবার চেষ্টা, সে চেষ্টা এতকাল পরের সাহায্যে লোকেরা করিয়া আসিয়াছে, পরের দ্বারা ভগবান লাভ হয় না, ভগবানের আরাধনা নিজেকে করিতে হয়, অতএব পূজা নিজেকে করিতে হইবে। তারপর, নিরঞ্জন, প্রতিমার নিকট আসিয়া, সমবেত অস্পর্শ্য জাতির লোকদের, এবং সকলের আগে গৌরীকে, পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজা করিতে বলিল।

জগতে বহুকাল হইতে যাজকের দ্বারা, ঈশ্বর-আরাধনা চলিয়া আসিয়াছে, কেবল হিন্দুদের মধ্যে নয়, যারা সভ্যতার বড়াই করে, তাদের মধ্যেও। উপদেশ দিবার লোক নির্ব্বাচন করা দরকার হয় বুঝিতে পারি, কিন্তু ঈশ্বরের নিকটে অগ্রসর হইবার জন্য, উকিল কিংবা মোক্তার নিযুক্ত করিবার প্রথা আর কতকাল চলিবে? ঈশ্বরকে উপাসনা করিবার কাজ—মূর্ত্তির সাহায্যে কিংবা যে প্রকারে হউক—প্রত্যেকের নিজের করা দরকার, এই উচিত মত গ্রহণ করিলে, যাজক-সম্প্রদায়ের আত্মম্ভরিতা কোথায় থাকে?

কতগুলি লোকের প্ররোচনায়, রাধানগরের অস্পর্শ্য জাতির লোকেরা, দল বাঁধিয়া রাধাবিনোদের মন্দিরে জোর করিয়া প্রবেশ করিবে, স্থির করিল। গোঁড়া হিন্দুরা তাদের বাধা দিবার জন্য সমবেত হইল। উভয় দলের মধ্যে এক দফা দাঙ্গা হইয়া গেল। এরূপ সময়ে মাধব নিরঞ্জনকে মন্দিরের সম্মুখে লইয়া আসিল। গুরুগম্ভীর স্বরে নিরঞ্জন, মন্দির প্রবেশাভিলাষী লোকদের জিজ্ঞাসা করিল, তাদের উদ্দেশ্য কি, তারা ধর্ম্মাচরণ করিতে চায় না দাঙ্গা করিতে চায়? তারা ধর্ম্মাচরণ করিতে চায় শুনিয়া নিরঞ্জন বলিল, ভগবানকে কেহ একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। তাঁর পক্ষ-পাতিত্ব নাই, কিংবা তাঁর পছন্দ করা গোটা কয়েক স্থান নাই; নিজেদের

মন্দিরে ভগবানকে উপাসনা করা বেশ চলে; ভেদজ্ঞানবিশিষ্ট লোকদের মন্দিরে না গিয়া নিজেদের মন্দিরে দেবার্চ্চনা করিলে ধর্ম্মাচরণের সঙ্গে আত্ম-সম্মান জ্ঞানও ফুটিয়া উঠিবে। নিরঞ্জনের কথা শুনিয়া, মন্দির প্রবেশাভিলাষী লোকদের জ্ঞানচক্ষু ফুটিল, দাঙ্গা থামিয়া গেল। কিছুদিনের পর, গ্রামে নূতন বৃহৎ মন্দির প্রস্তুত হইল। নিরঞ্জন ব্রাহ্মণ পূজারী নিযুক্ত করিতে নিষেধ করিল। মাধবের পিতা ফিরিয়া আসিয়াছিল, নিরঞ্জন তাকে মন্দিরের পূজারি করিতে বলিল। শতসহস্র অস্পর্শ্য জাতির লোকেরা নিজেদের মন্দিরের মধ্যে আসিয়া দেবমূর্ত্তি অর্চ্চনা করিতে লাগিল।

বিগত পূজার বন্ধে, মহালয়ার দিন, হঠাৎ ভাবপূর্ণ হৃদয়ে, বাঙ্গালায় একখানি তত্ত্ববিষযক নাটক লিখিবাব ইচ্ছা হইল। নাটকখানি ঐ দিন, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮, আরম্ভ করিয়া, পঁচিশ দিন পরে, ১৮ই অক্টোবরে, শেষ কবি। তার নাম দিয়াছি "সত্যপথ"। নাটকে, তত্ত্বালোচনার সঙ্গে, প্রচলিত "গুরু-গিরি"র অপব্যবহারের দিকটা ভালরূপ দেখান হইয়াছে।

বাঙ্গলা উপন্যাসের ভাষা সম্বন্ধে আমি নিজেই সন্তুষ্ট নই। "কাশ্মীরে বাঙ্গালী যুবক", আমার অল্প বয়সের প্রথম উপন্যাসের, এবং "লজ্জাদেবী"র অনেক অংশের ভাষা, সরল বাঙ্গালা ভাষা আমাব মতে যেরূপ হওয়া উচিত, ঠিক সেরূপ নয়। বাকি উপন্যাসগুলির ভাষা, উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাড়াতাড়ি লিখিতে গেলে যাহা হয়, ভাষার যত্ন সেরূপ লইতে পারি নাই। এই "আত্মজীবনী"র ভাষা, যতদূর সম্ভব আমার মনের মত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সংস্কৃত ভাঙ্গা বাঙ্গলা যেরূপ পছন্দ করি না, যে ভাষাকে আমি "হাফ্-প্যাণ্ট্" পরা ভাষা নাম দিয়াছি, তাহাও সেরূপ পছন্দ করি না। একদল লেখক, যাদের সংখ্যা খুব কম, কিন্তু খাতির কিছু বেশি, ভাষা সম্বন্ধে "একটা নূতন কিছু করা"র খুবই পক্ষপাতী, এবং বাঙ্গলাভাষাকে তারা 'গামছা' না পরাইয়া সন্তুষ্ট হইতে চায় না। কথা কওয়া এবং লিখার মধ্যে, সব দেশের ভাষায় তফাৎ আছে, এবং থাকা স্বাভাবিক; বিষয় এবং ভাবের অনুযায়ীও ভাষা হওয়া দরকার। যারা এ সব ভুলিয়া গিয়া, কেবল প্রবর্ত্তক হইবার লোভে, আমাদের মধুর ভাষাকে অবর ভাষায় পরিণত করিবার জন্য ব্যগ্র, তাদের প্রভাব তাদের জীবনের সঙ্গে লোপ পাইবে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দে, আমার জীবনের প্রধান আকাঙ্ক্ষা, উপনিষদ সম্বন্ধে গবেষণা, ইংরাজীতে লিখিতে আরম্ভ করি। পরের পরিচ্ছেদে, তত্ত্বানুসন্ধানের প্রসঙ্গে, তার আলোচনা করিয়াছি।

ইংরাজীতে, উপনিষদে দর্শনবাদ (The Philosophy of the Upanishads) বই ছাড়া, আরও তিনখানি বই লিখিয়াছি। একখানি সামাজিক বিষয় লইয়া, হিন্দুনারী সম্বন্ধে (The Daughter of Hindusthan), এবং অন্য দুইখানি, আইন বই।

উপনিষদের আলোচনা করিবার যেরূপ আকাঙ্ক্ষা ছিল, হিন্দুনারী সম্বন্ধে আমার বক্তব্য প্রকাশের জন্য সেইরূপ উৎসুক ছিলাম। যতই অভিজ্ঞতা বাড়িল, এবং অন্যদেশের নারীদের সঙ্গে হিন্দুনারীর তুলনা করিবার সুযোগ পাইলাম, মনেব ভাব প্রকাশ করিবার জন্য ততই ব্যগ্র হইলাম।

বই লিখিতে আমার বেশি সময় লাগে না। কোন উপন্যাস লিখিতে এক মাসের বেশি সময় লাগে নাই। উপনিষদ্ সম্বন্ধে গবেষণা-পূর্ণ বই, তিন মাসে লিখিয়াছিলাম; অবশ্য চিন্তার কাজ অনেক আগে শেষ করিয়াছিলাম। কেবল, ইংরাজীতে, হিন্দুনারী সম্বন্ধে বই, ডটার্ অফ্ হিন্দুস্থান্, এবং বাঙ্গলায় এই আত্মজীবনী লিখিবার সময়ে, আমার নিয়ম ভঙ্গ হইয়াছে। ডটার্ অফ্ হিন্দুস্থান্, ১৯২১ খৃষ্টাব্দে, কলিকাতায় আরম্ভ করি, খানিকটা লিখিয়া বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল; কটকে, ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে, সম্পূর্ণ করিয়াছিলাম। "আত্মজীবনী", কটকে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে লিখিতে আরম্ভ করি, কয়েক পৃষ্ঠা লিখিয়া বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল, কটকের অধ্যাপকের কাজ হইতে অবসর লইবার পর, কলিকাতায় আসিয়া শেষ করিয়াছি।

ডটার্ অফ্ হিন্দুস্থান্ সম্বন্ধে বেশ একটি বিভ্রাট ঘটিয়াছিল। প্রথমে ঐ বই বিলাতে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা হয়। সেজন্য, ম্যাক্‌মিলেন্ কোম্পানির কলিকাতার প্রতিনিধি পার্কহার্ষ্টের সঙ্গে দেখা করি। পার্কহার্ষ্ট ভদ্রতা পূর্ব্বক আমার টাইপ্ করা বই বিলাতে পাঠাইয়া দিলেন। তার কিছুদিন পূর্ব্বে, মিস্ মেওর্ "মদর্ অফ্ ইণ্ডিয়া" বই, যাহাতে তিনি খুবই কুরুচির পরিচয় দিয়া হিন্দু সমাজ এবং হিন্দু নারীর কুৎসা করিয়াছেন, বাহির হয়, কিন্তু আমি তাহা জানিতাম না। সে যাহা হউক, কয়েক সপ্তাহ পরে, পার্কহার্ষ্ট আমাকে জানাইলেন যে, কোম্পানি বিলাত হইতে দুঃখিত হইয়া জানাইয়াছেন, আমার বই প্রকাশ করিতে পারিবেন না। আমি বুঝিতে

পারিলাম, পাশ্চাত্য সমাজ এবং নারী সম্বন্ধে যেরূপ নির্ভীক ভাবে নিজের মত দিয়াছি, ইংরাজ প্রকাশক তাহা বরদাস্ত করিতে পারিলেন না। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় আসিয়া, দৈনিক "ফরওয়ার্ড্" কাগজের ছাপাখানায় বই ছাপিতে দিলাম। ছাপার কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, বই শীঘ্র বাহির হইবে, আমার প্রণীত বই বলিয়া বিজ্ঞাপন "ফরওয়ার্ড্" কাগজে দেওয়া হইয়াছে, দুই একখানা বইয়ের আগাম অর্ডারও পাইয়াছি, এরূপ সময়ে সংবাদ আসিল, আমি কটকে রাভেন্সা কলেজের আইন অধ্যাপকের কাজে নিযুক্ত হইব, স্থির হইয়াছে। তাহা শুনিয়া আমার বন্ধু, ইউনিভারসিটি ল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল্, ডক্টর্ এস্, সি, বাগ্‌চি বলিলেন, আমি যেরূপ ভাবে পাশ্চাত্য সমাজের আলোচনা করিয়াছি, শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তাদের কোপানলে পড়িয়া চাকরি না খোয়াইতে হয়! দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে তাঁর কথা শুনিয়া, আমার মনে খুবই আশঙ্কা জাত হইল। বইখানি আমার স্ত্রীকে উৎসর্গ করিয়াছিলাম, উৎসর্গের পৃষ্ঠা এবং আমার নামযুক্ত ভূমিকার প্রুফ্ তখন আসিয়াছে। প্রেসের তাগাদা চলিতেছিল, বই সম্বন্ধে অন্য কাহারও মত লইবার সময় কিংবা সুবিধা ছিল না। তাড়াতাড়ি বন্ধু যোগেশচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলাম, বই উপস্থিত তাঁর নামে বাহির হইবে, চাকরির শেষে আমি গ্রন্থকার, প্রকাশ করা হইবে। উৎসর্গের পৃষ্ঠা বাদ দেওয়া হইল, ভূমিকার নীচে আমার নাম কাটিয়া যোগেশচন্দ্রের নাম বসান হইল। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে বই বাহির হইল! বই প্রকাশের কয়েক মাস পরে, যোগেশচন্দ্র শঙ্কটাপন্ন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া কটকে আমাকে সংবাদ পাঠাইলেন, তাঁর শরীরের অবস্থা যেরূপ. বই সম্বন্ধে শীঘ্র একটা ব্যবস্থা করা দরকার। চাকরি থাকিতে আমি গ্রন্থকার প্রকাশ করা হইবে না যখন স্থির হইয়াছে, যোগেশচন্দ্র লিখিয়া দিলেন, গ্রন্থকার আমি, তিনি নহেন, যখন সুবিধা বুঝিব, আমার নাম দিয়া বাহির করিব। তাহা ছাড়া, আমার দ্বিতীয় পুত্র সুহৃৎরঞ্জনের স্বপক্ষে, যোগেশচন্দ্র একখানি উইল সম্পাদন করিয়া, বই সংক্রান্ত সমস্ত সত্ত্ব তাকে অর্পণ করিলেন। যোগেশচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ ১৭ই নভেম্বরে, আমার কটকে চাকরি পাইবার চারিমাস পরে। বই বাহির হইবার পর, কটক রাভেন্সা কলেজের অবসরপ্রাপ্ত ইংরাজির অধ্যাপক, আমার প্রবীণ বন্ধু, রায়বাহাদুর গোপালচন্দ্র গাঙ্গুলি বইখানি যত্নপূর্ব্বক পড়িয়া বলিলেন, নিজের নাম দিয়া প্রকাশ করা খুবই উচিত। কিছুদিন পূর্ব্বে, আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু, সুপরিচিত দার্শনিক এবং

কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্নি, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তও বইখানি পড়িয়া ঐ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

ডটার্ অফ্ হিন্দুস্থানে, হিন্দুনারী কি আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সমাজে দিন কাটাইতেছে, আমাদের বিবাহ-প্রথা, হিন্দু বিধবা, স্ত্রী-শিক্ষা, ইত্যাদি, বিষয়গুলি আলোচনা করা হইয়াছে। আমার উপন্যাস সম্বন্ধে বক্তব্য বলিবার সময়ে, ঐ সব প্রসঙ্গের অনেকগুলির আলোচনা সংক্ষেপে করিয়াছি, কেবল কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে এখানে কিছু বলিব।

পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা বড়াই করে, তাদের নারীরা বায়ুর মত স্বাধীন। যে সব কারণে নারীরা উন্নত, দাবি করা হয়, আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি, তাহাতে স্বাধীনতা কিছুমাত্র বাড়ে না, কেবল পুরুষের লালসা অধিক পরিমাণে চরিতার্থ হইয়া থাকে, আসলে নারী যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরে আছে। নারীর প্রকৃত জাগরণ হইলে যখন সে বুঝিতে পারিবে, পুরুষ তাকে কি ভাবে দেখিয়া আসিয়াছে, তখন সে পুরুষের ইঙ্গিতে লালসার পথে যাইতে ঘৃণা বোধ করিবে। যে পুরুষ কেবল নারীর যৌবনে তার নয়ন আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, সে নয়ন উৎপাটন করিয়া ফেলা উচিত, কারণ নয়ন তার উচিত কাজ করিতেছে না। নারীর মাতৃত্বই তার মহত্বের কারণ। যে দেশের লোকেরা কেবল নারীকে নায়িকার চোখে দেখে, সে দেশে নারীর মাতৃত্বের দাবি গ্রাহ্য করা হইয়াছে, বলিতে পারা যায় না। এই হতভাগ্য দেশে, নারীর মাতৃত্বের দাবি সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়া, আদি-শক্তিকে মাতৃরূপে লোকেরা আরাধনা করিয়া আসিতেছে। নারী যথার্থই স্বাধীন হইবে, পুরুষ যখন তাকে নায়িকার সাজে অধিক চিত্তাকর্ষক করিতে চেষ্টা না করিয়া, তার মাতৃত্বের গৌরব অনুভব করিতে শিখিবে। নারীর বক্ষে স্তন্যপান করিয়া পৃথিবীর মানব বাড়িতেছে, পুরুষ যখন উপলব্ধি করিবে, তখন নারীর উন্নতি দ্রুত হইবে।

ভালবাসার কথা তুলিয়া বলিয়াছি, বিশুদ্ধ ভালবাসা কেবল মাতার অন্তঃকরণ হইতে নিঃসৃত হইয়া থাকে। ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দাও, শরীরের সহিত জড়িত নারীর প্রতি পুরুষের ভালবাসার কথা। নির্ম্মল প্রস্রবণের মত ভালবাসা, কেবল মাতার হৃদয় হইতে নির্গত হইয়া জীবনকে শান্ত করিয়া থাকে। কবি কি সে ভালবাসার কল্পনা ভালরূপে করিতে পারিয়াছে, কিংবা উপন্যাস লেখক কি সে ভালবাসার কথা তার গল্পে ফুটাইতে চেষ্টা করে?

স্বাধীন পছন্দের বিবাহ সম্বন্ধে, মানব চরিত্রাভিজ্ঞ ইংলণ্ডের বিখ্যাত লেখক থ্যাকারের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি : মোটামুটি শরীরের আকর্ষণ লইয়া, কোন যুবতী যদি বুদ্ধি খাটাইয়া খেলিতে পারে, যে লোককে সে অভিলাষ করিবে, তাকে নিজের জালে ঠিক টানিয়া তুলিতে পারিবে ! স্বাধীন পছন্দের পরিণাম ত এই ! ইহার আবার বড়াই ! তার চলন আমাদের দেশে নাই, সেজন্য আমাদের অবজ্ঞার চোখে দেখা হয় ! তাহা আবার আমরা নকল করিবার জন্য ব্যগ্র ! বিজিত দেশের লোকের বরাত !!!

আমাদের সৌন্দর্য্যের জ্ঞান নাই, বিবাহের সময়ে আমরা মূর্খের মত পরের চোখে সৌন্দর্য্য দেখিয়া, পরের পছন্দ নিজের বলিয়া গ্রহণ করি—সৌন্দর্য্যের আলোচনা করিয়া, অবশেষে পাশ্চাত্য দেশের প্রসিদ্ধ কবির কথায় বলিয়াছি, যাহা ভাল, যাহা সত্য, যাহা চিরস্থায়ী, তাহাই সুন্দর ! সৌন্দর্য্য কোন বস্তুর গায়ে জড়ান নাই, সৌন্দর্য্যের স্থান অন্তরে, সদ্‌গুণের দ্বারাই সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায়। বিবাহে সৌন্দর্য্যজ্ঞান কেবল আমাদের দেশে প্রকাশ পাইয়া থাকে, পুরুষ সৌন্দর্য্যের পিপাসা গুণবতী ভার্য্যার দ্বারা এবং নারী সৌন্দর্য্যের পিপাসা জ্ঞানী পুরুষকে স্বামীরূপে পাইয়া মিটায়। আমাদের সৌন্দর্য্যের জ্ঞান নাই বলিয়া যারা উপহাস করে, তারাই উপহাসের পাত্র।

আমি বলিতে চাই না, আমাদের সবই গুণ, দোষ আদৌ নাই। গুণের ন্যায় দোষের দিকেও আমার দৃষ্টি সমানভাবে আছে। তবে যাহা দোষ আছে, সেগুলি সংশোধন করিতে বেশি সময় লাগিবে না, সহজে হইবে, কিন্তু গুণগুলি গুণ বলিয়া গ্রহণ করিয়া তার উৎকর্ষ সাধন না করিলে, আমাদের দশা শোচনীয় হইবে, বড়াই করিবার আসল কারণ অদৃশ্য হইবে।

আমার আইন বই দু'খানি, কটক রাভেন্সা কলেজের অধ্যাপক হইবার পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম। প্রথম বইয়ের নাম, গ্রাণ্টস্ ইন্ মেণ্টেনান্স্—খোরাক-পোষাক বিষয় সম্বন্ধে। ইহা ঐ আইনের কেবল টীকা নয় ; প্রথম পরিচ্ছেদে, আইনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গবেষণা আছে। আমাকে অনেকে লাভবান হইবার জন্য, আইন বইয়ের টীকা বাহির করিবার পরামর্শ দিয়াছে, আমি কিন্তু তাহা করিতে কখন সম্মত হইতে পারি নাই। আমি বরাবরই মৌলিক চিন্তা এবং গবেষণার পক্ষপাতী।

আমার এই আইন বই কেবল তিন জনকে, সার্ রাসবিহারী ঘোষ, জজ্

সার্ জন্ উড্রফ্, এবং জজ্ সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে উপহার দিয়াছিলাম, মতামত প্রকাশের জন্য নয়। আমি আমার কোন বই সম্বন্ধে ভাল অভিমত যোগাড় করিবার জন্য ব্যগ্র হই নাই, কারণ আমি বেশ জানি, ঠিক বুঝিয়া, ভাল মন্দ বিচার করিয়া, খুব কম লোক মতামত দিতে পারে এবং দিয়া থাকে। যাহাকে বাধিত করিবার ইচ্ছা থাকে, কিংবা যে দুই ছত্র ভাল মতের জন্য উমেদারি করে, প্রায় সেই সব স্থলে, দুই-চারিটা মিষ্ট কথা ছড়াইয়া দেওয়া হয়। ইহা হইল ভাল অভিমত দিবার তত্ত্ব। যার সঙ্গে মতের মিল নাই— যদিও বুঝিবার ভুল নিজের—কিংবা যাকে দাগিয়া দিবার অভিপ্রায় থাকে, কলমের আগাটা তখন ফোয়ারার মত ছুটিয়া চলে! একদিন আমি কলিকাতা হাইকোর্টের বারাণ্ডা দিয়া যাইতেছি, অপর দিক হইতে সার্ রাসবিহারী ঘোষ আসিতেছেন। আমাকে দেখিতে পাইয়া, কাছে আসিয়া, তাঁর সেই পরিচিত ধরণে, বাম হাতের তর্জ্জনী জোরে নাড়িয়া বলিলেন, "আমি তোমার বই পড়েচি, বেশ ভাল হয়েচে, একটু লিখে দেবো।" বুঝিতে পারিলাম, বইয়েতে বিলাতের প্রসিদ্ধ ব্যবহার-শাস্ত্রবিদ্ সার্ হেন্‌রি মেনের, হিন্দুদের আইন সম্বন্ধে কয়েকটি ধারণা অত্যন্ত ভুল, আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি, তাহা পড়িয়া রাসবিহারীর ভাল লাগিয়াছে। কয়েক মাস কাটিয়া গেল, বিষয়টি একরূপ ভুলিয়া গেলাম। একদিন, বন্ধু যোগেশচন্দ্রের সহিত কথা প্রসঙ্গে, বই সম্বন্ধে রাসবিহারীর মতের কথা তুলিলাম। আমি যে রাসবিহারীর সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁর লিখিত-মত আনি নাই, শুনিয়া তিনি খুব বিস্মিত হইয়া বলিলেন, রাসবিহারীর দুই ছত্র সুখ্যাতির জন্য কত লোক লালায়িত, আর তিনি নিজেই ভাল মত দিবেন বলিয়াছেন, আনিতে না যাওয়া খুবই অন্যায় হইয়াছে—বইগুলি বিক্রয় হয়, তাহা কি আমার ইচ্ছা নয়? বন্ধুর নিকট, বিষয় বুদ্ধি নাই, ভৎর্সনা খাইয়া রাসবিহারীর সঙ্গে একদিন লাইব্রেরিতে দেখা করিয়া, বন্ধুর পরামর্শ মত কাজ করা হইল মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। পরদিন দেখিলাম, রাসবিহারীর কেরানী রাম, বই সম্বন্ধে তাঁর মত লইয়া আমার বাড়িতে উপস্থিত।

আমার প্রণীত অন্য আইন বইয়ের নাম, স্টডিজ্ ইন্ জুরিস্‌প্রুডেন্স্ এণ্ড ইন্‌টার্‌ন্যাশেনাল্ ল (Studies in Jurisprudence and International Law)। বইখানি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত গবেষণায় পূর্ণ। পাশ্চাত্য দেশের আধুনিক ব্যবহারশাস্ত্রবিদ্‌দের ধারণা, সমষ্টিবাদের পোষকতা

করা আইনের মূল উদ্দেশ্য, আগেকার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ কল্পনা ঠিক নয়। আমি দেখাইয়াছি, ঐ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। যদিও ব্যক্তি মাত্রেই সামাজিক জীব, এবং সমাজের সাহায্যে তার ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণতা লাভ হয়, সমাজের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য কখনই লোপ পায় নাই। সামাজিক জীবন, ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যকে কেবল অধিক প্রস্ফুটিত করে। আইন, যতই কেন সমাজের সাধারণ মঙ্গল অক্ষত রাখিতে চেষ্টা করুক, কখনই ব্যক্তিত্বের দাবি অগ্রাহ্য করিতে পারে না। আমাদের ভারতবর্ষের আইন ব্যবসায়ীদেব অবস্থা বেশ জানি, আমার গবেষণার মর্ম্ম যে তারা গ্রহণ করিতে পারিবে, সে আশা খুব কম, সেজন্য বিলাতের কযেকজন শ্রেষ্ঠ ব্যবহারশ্রাস্ত্রবিদ্‌কে বই পাঠাইয়া, আমার গবেষণা সম্বন্ধে তাদের মতামত জানিতে ইচ্ছা করিলাম। ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব লর্ড চ্যান্‌সেলার্‌, লর্ড হ্যাল্‌ডেন্‌ এবং লর্ড বার্কেন্‌হেড্‌কে আমার বই পাঠাইলাম, এবং স্পষ্ট লিখিলাম, ইয়োরোপের ব্যবহার-শাস্ত্রবিদ্‌দের মতামত আমি গ্রহণ করিতে পারি নাই, সেজন্য আমার বক্তব্য সম্বন্ধে তাঁদের অভিমত জানিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছি। বার্কেন্‌হেড্‌ ভারতীয় সচীব ছিলেন, ভারতীয়দের সম্বন্ধে হয়ত তাঁর যেরূপ ধারণা ছিল, তাদের প্রণীত কোন বই পড়িয়া তাদের কৃতার্থ করা দরকার কবে না, এইরূপ বোধ হয় একটা কিছু ভাবিতেন, কারণ তাঁর নিকট হইতে বই পাওয়ার সংবাদও পাইলাম না। কিন্তু কিছুদিন পরে, বৃদ্ধ লর্ড হ্যাল্‌ডেনের নিজের হাতে লিখা চারি পৃষ্ঠার চিঠি পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত এবং প্রীত হইলাম। ইয়োরোপ এবং এমেরিকার বিখ্যাত ব্যবহারশাস্ত্রবিদ্‌দের সঙ্গে আমার তুলনা করিয়া, ভারতবর্ষে থাকিয়া আমি তাঁদের মত ব্যবস্থাবিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে গবেষণা করিতেছি দেখিয়া তিনি যে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন, এবং আমার অভিমত যে অতি সারবান এবং তিনিও তার পক্ষপাতী, হ্যাল্‌ডেন্‌ লিখিয়া জানাইয়াছিলেন।

ইংরাজী বইয়ের ভাষার জন্য, শিক্ষিত ইংরাজদের নিকট বরাবর সুখ্যাতি পাইয়াছি। দুঃখ হয়, বিদেশীয় ভাষা আয়ত্ব কবিবার জন্য যে যত্ন লইয়াছি, দীনা মাতৃভাষার চর্চ্চার জন্য যদি তার কিয়দংশ নিয়োগ করিতাম, আমার অর্ঘ্যের যৎকিঞ্চিৎ ফল নিশ্চয়ই হইত।

আমাদের দেশে, লেখকদের মত, পাঠকদের অবস্থাও শোচনীয়। চিন্তাপূর্ণ গদ্য বা পদ্য, কিংবা কথাসাহিত্যের ভাল বই, সকল প্রকার

গ্রন্থের প্রতি, আমাদের দেশের পাঠকদের মনের ভাব একই ধরণের। পাশ্চাত্য দেশে, দেখিতে দেখিতে যে সব গ্রন্থের, সংস্করণের পর সংস্করণ উঠিয়া যায়, তার সংবাদ এদেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোকেরা রাখে না। কোন ভাল গ্রন্থ কিংবা গল্পের বই, ছাত্ররা পড়িয়াছে কি না, যখনই অনুসন্ধান করিয়াছি, হতাশ হইয়া শুনিয়াছি, পড়ে নাই! তারা সংবাদ রাখে এবং পড়ে, দুই চারিখানা এরূপ ধরণের বই, যাহা পড়িয়া আত্মতৃপ্তির কারণ আছে, কোন সভ্য দেশের শিক্ষিত লোকেরা মনে করে না। গোটাকতক আজগুবি ঘটনার পর, নায়ক-নায়িকার মিলন, না হয় বেলেল্লা ধরণের পুরুষ-নারী সম্বন্ধে কতগুলি চিত্র, বইয়েতে পাইলেই সন্তুষ্ট হইয়া পড়িয়া শেষ করে, এবং লেখক সস্তার উপাধি পাইবার উপযুক্ত হইয়াছে, মনে করে! সেজন্য আমাদের দেশের পাঠকদের ভাল গ্রন্থ সম্বন্ধে কোন ধারণা নাই, এবং দৈবাৎ ঐরূপ বই হাতে পড়িলে, তাহা বর্দাস্ত হয় না। পাঠকদের সঙ্গে লেখকদের সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ। যে দেশে ভাল পাঠক নাই, সে দেশে তেমন ভাল লেখকও হয় না। তাই যারা লিখিয়া আমাদের দেশে লোকদের মনোরঞ্জন করিতে চেষ্টা করে, তাদের অধিকাংশ রচনা প্রাণ-শূন্য এবং বিকৃত। দেশের এরূপ অবস্থা চিরকাল থাকিবে না। যখন আমাদের শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হইবে আত্মোন্নতি, কেবল চাকরি লাভ নয়, তখন আমাদের সাহিত্যের অবস্থা স্বাধীন দেশের মত হইবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

তত্ত্বানুসন্ধান

(১) সংশয়-কাল

আমার বয়স তখন পাঁচ বছরের বেশি নয়। কিছুদিন আগে, আমার একটি ছোট ভাই, শ্রীশ, দুই বছর বয়সে মারা গিয়াছে। তার মৃত্যুর সময়ে, আমরা কটকে গঙ্গামন্দির পুকুরের দক্ষিণ-পাড়ে, পুরাতন আদালত গৃহের নিকট, একটি ভাড়াটে বাড়িতে ছিলাম। আমাদের কটকের বাড়ি তখন তৈয়ারি হইতেছিল। কাজ শেষ হইবার আগেই আমরা সে বাড়িতে আসিয়াছিলাম। যে বাড়িতে আমার ছোট ভাই মারা যায়, মা সেখানে থাকিতে ইচ্ছা করিলেন না, পিতা কোর্টে যাইতেন, দুপুরে আমি মার কাছে শুইতাম। মা শুইয়া আমার ছোট ভাইয়ের জন্য কাঁদিতেন। তাঁর চোখে জল দেখিয়া আমার কষ্ট হইত; পরে কান্নার কারণ বুঝিতে পারিয়া, ভয় হইতে লাগিল। মনে হইল, হয়ত আমিও একদিন আমার ছোট ভাইয়ের মত মরিয়া যাইব, তখন যাহা সব দেখিতেছি, আর দেখিতে পাইব না, কত না জানি কষ্ট হইবে! মার কাছে শুইয়া, ঐ সব কথা ভাবিয়া, আমার চোখে জল আসিত। যতক্ষণ তিনি শুইয়া থাকিতেন, মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারিতাম না, কিন্তু মা উঠিয়া গেলে, কষ্ট বাড়িত। একদিন তিনি উঠিয়া গিয়াছেন, হঠাৎ কোন দিন মরিয়া যাইব ভাবিয়া মনের কষ্ট এত বাড়িয়া উঠিল, উবুড় হইয়া শুইয়া খুব কাঁদিলাম। অনেকক্ষণ কাঁদিবার পর, মন শান্ত হইল, ভাবিলাম, ঈশ্বরের দয়া নিশ্চয়ই হইবে, আমাকে মারিবেন না! ইহাই আমার শৈশবের জীবন-মরণের প্রথম চিন্তা।

এই সঙ্গে আমার যৌবন কালের একটি ঘটনার বিষয় স্মরণ হইতেছে। আমার বয়স ত্রিশ হয় নাই। কয়েক বছর ওকালতি করিয়াছি। পুরীতে সমুদ্রের ধারে বেড়াইতেছি। সন্ধ্যা হইয়াছে। সৈকতের উপর একখানি বেঞ্চে দেখিলাম, গেরুয়া-বসন-পরা জটাজুটধারী দীর্ঘকায় একজন সন্ন্যাসী একাকী বসিয়া রহিয়াছেন। বয়স তাঁর ষাটের কাছাকাছি। সন্ন্যাসী দেখিলে তখন আমার মনে একটি শান্ত উদাস ভাব জাগিয়া উঠিত। সন্ন্যাসীদের সঙ্গে কথা

কহিয়া, তাদের মনের ভাব জানিবার কৌতূহল খুবই হইত। আমি সন্ন্যাসীর নিকট গিয়া বেঞ্চের একধারে বসিলাম, এবং ধীরে ধীরে তাঁর সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলাম। তিনি কাশীধাম হইতে আসিয়াছিলেন। পাঁজির গণনা-বিভ্রাট, তখন শিক্ষিত আচারী হিন্দুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, এবং তার সংশোধনেব চেষ্টা হইতেছে। সন্ন্যাসী পুবীর পণ্ডিতদের সঙ্গে ঐ বিষয়ের আলোচনা করিয়া, তাঁদেব মতামত জানিবার জন্য আসিয়াছিলেন। ক্রমশ সাধারণ বিষয় সম্বন্ধে কথা হইতে লাগিল। মানব জীবন এবং তার আকর্ষণের কথা উঠিল। আমি বলিলাম, জীবনের আকর্ষণ আমার সেরূপ নাই, মৃত্যুকে আলিঙ্গন কবিতে আমি সর্ব্বদা প্রস্তত। সন্ন্যাসী চমকিয়া উঠিয়া, স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, আমি খুবই অস্বাভাবিক কথা বলিতেছি, মানুষ ইচ্ছা করিয়া মরিতে চায় না, বাঁচিয়া থাকিবার কামনা সর্ব্বদা করে। আমি বলিলাম, জানি না জীবনকে অন্য সকলে কিভাবে দেখিয়া থাকে, আমার কিন্তু একঘেয়ে ঠেকিতেছে; দিনের পর দিন একই ভাবে, আহার, নিদ্রা এবং অন্য কয়েকটি কাজে নিযুক্ত থাকিয়া কাটিতেছে; ভবিষ্যৎ তমসাচ্ছন্ন, বুঝিবার ক্ষমতা নাই; সৃষ্টি সম্বন্ধে গভীর প্রশ্নগুলি, ঠিক যেন একটি অভেদ্য প্রাচীরের গায়ে আঘাত পাইয়া, কুণ্ঠিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া, হতাশ বাড়াইয়া দিতেছে; মনে হয় এ জীবনের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইলে, নূতন ক্ষমতা, নূতন আলোকের সাহায্যে, সৃষ্টিরহস্য ভেদ করিতে পারিবে; তাই মৃত্যুকে মঙ্গলের কারণ মনে করিয়া আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা হয়। আমি বিচলিত হইয়া শেষ কয়টি কথা বলিয়াছিলাম। সন্ন্যাসী তাঁর মতের স্বপক্ষে, আগের মত আরও কিছু বলিলেন। আমি আর বেশি প্রতিবাদ করিলাম না। আমার দৃষ্টি গগনস্পর্শী সমুদ্রতরঙ্গে নিবদ্ধ হইয়া, সৃষ্টি সম্বন্ধে অস্পষ্ট কল্পনাকে যেন রূপ দিতে চেষ্টা করিতেছিল।

বাল্যকাল যেরূপ সাধারণ হিন্দুর ঘরে কাটে, সেই ভাবে কাটিয়াছিল। আমার পূর্ব্বপুরুষেরা যে বহুকাল শাস্ত্র আলোচনা করিয়া জীবন কাটাইয়াছিলেন, তার কোন নিদর্শন বাড়িতে ছিল না। প্রতিদিন এক অধ্যায় ভাগবত পড়া হইত, অল্প শিক্ষিত একজন উড়িয়া ব্রাহ্মণ উড়িয়া ভাগবত পাঠ করিতেন। ঐ রীতি তখন উড়িষ্যার সব ভদ্রগৃহে প্রচলিত ছিল, তার অনুকরণ পিতা করিয়াছিলেন। কেহ মন দিয়া ঐ পাঠ শুনিত, মনে হয় না। পিতা উড়িয়া ভাল বুঝিতেন, লিখিতে ও পড়িতে পারিতেন, মা কিন্তু উড়িয়া ভাল বুঝিতে

পারিতেন না। ভাগবত পাঠ করা হইত, পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য। যে ঘরে ভাগবত পড়া হইত, তাকে আমরা ভাগবত-ঘর বলিতাম।

পূজার সময় নিকট হইয়া আসিলে, বাড়িতে চণ্ডীপাঠ হইত। চণ্ডীপাঠ করিতেন, শিবনাথ নামে একজন স্থানীয় বিদ্বান বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ। তিনি কাশী এবং নবদ্বীপে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। চণ্ডীপাঠও হইত পুণ্য সঞ্চয় এবং দৈব দুর্ঘটনা নিবারণের জন্য। কটকে বর্ষাকালে ওলাউঠা দেখা দিত, তখন সহরের ঘরে ঘরে ভাগবত এবং চণ্ডীপাঠের ধূম পড়িত।

পিতার ধর্ম্মবিশ্বাস আমি ভাল জানিতে পারি নাই, তিনি ক্বচিৎ আমার সঙ্গে ধর্ম্মপ্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেন। মাতা, কালী এবং কৃষ্ণকে, সমানভাবে ভক্তি প্রদর্শন করিতেন। অনেক সময়ে কালীবাড়িতে, শনি ও মঙ্গলবারে, পূজা পাঠাইয়া দিতেন এবং বাড়িতে তুলসীমঞ্চ ছিল, তার তলায় মাঝে মাঝে হরিলুঠ দেওয়া হইত। বড় রকমের পূজা পাঠান কিংবা হরিলুঠ হইত মানস করিয়া, অসুখ সারিলে কিংবা কোন ইচ্ছা পূর্ণ হইলে। গোঁড়া শাক্ত কিংবা গোঁড়া বৈষ্ণব, পিতা কিংবা মাতা, দুজনের কেহই ছিলেন না। আমার সাত বছর বয়সে, একবার বাড়ির সকলে, গরুর গাড়ি করিয়া, কটক হইতে পুরী গিয়াছিলেন। পঁচিশ ক্রোশ পথ, যাইতে দুই দিন লাগিয়াছিল। আমাকে সঙ্গে লইয়া পিতা মন্দিরে জগন্নাথদেব দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। আমি তাঁর পাশে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া জগন্নাথ ঠাকুর দেখিয়াছিলাম। সমস্তক্ষণ আমার দৃষ্টি জগন্নাথের মাথার বড় হীরকখণ্ডের উপর ছিল!

ছেলেবেলায় কালীকে রীতিমত ভয় করিতাম, কৃষ্ণকে ভালবাসিতে ইচ্ছা করিত। কালীকে অবজ্ঞার চোখে দেখিবার সাহস আমার ছিল না, কারণ তাঁর অসংখ্য অনুচরদের উপদ্রবের গল্প শুনিতাম, যাদের মধ্যে জনকয়েক ওলাউঠা বিস্তারের ভার লইয়া থাকে! কালীর মন্দিরে মাঝে মাঝে যাইতাম, নিজের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে আশা করিয়া। কালীঘাটের মন্দিরে, সাধুরা বসিয়া পাঠ করিতেছেন, দেখিতে বেশ ভাল লাগিত, কিন্তু ঐ বলির সময়ে আমার মন ছটফট করিত, রুধিরের স্রোত দেখিলে শরীর শিহরিয়া উঠিত। বলির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার ভিতর প্রবেশ করিবার সূক্ষ্ম বুদ্ধি তখন আমার হয় নাই! কটকে বাড়ির কাছে, দীননাথ সরকারের বাড়িতে, রাধাবিনোদ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; মাঝে মাঝে নবদ্বীপ এবং বৃন্দাবন হইতে বাবাজীরা আসিয়া সন্ধ্যা-আরতির সময় সঙ্কীর্ত্তন করিতেন, আমি তাঁদের সঙ্গে মন্দিরা

লইয়া যোগ দিতাম, বেশ ভাল লাগিত। রক্তপাত দৃশ্যের পরিবর্ত্তে ফুলের সুগন্ধ, আমার খুব ভাল লাগিত। বাঁশী হাতে বাঁকা হইয়া দাঁড়ান কৃষ্ণের মূর্ত্তি, ছেলেবেলায় দেখিতে ভালবাসিতাম, তবে তাঁর পাশে একজন স্ত্রীলোক রাধার প্রয়োজন, বুঝিতে পারিতাম না। ধরিয়া লইতাম, কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী আছেন, দু'জনকেই পূজা করা দরকার।

বেশি বয়সে, আলোচনা করিয়া বুঝিবার ক্ষমতা হইবার পর, শিক্ষা এবং চেষ্টার দ্বারা মনকে অধিক উন্নত এবং বুদ্ধিকে প্রখর করিবার বড়াই, ত্যাগ করিয়াছি। বেশ বুঝিয়াছি, বীজের অনুরূপ গাছ হইয়া থাকে, যে সত্তা নিজের ভিতরে থাকে, শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিক কারণের সাহায্যে, তাহাই সময়ে বিকশিত হইয়া উঠে। নতুবা বুঝিতে পারি না, দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর ছেলে প্রহ্লাদ কিরূপে বিষ্ণুভক্ত হইলেন, তাহা আবার বাল্যকাল হইতে! তা না হইলে বুঝা শক্ত হইয়া পড়ে, রত্নাকর দস্যু, কিরূপে বাল্মিকী ঋষিতে পরিণত হইলেন। কত লোক দস্যুবৃত্তি করিয়া থাকে, কাজ যে ভাল করিতেছে, কখনই মনে করে না, উপদেশের অভাবও বড় হয় না, কিন্তু কেবল রত্নাকরের সময়ে উপদেশের ফল ঐরূপ অদ্ভুত ভাল হইল কি করিয়া? একটি ছেলে স্বল্পভাষী আর একটি ছেলে বাচাল, উভয়ে খুব শিক্ষিত হউক এবং বাজে বকা অত্যন্ত খারাপ যতই ভাল বুঝুক, যে স্বল্পভাষী সে অল্পকথা কহিয়া দিন কাটাইবে, এবং যে বাচাল সে বেশি কথা কওয়ার লোভ কখনই সংবরণ করিতে পারিবে না। একই নীতি শিক্ষকের নিকট দুইজন বালক নীতি-শিক্ষা করিয়া, সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারে জীবন কাটায়। এখন বেশ বুঝিয়াছি, বুদ্ধির বড়াই করা যেরূপ বুঝিবার ভুল, অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন লোককে ঘৃণা করাও সেইরূপ বিবেচনার ভুল।

আমার মনের গতি আলোচনা করিয়া বিস্মিত হই, কি করিয়া তাহা সময়ে ঐরূপ হইল। যাদের সঙ্গে মিশিয়া দিন কাটাইতাম, তাদের নৈতিক অবস্থা আমার অপেক্ষা খারাপ ছাড়া ভাল ছিল না, বাড়িতে পিতামাতার উপদেশের সাহায্য কখনও পাই নাই, অথচ ষোল বছর বয়সে দেখিলাম, আমার চিন্তার ধরণ দ্রুত পরিবর্ত্তন হইতেছে। কেবল লোকের মত শুনিয়া তাহা গ্রহণ করিতাম না, যতক্ষণ বিষয়ের ভালমন্দ দিকের ধারণা নিজে করিতে না পারিয়াছি। ঈশ্বর, মানুষের সহিত তাঁর সম্বন্ধ, স্বর্গ, নরক, ইত্যাদি, সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা আমাকে তৃপ্ত করিতে পারিল না। সঙ্গীদের উপহাসের ভয়ে,

তাদের নিকট মনের ভাব প্রকাশ করিতাম না, একাকী বসিয়া অনেক সময়ে চিন্তা করিতাম, কিন্তু ভাল বুঝিতে পারিতাম না। কোন কাজের কারণ বুঝিতে না পারিলে, তাহা করিতে ইচ্ছা হইত না। যখন কোন পরীক্ষা দিতে যাইতাম, মা বলিতেন, ভাগবত ঘরে প্রণাম করিয়া যাও। খুব গোলে পড়িতাম। ভাগবত পুঁথিকে—আমাদের বাড়িতে তখন কোন বিগ্রহ ছিল না—কিংবা তাতে অধিষ্ঠিত যে কোন ছোট-বড় দেবতা থাকুন, তাঁকে পরীক্ষা দিবার আগে প্রণাম করিয়া সন্তুষ্ট করিবার প্রয়োজন বুঝিতে পারিতাম না। সামান্য কারণে মাতার অবাধ্য হইতে ইচ্ছা করিতাম না, ভাগবত ঘরে গিয়া কোন চিন্তা না করিয়া, কেবল মাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য, মাথা নুয়াইয়া আসিতাম।

ঈশ্বর সম্বন্ধে ভাল ধারণা করিতে পারিতাম না, তাঁর অবতারে বিশ্বাস হইবে কি করিয়া? ঈশ্বরই যদি সর্ব্ব-শক্তিমান হন এবং সৃষ্টির উপর তাঁর সম্পূর্ণ অধিকার থাকে, তিনি ইচ্ছা করিলেই কাজ হইয়া যাইবে, মানুষ, পশু, নানাবিধ রূপ ধরিয়া, আমাদের মধ্যে আসিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবার কি দরকার? যতই ভাবিতে লাগিলাম, দেখিলাম প্রচলিত ঠাকুর দেবতার কল্পনাগুলি ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ করিয়া আনে, মূল বস্তু সম্বন্ধে ধারণা পরিস্ফুট হইতে দেয় না। অল্প বয়সে দু'টি প্রসিদ্ধ ঠাকুরের স্থানে যাইবার সুবিধা ছিল, পুরীতে জগন্নাথ দেবের মন্দিরে, এবং কালীঘাটে কালীর মন্দিরে। মন্দিরের মধ্যে যাইতে খুব ভালবাসিতাম; পারমার্থিক কাজে, অনেক লোকের মিলিত উৎসাহ দেখিতে আমার খুব ভাল লাগে। মুখের ভাব দেখিয়া তাদের মনের ভাব অনুমান করিতে চেষ্টা করিতাম। কিন্তু মন্দিরের মধ্যে মূর্ত্তির নিকট গেলে, মনের সমস্ত ভাব জড়সড় হইয়া আসিত, প্রশস্ত ভাব সঙ্কুচিত হইত, মূল বস্তুর ধারণা মূর্ত্তির সাহায্য করিতে পারিতাম না। নিস্তব্ধভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া, প্রণাম না করিয়া চলিয়া আসিতাম। কেহ ঠাকুরের অর্ঘ্য, ফুল বা তুলসী, দিলে, হাত পাতিয়া লইতাম। কখন কিছু পয়সা দিতাম। আমার একজন বন্ধু, যার পুরীর বাড়িতে অসংখ্যবার ছিলাম, সে আমাকে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া, একদিন মন্দিরের বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমি জগন্নাথ দেবকে প্রণাম করি না কেন? আমি কথাটা ঘুরাইয়া দিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সে ছাড়িল না। তখন তাকে বলিতে বাধ্য হইলাম, মূর্ত্তি দেখিয়া তাদের মনে যেরূপ ভাবের উদয় হয়, আমার সেরূপ হয় না। আমার

বন্ধু, তার চোখ কপালে তুলিয়া বলিল, আমি প্রণাম না করিয়া চলিয়া আসি, আমার ভয় করে না ? বুঝিতে পারিলাম, ঈশ্বরের কল্পনার মধ্যে ভয় অনেকটা স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে। নানাবিধ অমঙ্গল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, সকলেই ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া থাকে। আমি বন্ধুকে আর কোন কথা বলিলাম না।

ভয় ছাড়া দেখিলাম, আর একটি কারণ লোকদের মনে ঈশ্বরের কল্পনা জাগাইয়া রাখিয়াছে। অভাব মানুষকে সর্ব্বদা পীডন করে, ছোট-বড় অভাব মানুষের সর্ব্বদা আছে ; ঈশ্বরকে সর্ব্বশক্তিমান রূপে কল্পনা করিয়া, মানুষ অভাব মোচনের জন্য সর্ব্বদা তাঁর আরাধনা করে। বিপত্তি হইতে মুক্ত হইবার মত, অভাব মোচনের জন্য, ঈশ্বরকে আরাধনা করা, আমার প্রথম হইতে ভাল লাগিত না। চিত্তকে বিশুদ্ধ করিয়া যদি চরম কল্পনা করা উচিত, স্বার্থবিজড়িত আবাধনার মূল্য কি ? ক্রমশ দেখিলাম, প্রচলিত সব ধারণাই ঈশ্বরের কল্পনার বিরোধী হইয়া দাঁড়াইতেছে।

দিবারাত্রি ভাবিতাম। কেহ আমার অন্তরের কথা জানিত না, কারণ মনের মধ্যে সর্ব্বদা যে সব সমস্যা উঠিত এবং যার মীমাংসা করিতে না পাবিয়া মনে অত্যন্ত কষ্ট পাইতাম, কাহাকেও বলিতে ইচ্ছা করিত না। বলিয়াই বা কি হইবে ? চিন্তা করিয়া মূল বস্তু সম্বন্ধে উচিত কল্পনা করিবার আগ্রহ, আমার পরিচিত কাহারও ছিল না। একবার ভাবিয়াছিলাম, গৃহ ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইলে বোধ হয় আমার সব সন্দেহ ভঞ্জন হইবে, মনে শান্তি পাইব। তখন মনে হইত, মূল বস্তু সম্বন্ধে যাহা কিছু ভাল ধারণা, সন্ন্যাসীরাই করিতে পারে। সন্ন্যাসী হইবার ইচ্ছা কিছুদিন খুবই প্রবল হইয়াছিল ; অবশেষে স্থির করিলাম, অধ্যয়ন এবং চিন্তার দ্বারা জ্ঞানের সীমা বাড়াইলে উদ্দেশ্য সাধন হইবে, সংসার ত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই।

তত্ত্ব-বিষয় সম্বন্ধে নানাবিধ ইংরাজী বই দিবারাত্রি পড়িতাম, কিন্তু অধিকাংশ পুস্তকে কিছুই সার পাইতাম না। দিন দিন পাশ্চাত্য দেশের একশ্রেণী লোকদের মত, প্রকৃতি-বাদী হইতে লাগিলাম। প্রকৃতিবাদীর চিন্তার ধরণ হইতে কতক পরিমাণে নিজেকে মুক্ত করিতে পারিলেও, অজ্ঞেয় বাদীর অতিরিক্ত চিন্তা করিবার সাধ্য নাই, দেখিলাম। মূলবস্তু সম্বন্ধে মীমাংসা, যাহা গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে দিন কাটাইতে পারা যায়, তার কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, কেবল নীতির পথ অনুসরণ করিয়া জীবন অতিবাহিত করিব, স্থির করিলাম।

আমাদের মধ্যে প্রচলিত প্রেমধর্ম্ম আমাকে খুবই আকর্ষণ করিয়াছিল।

শক্তিমূলক কল্পনা অপেক্ষা প্রেমমূলক কল্পনা, আমার খুব ভাল লাগে। আমার বিশ্বাস, প্রেমপ্রসূত শক্তির নিকট, অন্য সব শক্তি ক্ষীণ এবং মলিন হইয়া যায়। আমাদের একটি প্রধান দোষ, নিজেকে ধর্ম্মের উচ্চস্থানে লইয়া যাইতে চেষ্টা না করিয়া, আমরা যে নিম্নস্থানে আছি, সেখানে ধর্ম্মকে টানিয়া আনিয়া গড়াগড়ি খাওয়াইতে চাই! এতবড় যে প্রেমধর্ম্ম, তার অবিকৃত কল্পনার দ্বারা মনকে উদার এবং হৃদয়কে করুণরসে প্লাবিত করিতে চেষ্টা না করিয়া, তাকে আমাদের প্রবৃত্তিগত পথে, দম্পতি প্রেমের পাকে ফেলিয়া, ধর্ম্মের বিশুদ্ধ কল্পনা করিতেছি, মনে করি! দম্পতিপ্রেমের সাহায্য না লইয়া, মাতার ভালবাসার কল্পনা করিয়া, কেন যে প্রেমধর্ম্মের অনুশীলন করা হয় নাই, তাহা অনেক সময়ে বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। দম্পতিপ্রেম অপেক্ষা মাতার স্নেহ যেরূপ নির্ম্মল, সেইরূপ অধিক শক্তিমান। দম্পতীপ্রেমকে যতই পরিশুদ্ধ করা হইক, তাহা শরীরের ভিত্তির উপর অবস্থিত। বহুকাল পূর্ব্বে, সাধারণ হিন্দুর মন যখন ছিল অত্যন্ত আদিরস সিঞ্চিত, মূল কল্পনাকেও সে আদিরসের ছাঁচে ফেলিবার লোভ সংবরণ করিতে পারে নাই। ইহা ভিন্ন, দম্পতিপ্রেমের সাহায্যে ভগবৎ প্রেমের কল্পনা করার অন্য কোন কারণ খুঁজিয়া পাই না। আমাদের গোঁড়ামী এরূপ, একবার কোন প্রথার প্রচলন হইলে, তার পরিবর্ত্তনের ক্ষুদ্র চেষ্টাকেও আমরা অমার্জ্জনীয় অপরাধ মনে করি! সময়ে যখন এই আদিরসমিশ্রিত কল্পনা লোকেরা অত্যন্ত স্থূল বলিয়া বুঝিতে পারিল, পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা না করিয়া, তার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতে বসিল! যখনই পুরাতন কল্পনা অন্তঃসারশূন্য বুঝা গিয়াছে, তখনই তার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আমাদের দেশে দেখা দিয়াছে! যারা প্রেমধর্ম্মের ঐ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে না পারিল, তারা নিম্নস্তরে পড়িয়া রহিল!

আমি তখন অল্প দিন উকিল হইয়াছি। একজন বাল্যবন্ধুর বাড়িতে কিছু-দিন কাটাইতেছিলাম। আমার বন্ধু এবং তাঁর পরিবারভুক্ত সকলেই বৈষ্ণব। সে সময়ের একজন বিখ্যাত বৈষ্ণব প্রচারক, দলবল লইয়া আমার বন্ধুর বাড়িতে ছিলেন। তার আগে আমি সখীভাব তত্ত্বের কোন সংবাদ রখিতাম না। একদিন দেখিলাম, ঐ দলের একজন নারীবেশধারী পুরুষ, অন্য একজন নারীবেশধারী পুরুষের চুল বাঁধিয়া দিতেছে, আমাকে দেখিয়া মৃদু হাসিয়া মাথার ঘোমটা বড় করিয়া টানিয়া দিল। আমি প্রথমটা অপ্রস্তুত হইয়া সরিয়া গেলাম, পরে সখীভাবের বৃত্তান্ত জানিলাম। যে কয়দিন বন্ধুর বাড়িতে

ছিলাম, নেহাৎ কোন কারণে দলের কাহারও সম্মুখে না পড়িলে, দূরে থাকিয়া সময় কাটাইতাম। একদিন দলের নেতা, একজন শিক্ষিত বাঙ্গালী, আমাকে সম্মুখে পাইয়া, হঠাৎ আলিঙ্গন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি পাশ কাটা-ইয়া দূরে থাকি, তাঁদের ধরণ দেখিয়া কি ভাবি? আমি সম্ভ্রমের সহিত কেবল বলিলাম, আমার কথা ছাড়িয়া দিন, আমি বেশি কি ভাবিতে পারি!

বিরহ, মিলন, ইত্যাদি, পালার অভিনয় হইত, সেগুলি দম্পতী-প্রেমে পরিষিক্ত কথায় পরিপূর্ণ! দলের মধ্যে আমার সমবয়স্ক একজন লোক ছিলেন, তিনি সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং পরে বৃন্দাবনে বাস করেন। তাঁকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, ঐ সব পালার ভাব এবং ভাষা সম্বন্ধে তাঁর কি মত? তিনি মন খুলিয়া বলিলেন, ইচ্ছা করিয়া তিনি ঐ সব পালায় যোগ দেন না, কারণ ঐ সব উত্তপ্ত ভাষা অনেক সময়ে তাঁর মনে দুর্ব্বলতার সঞ্চার করে। তিনি যেরূপ বিশুদ্ধ চিত্তের লোক ছিলেন, তাঁর মনের ভাব যদি ঐ-রূপ হয়, তাঁর অপেক্ষা দুর্ব্বল, শতকরা নিরনব্বুই জনের চিত্তের অবস্থা কি হয়, তাহা বেশ অনুমান করা যায়।

প্রেমধর্ম্মের প্রচলিত ধরণ ছাড়িয়া দিলেও, ঐ ধর্ম্মের মূল কল্পনা আমি গ্রহণ করিতে পারি নাই। মানুষ মাত্রেই পাপী, তাপী, পাপ অহরহ আমাদের ঘিরিয়া রহিয়াছে, তাহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহের দরকার, এই কল্পনাই আমি গ্রহণ করিতে পারি নাই। কেবল এই ধর্ম্মের নয়, সব ধর্ম্মের মূলে, ঐ কল্পনা রহিয়াছে। আমরা সকলে পাপী, আমাদের ত্রাণের জন্য, ঈশ্বরের কৃপার দরকার। জগৎময় লোক কিজন্য এরূপ পাপী হইল? জগতের পুণ্যময় কর্ত্তা এত পাপ বৃদ্ধি হইতে দিলেন কেন? পুণ্যময় স্রষ্টার রাজ্যে পাপ আসেই বা কি করিয়া? অমনি আমাদের দেশের প্রচলিত উত্তর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়, ঈশ্বরের সঙ্গে পাপের কোন সম্বন্ধ নাই, সবই আমাদের কর্ম্মফল!

কর্ম্মফল! কর্ম্মফল!! আমাদের সমাজে দেখিলাম, সংক্ষেপে ঐ উত্তর সকলকে সন্তুষ্ট করিতেছে। যখন এ জীবনের কোন দুষ্কৃতির সঙ্গে ফলের সংযোগ করা চলে না, অমনি উত্তর আসে, পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল! কতদিন যে কর্ম্মফলের কথা চিন্তা করিয়া অস্থির ভাবে সময় কাটাইয়াছি, বলিতে পারি না। কেবল এ জগৎ লইয়া যদি বিষয়ের উৎপত্তি এবং পরিণাম স্থির করা হয়, বিষয়টি আয়ত্তের মধ্যে আনিতে পারা যায়। যখন পূর্ব্বজন্মে,

অনেক সময়ে একের অধিক জন্মে, কারণ খুঁজিবার জন্য আদিষ্ট হই, তখন হাল ছাড়িয়া দিতে হয়! বেশ মনে আছে, আমার উপরোক্ত বৈষ্ণব বন্ধুর বাড়িতে থাকিবার সময়ে, একদিন হঠাৎ মনে হইল, যদি সত্যই কোন অখণ্ডনীয় নিয়মের অধীন হইয়া, এক জীবনের কাজের ফল অন্য জীবনে ভোগ করিতে হয়, এবং সৃষ্টির গোড়া হইতে ধারাবাহিক ভাবে ঐ নিয়ম চলিয়া আসিতেছে, তাহা হইলে সৃষ্টির সর্ব্বপ্রথম বস্তুর সত্তার মধ্যে, মূল বা আদি কারণ রহিয়াছে, বলিতে কি পারা যায় না, বহুজন্ম ধরিয়া যার বিকাশ বা ফলভোগ হইয়া থাকে? কার্য্য-কারণ নিয়ম যদি দৃঢভাবে আমাদের আদিকাল হইতে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, এবং কোন বস্তু, কিংবা তার স্বভাব বা গুণ, যখন আমরা সৃষ্টি করিতে পারি না, তখন আদি বস্তুর সত্তাই বহুজন্মের ভিতর দিয়া বিকশিত হইয়া আসিতেছে, ধরিতে হইবে। তাহা হইলে, মানুষের দায়িত্ব কোথায় রহিল? নিত্য যাহা পাপ বলিয়া আমাদের ঘাড়ে চাপান হয়, তার জন্য আমরা যথার্থ কি দায়ী? বস্তু সংযোগের ফল যখন অবশ্যম্ভাবী, কিরূপ অবস্থার মধ্যে জন্ম হইবে, তার উপর মানুষের যখন অধিকার নাই, এমন কি আমাদের প্রবৃত্তিও অবস্থা-সংযোগ হইতে প্রসূত, তখন মানুষের দায়িত্ব কোথায় থাকে? মানুষের বিচার শক্তির বড়াই করিয়া তার উপর সব চাপাইলে ত চলিবে না, কারণ ব্যক্তিগত বিচারশক্তিও অবস্থা-প্রসূত, কার্য্য-কারণ নিয়মের অধীন হইয়া বাড়ে কিংবা কমে। তারপর যদি ধরা যায়, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ, সবই তিনি জানেন, তাহা হইলে আদি কালের মূলবস্তু, জন্ম-পরম্পরার ভিতর দিয়া কি নিয়মে বিকশিত হইবে, নিশ্চয়ই তিনি তাহা জানেন। শুধু তাহাই নয়, যদি তিনি সৃষ্টির আদি কারণ এবং সর্ব্বময় কর্ত্তা, সকল বস্তুর বিকাশও তাঁর ইচ্ছানুযায়ী হইতেছে। বস্তু এবং তাব প্রকৃতি সৃষ্টি করিয়া হাল ছাড়িয়া দিয়া তিনি বসিয়া আছেন, স্রষ্টা এবং সৃষ্টি সম্বন্ধে এ কল্পনা অতি অদ্ভুত, তাহা কখনই সত্য হইতে পারে না। নিয়ম তাঁর, সবই তাঁর, আর কেবল ফলভোগের জন্য মানুষকে স্বতন্ত্র ভাবে খাড়া করা হইবে, ইহা ত অতি অদ্ভুত বিচার! যদি মানুষ যাহা করে তাহা পাপ হয়, ঈশ্বরের জ্ঞাতসারে, তাঁর ইচ্ছামতে, পাপ হইতেছে, নিশ্চয়ই বলিতে হইবে। ঈশ্বর বজায় রাখিয়া যাহা ফল হয়, ঈশ্বর বাদ দিয়া কল্পনা করিলেও, ফল তাহাই হয়।৹ আমার বিশ্বাস, মানুষ যাহা বুঝিতে পারে না, তাহা 'কর্ম্মফলের' ঘাড়ে চাপাইয়া থাকে। 'কর্ম্মফলের' দ্বারা সৃষ্টি

সম্বন্ধে ধারণা মোটেই পরিষ্কার হয় না। মানুষ যে পাপী, তাহা কখনই সত্য নয়, পাপের কল্পনা অতিশয় ভ্রান্ত কল্পনা, মনে হইল।

নানাবিধ সংশয় লইয়া হতাশভাবে দিন কাটাইতে লাগিলাম। কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করিতে আসিবার পর, দর্শনে এম্, এ, পরীক্ষা দিব, স্থির করিলাম। পাশ্চাত্যদর্শন মন্থন করিয়া মনের সংশয় মিটিল না, কিন্তু বেদান্ত পড়িবার সময়ে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল, মনে হইল যেন সীমাবদ্ধ চিন্তার রাশি ছাড়িয়া এক অসীম রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। পরীক্ষার জন্য পড়িতেছিলাম, মূল উপনিষদ্ পড়িবার সময় ছিল না; শঙ্করের সাহায্যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা উপনিষদের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, শঙ্করের ব্যাখ্যা পড়িয়া চলিলাম। তৎত্বম-অসির সংবাদ পাইয়া মনে যে অব্যক্ত ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল, জগৎ মিথ্যা শুনিয়া তাহা খুবই সঙ্কুচিত হইল। মনে হইল যেন মুহূর্ত্তের জন্য একটি অপার্থিব চিরানন্দের বস্তু সম্মুখে আনিয়া, পর মুহূর্ত্তে নয়নের শক্তি হরণ করিয়া, ঘোর তমসের মধ্যে নিক্ষেপ করা হইল! তখন অধিক ভাবিবার সময় ছিল না।

(২) সংশয় মোচন : আত্মতত্ত্ব

এম্, এ, পাশ করিবার পর আমার তপস্যা আরম্ভ হইল। আগে তপস্যার কথা গল্পে শুনিয়াছিলাম, জীবনে যে তাহা করিতে হইবে, কখন ভাবি নাই। উপনিষদের সহিত পরিচয় হইবার পর মনে হইল, এতকাল যাহা অনুসন্ধান করিতেছিলাম, তাহা পাইয়াছি। যে চিন্তা কিছুদূর গিয়া ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিত, তাহা অপরিসীম হইয়া উঠিল। চিন্তার এই গাম্ভীর্য্য, মনের এই অপার আনন্দ, সম্ভব হইল, উপনিষদের দেশী ও বিদেশী ভাষ্য পরিত্যাগ করিয়া, মূল উপনিষদ্ পড়িয়া। আমার তপস্যা আরব্ধ হইল, ঋষিপ্রোক্ত নির্ম্মল বাক্যগুলি অবলম্বন করিয়া। মূল উপনিষদের বাক্যগুলি যেরূপ সরল, সেইরূপ ভাব-গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ, যার তুলনায় ভাষ্যকারদের টীকা অত্যন্ত কষ্ট-কল্পনা। আমি যদি একজন পাকা ব্যবহারজীবী—যার দিবারাত্রি কাজ, সারকে অসার হইতে ব্যবচ্ছেদ করা—না হইয়া, কেবল একজন দার্শনিক হইতাম, কিংবা আত্মতৃপ্তির জন্য সত্যানুসন্ধানের কঠোর ব্রত গ্রহণ না করিয়া, পাণ্ডিত্যাভিমানী হইয়া খ্যাতির জন্য লালায়িত হইতাম, তাহা হইলে আমার

উপনিষদ পাঠের যে ফল হইয়াছে, তাহা হইত না। মূল উপনিষদ্ যতই মনোনিবেশ করিয়া পড়িতে লাগিলাম, ততই আনন্দে অধীর হইলাম।

কিন্তু ঐ সঙ্গে আমার হৃদয় গভীর দুঃখে পরিপূর্ণ হইল। জ্ঞানের ভাণ্ডার যে ঋষিবাক্যগুলি, সৃষ্টির শেষ পর্য্যন্ত সত্যের পথ প্রদর্শন করিবে, যার আলোচনা করিয়া মানবজাতি ধন্য হইয়া অসীম আনন্দে নিমগ্ন থাকিবে, দেশী সম্প্রদায়িক টীকাকার এবং বিদেশী লেখকের হাতে পড়িয়া, হায় তার কি দুর্দ্দশা হইয়াছে! তখন জীবনের প্রধান আকাঙ্ক্ষা হইল, উপনিষদের পঙ্কোদ্ধার করিয়া, দীপ্তিমান করিয়া, তাহা সকলের নিকট প্রচার করিব। আমার গভীর সংশয় ভঞ্জন কবিয়া যে তত্ত্ব জীবন আনন্দময় করিয়াছে, অপরকে সে আনন্দ বিলাইবার জন্য ব্যাকুল হইলাম। তাব সুযোগ খুঁজিতে লাগিলাম; সে সুযোগ আসিল, কটক রাভেন্সা কলেজের অধ্যাপক হইবার পর।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে, উপনিষদে দর্শনবাদ, The Philosophy of the Upanishads, ইংরাজীতে লিখিতে আরম্ভ করিলাম। যাহা করিব স্থির করি, করিতে না পারিলে অত্যন্ত অশান্তি বোধ করি। স্থির করিয়াছিলাম, গরমের বন্ধের পর বই লিখিতে আরম্ভ করিয়া, ঠিক পূজার বন্ধের আগে শেষ করিব। আলোচনা সম্পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলাম, বিষয়গুলি গুছাইয়া লিখিবার কাজ বাকি ছিল। এত একাগ্রচিত্তে, দৈনিক এতবেশি খাটিতে লাগিলাম, লিখা অর্দ্ধেক হইয়াছে, শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হইল। আমার হজমের গোল বরাবর আছে, তাহা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। চিকিৎসকের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া, একদিনের জন্যও লিখা স্থগিত রাখিলাম না। ভাবিলাম, যদি একবার লিখা বন্ধ করি, যে চিন্তারাশি নির্ঝরিণীর স্রোতের ন্যায় বহিয়া চলিয়াছে, তাহা বদ্ধ জলরাশিতে পরিণত হইবে। যে সময়ে শেষ করিব স্থির করিয়াছিলাম, ঠিক সেই সময়ে লিখা শেষ হইল। ওজন হইয়া দেখিলাম, দশ সের কমিয়া গিয়াছি; হজমশক্তি শেষ সীমায় পৌছিয়াছে। শরীর সুস্থ করিতে এক বছর লাগিয়াছিল।

বহুল প্রচারের জন্য, বই বিলাতে ইংরাজ প্রকাশকের হাতে দিবার খুবই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু অবশেষে তাহা ঘটিয়া উঠিল না। কারণ, ইংরাজ প্রকাশকের সর্ত্তে, আমি সম্মত হইতে পারিলাম না। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমার বই প্রকাশ করিবার ভার লইলেন। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে, বই প্রকাশের পর মনে হইল, জীবনের কাজ যেন শেষ হইয়াছে।

পুস্তকখানি নয় পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে, অবতরণিকা স্বরূপ, বিজ্ঞান, দর্শন, ও ধর্ম্ম, পরস্পরের সম্বন্ধের বিষয়, আলোচনা করিয়াছি। ঐ সম্বন্ধের পরিষ্কার ধারণা করিতে না পারিয়া, অধিকাংশ লোকেরা যাহা-তাহা বিশ্বাস করিয়া জীবন কাটায়। মানবজাতির মধ্যে বিজ্ঞানের প্রচার হইতে সময় লাগিয়াছিল, কিন্তু দর্শন এবং ধর্ম্মের নিত্য-সম্বন্ধ, জাতির শৈশবাবস্থা হইতে প্রকাশ পাইয়াছে। দর্শন সম্বন্ধে সাধারণের একটি ভ্রান্ত ধারণা আছে। তারা মনে করে, কেবল জন কয়েক বাছা শিক্ষিত লোক তত্ত্বচিন্তার অধিকারী। ইহা অত্যন্ত ভুল ধারণা। মোটামুটি গুছাইয়া বস্তু-বিষয় সম্বন্ধে ধারণা না করিয়া, মানুষ কখনই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না, সে ধারণার মূল্য যাহাই হউক। সৃষ্টি, ঈশ্বর, ইহকাল, পরকাল, পাপ, পুণ্য, কার্য্য-কারণ, ইত্যাদি, সম্বন্ধে, একটিও লোক নাই যে নিজের মত ধারণা করে না। সৃষ্টির আদিকাল হইতে মানুষ তাহা করিয়া আসিতেছে। ঐ চিন্তার পর আসে বিশ্বাসের অবস্থা, যাকে ধর্ম্মভাব বলা হয়। নিজের বুদ্ধি এবং বিবেচনা অনুযায়ী মানুষ যে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তাহা ধর্ম্ম-বিশ্বাসে পরিণত হইয়া, তার সুখ-দুঃখ পূর্ণ জীবনের গতিকে পরিচালন করে। ধর্ম্মের উৎপত্তি এবং সমৃদ্ধি, সৃষ্টির প্রথম হইতে, এই ভাবে হইয়া আসিতেছে। দর্শন এবং ধর্ম্মের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য।

জাতির শৈশবে, মানুষের সমস্ত প্রয়োজন, নিজের দ্বারা সম্পন্ন হইত। তার কাজের সংখ্যা যখন বাড়িল, শ্রম বিভাগের সাহায্যে, বিভিন্ন লোকের দ্বারা, ঐ কাজগুলি সম্পন্ন হইতে লাগিল। যে মানুষ নিজের হাতে, কাঠ কাটিয়া, কাপড় কাচিয়া, নাপিতের কাজ, এবং দেবতার পূজাও করিয়া আসিতেছিল, সময়ে ঐ কাজগুলি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দ্বারা সম্পন্ন হইল, এবং সামাজিক জীবনের উন্নতি দ্রুত হইতে লাগিল। ঠাকুর-দেবতার পূজার ভার এক সম্প্রদায়ের উপর ন্যস্ত হইল, যারা যাজক বা পুরোহিত সম্প্রদায় নামে পৃথিবীতে পরিচিত হইল। সৃষ্টির এরূপ বিচিত্র গতি, যে সম্প্রদায় বিভাগের গুণে সমাজের অশেষ উন্নতি হইয়াছে, ঐ কারণেই আবার এক সময়ে সমাজে বিপ্লবের সূচনা হইল। বর্ত্তমান কালে, জগতের নানাবিধ বিপ্লবের প্রধান কারণ হইতেছে, বিবিধ সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বার্থজনিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা। অন্যান্য সম্প্রদায়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া, যাজক সম্প্রদায়ের বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যায়, সমাজে সম্মান ও ক্ষমতাবৃদ্ধির সহিত, তাদের সাম্প্রদায়িক

দাবি অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রবল চেষ্টা হইতে লাগিল। ধর্ম্মের সহিত জ্ঞান-শাস্ত্রের অবিভাজ্য সম্বন্ধ স্বীকার করিলে, যাজকদের প্রতিপত্তি কমিয়া যায় দেখিয়া, তারা তাহা স্বীকার করিতে ইচ্ছা করিল না। জ্ঞান ও ধর্ম্মের মূল স্বতন্ত্র—জ্ঞানের মূল বিবেক, এবং ধর্ম্মের মূল বিশ্বাস—তারা প্রচার করিতে লাগিল। যে জ্ঞান এতকাল ধর্ম্মবিশ্বাসে পরিণত হইয়া আসিতেছিল, তাহা ধর্ম্মের পথে অন্তরায় বলিয়া প্রচার করা হইল! বহুকাল ধরিয়া প্রচারের মাহাত্ম্য এরূপ, জগতের লোকেরা তাহাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে অভ্যাস করিয়াছে। আমাদের দেশের লোকেরা পাখীর মত, "বিশ্বাসে পাইবে ঈশ্বর, তর্কে বহুদূর", যে বুলি শিখিয়াছে, তাহা বহুকাল হইতে আরব্ধ, ধর্ম্মের সহিত জ্ঞানের ঐ বিচ্ছেদের ফল।

ক্রমশ জগতে বিজ্ঞানের চর্চ্চা বাড়িল এবং ঐ সঙ্গে জ্ঞানের বৃদ্ধি এবং দর্শনের পরিপুষ্টি হইল। দর্শন এবং ধর্ম্মের ন্যায়, বিজ্ঞান এবং দর্শনের সম্বন্ধ, অতি ঘনিষ্ঠ। বিজ্ঞান হইতে লব্ধ জ্ঞান, দর্শনের প্রধান অবলম্বন। তবে বিজ্ঞান সীমাবদ্ধ, কারণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ তার একমাত্র মূল, দর্শন কিন্তু কেবল প্রত্যক্ষসিদ্ধ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের অতিরিক্ত চিন্তাও দর্শনের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে, যতক্ষণ তাহা বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ সাব্যস্ত না হয়। বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ জ্ঞান দর্শনের অন্তর্ভুক্ত হইলে, দর্শনের মৌলিকতা নষ্ট হয়। দর্শনের অনুকরণে, ধর্ম্মও, বিজ্ঞান-অতিরিক্ত চিন্তা নিজের অন্তর্গত করিয়া লয়, কিন্তু পরে বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত হইলে, তাহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য, নতুবা ধর্ম্মের গ্লানি হয়।

বিবেক ও বিশ্বাস, পরস্পরের বিরোধী প্রচার হওয়া অবধি, জগতে ধর্ম্মের গ্লানি আরম্ভ হইয়াছে। জ্ঞান বিস্তারের সহিত, বিবেক-বর্জ্জিত ধর্ম্মে, লোকদের আস্থা দিন দিন কমিয়া আসিতেছে। যারা বলে, লোকেরা দিন দিন বেশি অধার্ম্মিক হইতেছে, তারা আসল অবস্থা বুঝিতে পারে না। ধর্ম্ম-বিশ্বাসের জন্য মানুষ সর্ব্বদা লালায়িত, কিন্তু এখন সে ঐ বিশ্বাস বিবেকের উপর স্থাপন করিবার জন্য ব্যগ্র। মানুষের ধর্ম্মপিপাসা সমানই আছে, কেবল বিবেক-বিরুদ্ধ বিশ্বাস তাকে আর প্রলুব্ধ করিতে পারিতেছে না। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, মানুষের সত্য-পিপাসা বাড়িয়াছে। অলীক কল্পনায় ডুবিয়া থাকিয়া, সে আর মনের স্বচ্ছন্দতা লাভ করিতে চায় না। বিজ্ঞান, দর্শন এবং ধর্ম্মের, প্রাণস্বরূপ, সে বুঝিতে পারিয়াছে। বিজ্ঞান-বিরোধী দর্শনের ন্যায়,

বিজ্ঞান-বিরোধী ধর্ম্ম পরিত্যজ্য, ইহা একালের শ্রেষ্ঠ বাণী। ধর্ম্ম-প্রচারকের ন্যায় দার্শনিকের ইহা স্মরণ রাখা দরকার।

উপনিষদে দর্শনের ক্রম-বিকাশ আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, ঋগ্বেদে দর্শনের ক্রম-বিকাশ আলোচনা করিয়াছি। ঋগ্বেদের বয়স লইয়া, পণ্ডিতদের মধ্যে বাক্‌যুদ্ধ একটা সাধারণ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ম্যাক্স্‌-মুলার দলেব পণ্ডিতরা যদিও স্বীকার করেন, ঋগ্বেদই আর্য্যদের সর্ব্বপ্রাচীন রচনা, কিন্তু তাঁদের মতে, ঋগ্বেদের স্তুতিগুলি, খৃষ্ট জন্মের ২২০০ বছরের অধিক পুরাতন নয়। তিলকের দলের পণ্ডিতরা বলেন, অন্তত খৃষ্ট-জন্মের ৪৫০০ বছর পূর্ব্বে, ঐ স্তুতিগুলি বচিত হইয়াছে। আমি এই তর্কের মীমাংসা করিবার জন্য মোটেই আগ্রহ প্রকাশ করি নাই, কেবল উভয়পক্ষ তর্কের জন্য ব্যগ্র হইয়া, বড় রকমের যে একটা ভুল করিয়াছেন, তাহাই দেখাইয়াছি। ঋগ্বেদে নানাবিধ স্তুতি একসঙ্গে আছে—অতি সাধারণ হইতে, গভীর ভাবপূর্ণ স্তুতি—যাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, ঐগুলি কখনই এক সময়ে রচনা করা হয় নাই। আর্য্যদের শৈশবকালের চিন্তা, অগ্নি, বায়ু, ইত্যাদি, দেবতাদের উদ্দেশে স্তুতির সঙ্গে, তাদের উন্নত-বয়সের চিন্তা, ঈশ্বরের একত্ব সম্বন্ধে স্তুতিগুলিও রহিয়াছে। ইহা কখনই সম্ভব নয়, সব স্তুতিগুলি কোন এক সময়ে রচিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালে, ধর্ম্মের ক্রমবিকাশের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে, কখনই মনে হয় না, সমস্ত স্তুতিগুলি রচনা করিতে, খুব কমে, দুই হাজার বছব লাগিয়াছিল।

যদিও ঋগ্বেদের যুগে, অবশেষে ঈশ্বরের একত্ব প্রতিপাদন করা হয়, নীতির কল্পনা সেরূপ পরিস্ফুট হয় নাই। ক্রিয়া-পদ্ধতির দ্বারা কল্পনা পরিচালিত হইত। ভালমন্দ, উচিত-অনুচিতের ধারণা, দেবতাদের তুষ্ট করিবার চেষ্টায় পর্য্যবসিত হইয়া রহিয়াছিল। বৈদিক যুগের শেষে, আরণ্যকের সময়ে, নীতি সম্বন্ধে কল্পনা সঙ্কীর্ণতাবিমুক্ত হইয়াছিল, এবং মানুষের নীতিজ্ঞান, যজ্ঞাদি ক্রিয়া ছাড়া, অন্য প্রকারে প্রকাশ করিবার প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে, উপনিষদে দর্শনের ক্রমবিকাশ আলোচনা করিবার সময়ে বলিয়াছি, উপনিষদ্‌ তত্ত্বের অনুশীলনের জন্য যারা সূত্রলেখক এবং ভাষ্য-কারের উপর নির্ভর করে, তারা অতিশয় ভ্রান্ত। মূল উপনিষদে, বিষয়গুলি এরূপ সরলভাবে বলা হইয়াছে, পাঠকের বুঝিতে গোল একেবারেই হয় না, কিন্তু যত গোলের সূত্রপাত হয়, সাম্প্রদায়িক টীকাকারের ভাষ্য পড়িবার সময়ে।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে, এই মত প্রথম আমার "থিওরি অফ্ অনরিয়ালিটি" (Theory of Unreality) পুস্তকে প্রকাশ করি। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে, আর্, ডি, র‍্যানাডে, তাঁর Constructive Survey of Upanishadic Philosophy গ্রন্থে, ঠিক ঐ মতই প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ভাষ্যকারের টীকাকে মাকড়সার জালের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন, যার মধ্যে পড়িয়া পাঠকের বুদ্ধি ভ্রংশ হয়! অবস্থা এরূপ দাঁড়াইয়াছে, পাঠক মূল উপনিষদের বাক্যগুলি অপেক্ষা ভাষ্যকারের টীকাকে অধিক সাববান মনে করে! একদফা সূত্রকারের হাতে পড়িয়া ক্ষুদ্রতনু হইবার পর, পুনবায় ভাষ্যকারের হাতে পাক খাইয়া সরল বাক্যগুলির অর্থ অতি অদ্ভুত দাঁড়াইয়াছে। যখন উপনিষদের পাঠকেরা, সূত্রকার এবং ভাষ্যকারের জালে না পড়িয়া, মূল উপনিষদেব বাক্যগুলি বুঝিতে চেষ্টা করিবে, তখন উপনিষদ-তত্ত্ব সম্বন্ধে তাদের ভুল ধারণা দূর হইবে। যারা মনে করে, টীকার সাহায্য না লইয়া উপনিষদ পড়া যায় না, তারা যদি একবার নিজের বিবেচনাশক্তি খাটাইয়া সরল বাক্যগুলির অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করে, তাদের মতের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন নিশ্চয় হইবে। আমি তাদের কথা ধরিতেছি না, যাদের তত্ত্বজ্ঞান খুব কম, কেবল বড় নামে আকর্ষিত হইয়া উপনিষদ নাড়িতে-চাড়িতে চেষ্টা করে, কিংবা যাদের আশৈশব অভ্যাস, সব বিষয় অন্য লোকেব চোখের সাহায্যে দেখা।

সব দর্শন গুলির মূলতত্ত্ব উপনিষদে পাওয়া যায়। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে মানুষের চিন্তার গতি, যেরূপ সময়ে জড়বাদ এবং ভাব-প্রাধান্যবাদ, দুই ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হয়, আমাদের দেশেও ঠিক সেইরূপ হইয়াছে। কণাদ প্রণীত বৈশেষিক দর্শন, আমাদের দেশের পদার্থ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আদি গবেষণা। গোতমের ন্যায়দর্শন, আমাদের প্রাচীন তর্কশাস্ত্র, যাহাতে সত্যানুসন্ধানের প্রণালী নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বৈশেষিক দর্শনের দ্বারা পদার্থ-বিজ্ঞানের আলোচনা সম্পূর্ণ করিয়া, এবং ন্যায়ের সাহায্যে নির্ভুল চিন্তা করিবার ক্ষমতা লাভ করিয়া, আমাদের দেশের চিন্তা, জড়বাদ এবং ভাব-প্রাধান্যবাদ, দুই বিভিন্ন পথ অবলম্বন করে। সেজন্য আমাদের দর্শনগুলিকে দুই শ্রেণীতে বেশ বিভাগ করা যায়। এক শ্রেণীতে সাংখ্য, চারবাক, বৌদ্ধ এবং জৈন দর্শনগুলি ভুক্ত করিয়া, তাকে জড়বাদী বা অনিশ্বরবাদী বিভাগ বলিতে পারা যায়; অপর শ্রেণীতে, মীমাংসা, বৈশেষিক, ন্যায়, যোগ, এবং বেদান্ত রাখিয়া, তাকে ঈশ্বরবাদী বিভাগ বলা চলে। প্রথম বিভাগে, ঈশ্বর বাদ দিয়া, সৃষ্টিকে

পুরুষ ও প্রকৃতিতে বিভক্ত করিয়া, অবশেষে নাস্তিকতার চূড়ান্ত করা হইয়াছে; অপর বিভাগের দর্শনগুলিতে, ঈশ্বর সম্বন্ধে স্থূল বিশ্বাস হইতে আরম্ভ করিয়া, অবশেষে পরমাত্মা এবং জীবাত্মা অভিন্ন, চরম সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

আমাদের দেশে, প্রত্যক্ষবাদীদের প্রথম চেষ্টার ফল হইতেছে সাংখ্য-দর্শন। সাংখ্য প্রচারের পর, দেশে চিন্তার অবস্থা এরূপ হয়, যদি সময়ে যোগ-দর্শনের অভ্যুদয় না হইত, লোকেরা একধার হইতে ঈশ্বরে আস্থাশূন্য হইয়া, কেবল নীতির উপর নির্ভর করিয়া দিন কাটাইত। পুরাকালে যখন বিজ্ঞানের উন্নতি সেরূপ হয় নাই, যোগদর্শনই বিজ্ঞানের অভাব পূরণ করিয়া, আর্য্যঋষি-দের চিন্তা ও জ্ঞানের সমৃদ্ধি করিয়াছে। যোগের সাহায্যে, জ্ঞানের সীমা এরূপ বাড়িয়াছিল, কোন দেশে যাহা সম্ভব হয় নাই, তাহা আর্য্যভূমিতে সম্ভব হইয়াছিল, জীবাত্মা এবং পরমাত্মা অভিন্ন প্রতিপাদিত হইয়াছিল।

যোগদর্শন সম্বন্ধে লোকদের ভ্রান্ত ধারণা দেখিয়া, কিছু বাহুল্যভাবে তার আলোচনা করিয়াছি। আমাদের দেশের লোকদের একটি বিশেষ দুর্ব্বলতা এই, কথায় কথায় তারা অলৌকিক কল্পনার আশ্রয় লইয়া সন্তোষ লাভ করিতে চেষ্টা করে। যোগ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা ঐ কারণে হইয়াছে। যোগের ক্রিয়া অনেক সময়ে অনুভবের দ্বারা সম্পন্ন হয়, সেজন্য ঐ ভ্রান্তি স্থায়ী হইয়া দাঁড়া-ইয়াছে। আমি দেখাইয়াছি, যোগ সম্পূর্ণ বিজ্ঞান-সম্মত প্রথা, একাগ্রতার চরম অবস্থা ছাড়া আর কিছুই নয়। পরিতাপের বিষয় এই যে, যোগকে রহস্য-সমাকুল নিগূঢ় তত্ত্বের অন্তর্গত করিয়া, তার উন্নতির পথ রোধ করা হইয়াছে। যোগকে সম্পূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অধীনে আনিতে নিশ্চয়ই অনেক সময় লাগিবে, কিন্তু সব মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিষয়গুলির প্রকৃতি ঐরূপ, যে-গুলি এখন বৈজ্ঞানিক প্রণালীর দ্বারা আয়ত্ত করিবার চেষ্টা হইতেছে। যদি যোগ-দর্শনের উৎপত্তি, আমাদের দেশে না হইয়া ইয়োরোপের কোন স্থানে হইত, জ্ঞানপিপাসীদের উদ্যমে এতদিনে নিশ্চয় তার প্রভূত উন্নতি সাধন হইত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে, সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন তেরখানি উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে উক্তিগুলি একত্র করিয়াছি। তার উদ্দেশ্য এই, মূলবিষয় সম্বন্ধে আমার বক্তব্য, উপনিষদের সরল বাক্য হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় কি না দেখাইবার জন্য। জার্ম্মান লেখক ডয়সন্, ম্যাক্সমুলার, প্রভৃতি, কিংবা ইংরাজ লেখকগণ, তাহা করেন নাই, সেজন্য পাঠক বুঝিতে পারে না, তাঁদের যুক্তি ও নির্ণয়ের বিরুদ্ধে উপনিষদে কোন উক্তি আছে কি না। সত্যের অনুসন্ধান

করিতে গেলে, নিরপেক্ষ ভাবে প্রসঙ্গ সম্বন্ধে সব তথ্যগুলি প্রথমে সম্মুখে রাখা উচিত।

উপনিষদের পাঠককে দুই শ্রেণী লোকদের কূটপাশ হইতে রক্ষা করা দরকার। এক শ্রেণীর উল্লেখ পূর্ব্বে করিয়াছি, তাঁরা দেশী ভাষ্যকারের দল, দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা হইতেছেন, বিদেশী প্রাচ্য সাহিত্যিক-সম্প্রদায়। প্রাচ্য সাহিত্যিকদের দুই দলে ভাগ করা যায়; এক দলের নেতা হইতেছেন, জার্ম্মান্ দেশের ডয়সন্ প্রভৃতি দার্শনিকেরা, অপর দলের নেতা হইতেছেন, ইংরাজ দার্শনিকেরা, যদিও তাঁদের মুখপাত্র হইতেছেন জার্ম্মান সন্তান ম্যাক্স্ মুলার্। দেশীয় ভাষ্যকারেরা হইতেছেন বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, দর্শনকে তাঁরা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের চোখে দেখিয়াছেন। ধর্ম্মকে দর্শনের সাহায্যে আলোচনা না করিয়া, তাঁরা দর্শনকে ধর্ম্মের অধীন করিয়া, দর্শনের, এবং ঐ সঙ্গে আর্য্য-ধর্ম্মের, মৌলিকত্ব এবং সত্য নষ্ট করিয়াছেন। বিদেশী প্রাচ্য-সাহিত্যিকদের প্রথম দল, ডয়সন্ প্রমুখ দার্শনিকেরা, শঙ্করের ভাষ্যের সাহায্যে উপনিষদ্ বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কারণ তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে, উপনিষদ্-উক্তির সমর্থনের দ্বারা তাঁদের সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা কাণ্টের দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা। উপনিষদকে যথার্থই তাঁরা মহান দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, কিন্তু তার প্রধান কারণ, তাহা কাণ্টের দর্শনের স্বপক্ষতা করে, মনে করিয়া। উপনিষদের উপর তাঁদের প্রশংসা-বর্ষণ দেখিলে অনেক সময়ে ঠিক বুঝা যায় না, তাঁরা উপনিষদের দর্শনকে শ্রেষ্ঠ কিংবা কাণ্টের দর্শনকে শ্রেষ্ঠতর প্রতিপন্ন করিতে ইচ্ছা করেন! দ্বিতীয় দলের উদ্দেশ্য বুঝিতে বেশি চেষ্টার দরকার করে না। একালে তাঁরাই, দয়া করিয়া, আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থগুলি আলোচনা করিবার পথ প্রথম দেখাইয়াছেন—সে জন্য আমরা কৃতজ্ঞ আছি—কিন্তু তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য জ্ঞান-পিপাসা হইলেও, গৌণ উদ্দেশ্য যে ভারতীয় জ্ঞানগ্রন্থগুলির ভিতর বেশি কিছু সার নাই দেখান, ইহা অস্বীকার করা চলে না। গফ্ প্রভৃতি লেখকদের ঘৃণাপূর্ণ উচ্ছ্বাসগুলি পড়িলে, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না।

আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের জ্ঞান শাস্ত্রের মর্ম্মগ্রহণ করিবার জন্য বিদেশী লেখকদের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকি। তাদের মতামতই আমাদের দোষগুণের মাপকাঠি হইয়া দাঁড়াইয়াছে! তাদের নিকট প্রশংসাভাজন হইবার চেষ্টা সর্ব্বদা করিয়া থাকি, সুতরাং তাদের মতের পোষকতা করিবার জন্য আমরা

ব্যগ্র। ম্যাক্স্মুলার বলিয়াছেন, উপনিষদই হইতেছে বৌদ্ধধর্ম্মের মূল, উপনিষদের উক্তিগুলির পরিণাম হইতেছে বৌদ্ধধর্ম্ম। অমনি আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, উপনিষদের উক্তিগুলি সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মে পরিণত হইতে বাধ্য এবং তাহাই হইয়াছে! সার্ রাধাকৃষ্ণের ন্যায় চিন্তাশীল লেখককে যখন ম্যাক্স্মুলারের ঐমত মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতে দেখি, তখন যথার্থই দুঃখ হয়। আমি আলোচনা করিয়া পঞ্চম পরিচ্ছেদে স্পষ্ট দেখাইয়াছি, উপনিষদ্‌তত্ত্বের সঙ্গে নাস্তিক বৌদ্ধ ধর্ম্মের কোন সাদৃশ্য নাই, উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

ম্যাক্স্মুলার বলিয়াছেন, "আমি অর্দ্ধেক শ্লোকে তোমাদের বলিব, যাহা হাজার-হাজার গ্রন্থে প্রচার করা হইয়াছে , ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীবাত্মা পরমাত্মা ছাড়া আর কিছুই নয়।" আমি তাঁকে নকল করিয়া পঞ্চম পরিচ্ছেদের গোড়ায় বলিয়াছি, "আমি তোমাদের অর্দ্ধেক শ্লোকে বলিব, যাহা স্পষ্ট ভাবে উপনিষদে প্রচার করা হইয়াছে ; ব্রহ্ম সত্য, জগৎ সত্য ; জীবাত্মা, অন্য সব বস্তুর ন্যায়, পরমাত্মা ছাড়া আর কিছুই নয়।" আমি তাহাই প্রতিপাদন করিয়াছি, নিজের অনুমানের দ্বারা নয়, উপনিষদ্ হইতে অসংখ্য বাক্য উদ্ধৃত করিয়া।

প্রথমে দেখা যাক, জগৎ সম্বন্ধে উপনিষদে কি বলা হইয়াছে। বৃহদারণ্যকে, যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে বলিতেছেন, পৃথিবীর সকল জীবজন্তু, বেদাদি সমস্ত বস্তু, আত্মা অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে, নির্গত হইয়াছে। পুনরায়, যাজ্ঞবল্ক্য উদ্দালক আরুণিকে বলিতেছেন, আত্মা, ক্ষিত্যপতেজমরুতব্যোম, স্বর্গ, এবং অন্য সব বস্তুরই পরিচালক (নিয়ামক)। আমি পাঠককে জিজ্ঞাসা করি, এই সাদাসিধে বাক্যগুলি বুঝিবার জন্য, শঙ্কর কিংবা অন্য কোন টীকাকারের সাহায্য কি দরকার করে? এই সরল উক্তিগুলির অর্থ কখনই করা যায় না যে, জগৎ মিথ্যা। যাজ্ঞবল্ক্য নিশ্চয়ই বলিতেছেন না যে, ব্রহ্ম বাজীকরের মত একটি মিথ্যা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন! পাঠকের মনে রাখা দরকার, বৃহদারণ্যক সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন উপনিষদ্।

ছান্দোগ্য উপনিষদ্, যাহা কি বৃহদারণ্যকের সমসাময়িক, তাহাতে জগৎ সম্বন্ধে কি বলা হইয়াছে, দেখা যাক। আরুণি, তাঁর পুত্র শ্বেতকেতুকে বলিতেছেন, সর্ব্বপ্রথমে কেবল তাহা ছিল, যাহা হইতে অগ্নি উদ্ভূত হইয়াছে, তারপর অগ্নি হইতে জল, এবং জল হইতে মৃত্তিকা নির্গত হইয়াছে।

তারপর ঐ পুরুষ, যিনি অগ্নি, জল, এবং মৃত্তিকা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ঐ সকল বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং ক্রমশ পৃথিবী ও অন্যান্য সব বস্তু উদ্ভূত হইল। সৃষ্টিতত্ত্ব, যাহা এখানে বর্ণিত হইয়াছে, বিজ্ঞান-সম্মত নয়, যদি ধরিয়া লওয়া যায়, তবুও ঐ সকল উক্তিগুলির মর্ম্ম, ইহা ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না যে, ব্রহ্ম হইতে পৃথিবী প্রভৃতি সব বস্তুই জাত হইয়াছে। পাঠকের নিশ্চয়ই এই সরল ভাষার ভাব গ্রহণ কবিতে গোল ঠেকিতেছে না। এখানে যাদুকরেব দ্বাবা পৃথিবী সৃষ্টির কবার কথা কি বলা হইয়াছে? জগৎ ঐরূপ সত্য, যেরূপ সত্য তার স্রষ্টা, ব্রহ্ম।

ঈশোপনিষদে স্পষ্ট বলা হইয়াছে, চেতন, অচেতন, সব বস্তুই, একমাত্র ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। ইহার পর শঙ্কর, যিনি ভাষ্যকার ছাড়া আর কিছুই নহেন, যদি মনগডা ধরণে বলেন, জগৎ মিথ্যা, তাঁর ব্যাখ্যার মূল্য কি দাঁড়ায়? তারপর, শঙ্করের অনুগামী হইয়া যদি পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা আমাদের বুঝাইতে চেষ্টা করেন, উপনিষদে স্পষ্ট বলা হইয়াছে, জগৎ মিথ্যা, তাঁদেব মতেরই বা মূল্য কি?

'মায়া' কথার উল্লেখ আমরা প্রথম পাই শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে, কিন্তু সেখানেও স্পষ্ট বলা হইয়াছে, ব্রহ্মই অগ্নি, সূর্য্য, বায়ু, চন্দ্র, ইত্যাদি, এবং ব্রহ্ম হইতে সমস্ত সৃষ্টি উদ্ভূত হইয়াছে।

একটি বিষয় স্মরণ রাখা খুবই দরকার: যদি বারংবার স্পষ্টভাবে একটি উক্তি, পুরাতন উপনিষদ্‌গুলিতে পাওয়া যায়, এবং পরবর্ত্তী অপেক্ষাকৃত একটি নূতন উপনিষদের কোন একস্থানে, ঐ উক্তির বিপরীত উক্তি দেখা যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে যে, শেষের উক্তি প্রক্ষিপ্ত। উপনিষদ্‌গুলি বহুকাল যাবৎ স্মরণ শক্তির সাহায্যে রক্ষিত হইয়াছিল, কারণ অক্ষরের আবিষ্কার অনেক পরে হয়। সেজন্য ইচ্ছামত প্রক্ষিপ্ত করিবার সুবিধা খুবই ছিল। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই, কতগুলি উক্তি পুরাতন উপনিষদে অসংখ্য বার এরূপ সরল ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে, সেগুলি পরিবর্ত্তন করা অসম্ভব, কারণ তাহা করিতে গেলে সমস্ত উপনিষদই পরিবর্ত্তন করিতে হয়। সময়ে উপনিষদের খ্যাতি এবং প্রভাব দেখিয়া, যাহার যাহা ভাল লাগিয়াছে কিংবা ইচ্ছা হইয়াছে, উপনিষদের নাম দিয়া প্রচার করিয়াছে—এমন কি রামোপনিষদ্, আল্লোপনিষদও, রচনা করা হইয়াছে। যে তেরখানি

উপনিষদের বাক্য আমি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা ছাড়া অন্য উপনিষদের মৌলিকত্ব, দেশী বিদেশী কোন পণ্ডিত স্বীকার করেন না।

এইবার ব্রহ্মকে আমরা বুঝিতে পারি কি না, সে সম্বন্ধে উপনিষদে কি বলা হইয়াছে, দেখা দরকার। এক শ্রেণীর পণ্ডিতরা বলেন, ব্রহ্ম অজ্ঞেয়, তাঁর সম্বন্ধে কোন ধারণা করা সম্ভব নয়, ইহাই উপনিষদের স্পষ্ট উক্তি। বড় কথার ভিতরে প্রবেশ করিবার আগে, প্রথমে বিষয়টি ছোট একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করা যাক। পৃথিবী একটি বৃহৎ এবং বিস্তৃত স্থান। কেহ হয়ত নিজের জেলার বাহিরে যায় নাই; অনেকে, যে প্রদেশের মধ্যে তাদের জেলা আছে, তার বাহিরে কখনও যায় নাই; খুব কম লোকই সমস্ত ভারতবর্ষ কিংবা পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া দেখিয়াছে। কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ এবং জেলাগুলি যে আছে, তার কোন সন্দেহ নাই। জেলার বাহিরে কেহ না হয় যায় নাই, ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন স্থান যদি কেহ না দেখিয়া থাকে, পৃথিবী যে সে মোটেই দেখে নাই, কিংবা পৃথিবী কি বস্তু তাহা যে সে একেবারেই বুঝে না, ইহা কি বলা চলে? এরূপ অবস্থায় যাহা বলা চলে তাহা এই, পৃথিবীর সামান্য বা কতক অংশ সে দেখিয়াছে। জ্ঞান সম্যক্ কিংবা আংশিক হইয়া থাকে। ব্রহ্ম সম্বন্ধে অবিকল এই কথা খাটে। অসীম ব্রহ্ম সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সম্পূর্ণ না হইতে পারে, কিন্তু আমরা যে তাঁকে একেবারেই বুঝি না, তাহা বলা চলে না। কেন উপনিষদে ঠিক এই কথাই বলা হইয়াছে: যদি আমি বলি, ব্রহ্মকে সম্পূর্ণরূপে জানি, তাহা সত্য নয়; যদি বলি, তাঁকে একেবারে জানি না, তাহাও সত্য নয়; যারা জানি এবং জানি না এই উক্তির মর্ম্ম বুঝে, তারাই ব্রহ্মকে বুঝিয়াছে। অর্থাৎ, ব্রহ্মসম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আংশিক; সীমাবদ্ধ জীবের দ্বারা অসীমের পূর্ণ ধারণা করা সম্ভব নয়। সৃষ্টির সমস্ত বস্তু যখন ব্রহ্মের অভিব্যক্তি বলা হইয়াছে, জীবাত্মা যখন পরমাত্মা ছাড়া আর কিছুই নয়, আমরা যে একবারে ব্রহ্মকে জানি না, তাহা কি করিয়া সত্য হইতে পারে? যদি একথা বলা হইত, সৃষ্টির কোন বস্তুর সহিত ব্রহ্মের কোন সম্বন্ধ বা সাদৃশ্য নাই, তাহা হইলে ব্রহ্মের জ্ঞান একেবারে সম্ভব নয় বলা চলিত। উপনিষদে কিন্তু পদে পদে, সৃষ্টির সকল বস্তুর সহিত ব্রহ্মের একত্ব স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে।

অনেকের ধারণা, অসীমের কোন কল্পনাই সম্ভব নয়। অসীম সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান খুবই অপরিস্ফুট। আমি পঞ্চম পরিচ্ছেদের শেষে বলিয়াছি, অসীম সসীমের বিপরীত বা উল্টা নয়, সসীমের অশেষ বৃদ্ধি হইতেছে অসীম। অসীমের শেষ নাই তাহা সত্য, কিন্তু যাহা সসীম তাহা যে অসীমের অন্তর্গত, তার কোন সন্দেহ নাই।

এইবার যাজ্ঞবল্ক্যের প্রসিদ্ধ উক্তি, যাহা মৈত্রেয়ীকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে—"যখন ব্রহ্মবিদের নিকট সবই আত্মা হইয়া যায়, তখন জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়ের পার্থক্য থাকে না"—যার অর্থ লইয়া বহু তর্ক চলিয়া থাকে, বুঝা সহজ হইবে। এক হইতে বহুর উৎপত্তি, আবার সেই বহু একে পরিণত হয়। বহুর অবস্থায় জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় পৃথক দেখা যায়, কিন্তু একের অবস্থায়, ব্রহ্মময় অবস্থায়, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়ের বিভিন্নতা থাকে না। সে অবস্থা যে যথার্থ কি, আমরা বুঝিতে পারি না। যাজ্ঞবল্ক্য ঠিকই বলিয়াছেন। ব্রহ্মের অবস্থা প্রাপ্ত না হইলে জ্ঞানময়ের অবস্থা—যেখানে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়ের প্রভেদ নাই—তাহা কখনই বুঝিতে পারা যায় না। মানুষের খণ্ডজ্ঞান বহির্মুখী, সেহেতু তাহাতে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়ের পার্থক্য লক্ষিত হয়, পূর্ণজ্ঞানের অবস্থায়—জ্ঞানময় ব্রহ্মের অবস্থায়—জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়ের পার্থক্য থাকে না। আমরা ঐ অবস্থার কেবল একটা কল্পনা করিতে পারি, কিন্তু তার অধিক বুঝিবার ক্ষমতা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, যাজ্ঞবল্ক্য তাহাই বলিতেছেন। ব্রহ্ম যে একেবারে অজ্ঞেয়, যাজ্ঞবল্ক্য তাহা বলেন নাই। তিনি স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে স্পষ্টই বলিয়াছেন, মানুষ, পৃথিবী, দেবতা, জন্তু, এবং সববস্তুই ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত। কেন উপনিষদের উক্তি, আমরা ব্রহ্মকে জানি অথচ জানি না, যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তির একরূপ পুনরাবৃত্তি। ব্রহ্মের বহুর অবস্থা আমরা বেশ বুঝিতে পারি, কিন্তু তাঁর একের অবস্থা, যেখানে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়ের পার্থক্য নাই, যদিও তাহা কতকটা অনুমান করিতে পারি, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে বুঝিতে পারি না, সেজন্য ব্রহ্ম সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ।

ছান্দোগ্য উপনিষদে, আরুণি শ্বেতকেতুকে বলিয়াছেন, সৃষ্টির সব বস্তুরই সত্তা ব্রহ্ম। ঈশোপনিষদেও বলা হইয়াছে, চেতন এবং অচেতন সব বস্তুই ব্রহ্ম। ব্রহ্মের এইরূপ নানাবিধ পরিচয় পাইবার পর, ব্রহ্ম সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না, উপনিষদে বলা হইয়াছে, ইহা সত্য নয়।

আমি যখন এই পরিচ্ছেদ, হিমালয় পাহাড়ের একস্থানে বসিয়া লিখিতেছি, আমার একজন শ্রদ্ধেয় বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি বহু একের মধ্যে ছিল, সেই একেকে কি যথার্থ এক বলা চলে? অনেকের অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে ঐরূপ ভ্রান্ত ধারণা আছে। একের কল্পনা তারা করিয়া থাকে, ক্ষুদ্র হইতে অতি ক্ষুদ্র বিন্দু, এবং অবশেষে শূন্যের সাহায্যে! তাদের ধারণা, তাহা না হইলে বিশুদ্ধভাবে একের কল্পনা করা হয় না। আমরা একটি ফল, একটি গাছ, একটি মানুষ, একটি জ্যোতিষ্ক, একটি সূর্য্য, একটি পৃথিবী, সর্ব্বদাই বলিয়া থাকি। ফলটি যদি কাটিয়া দু'খানা করা হয়, প্রত্যেক খানাকে আমরা আধখানা বলি, একটি ফল বলি না। যদি ফলের শাঁস, কিংবা আঁঠি, কিংবা খোসা, কিংবা কোন একটি অংশ বাদ দিই, তাহা হইলে সম্পূর্ণ একটি ফল বলা চলে না। সেইরূপ যদি গাছের অর্দ্ধেকটা কাটিয়া ফেলি, কিংবা গাছের পাতাগুলি, ডালগুলি, গোড়াটা, কিংবা ছালটা বাদ দিই, তাহা হইলে সম্পূর্ণ গাছ বলা চলে না। মানুষের যদি হাত-পা বাদ দিই, তাহা হইলে সম্পূর্ণ মানুষ বলিতে পারা যায় না। জ্যোতিষ্ক, সূর্য্য, এবং পৃথিবী সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে। ব্রহ্ম বুঝিতে গেলে, ঠিক ঐ ভাবে বুঝা দরকার। কাটিয়া, ছাঁটিয়া, ক্ষুদ্র হইতে অতি ক্ষুদ্র করিয়া, ব্রহ্মকে বুঝিতে হয় না, বড় এবং বিস্তৃত অপেক্ষা আরও কত বড় এবং বিস্তৃত সেই অসীম ব্রহ্ম, এইভাবে কল্পনা করিয়া, সেই এক অসীম ব্রহ্মের ধারণা করিতে হয়। অতি বৃহৎ অসীম একের, অসংখ্য অচ্ছেদ্য অংশ আছে। সেই অংশগুলিকে বহু বলিয়া আমরা অত্যন্ত ভুল করি। আমাদের ভুল সংশোধন হয়, যখন সেই বহুকে একের অবিভাজ্য অংশ স্বরূপ বুঝিতে পারি। ইহাই হইল পূর্ণজ্ঞানের অবস্থা।

জগৎ ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে শঙ্করের ব্যাখ্যা, রামানুজ এবং মাধব গ্রহণ করেন নাই। রামানুজ বলেন, জীব ব্রহ্মের ন্যায় অনাদি এবং যদিও জীব অবশেষে ব্রহ্মে লীন হয়, ব্রহ্ম হইতে তার পার্থক্য চিরকাল থাকে। সেজন্য, রামানুজের মতকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বলা হয়। মাধব বলেন, জীব বহু, জীবাত্মা কখনও পরমাত্মায় লীন হয় না, জীব চিরকাল জীব হইয়া থাকে। জীব এবং ব্রহ্মের মধ্যে, সেবক এবং সেব্যভাব, উভয়ে গ্রহণ করেন।

জীব চিরকাল স্বতন্ত্র থাকে, রামানুজ এবং মাধবের এই মতের স্বপক্ষে উক্তি, পুরাতন উপনিষদে আদৌ পাওয়া যায় না। এক হইতে বহু জাত হইয়াছে, এবং পুনরায় সেই বহু একে পরিণত হয়, ইহা বারংবার উপনিষদে

অতি স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে। মাধবের বহুবাদী মত সম্পূর্ণ উপনিষৎ-বিরুদ্ধ। রামানুজ, তাঁর বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ মতের পোষকতার জন্য অপেক্ষাকৃত নূতন শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের উপর নির্ভর করেন। শ্বেতাশ্বতরের যে অংশের উপর রামানুজ নির্ভর করেন, বলা হয়, তাহা আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি, সেখানেও স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে, ব্রহ্ম হইতে প্রসূত জীব অবশেষে ব্রহ্মে সম্পূর্ণরূপে লীন হয়।

এখন বিচার করা দরকার, শঙ্কব, রামানুজ, এবং মাধবের উপনিষদ্-বিরুদ্ধ মত, উপনিষদ্-সম্মত মত বলিয়া কিজন্য প্রচার করা হইল। উপনিষদ্-যুগের অনেক পরে, প্রথম সূত্রকার, এবং পরে ভাষ্যকারদের অভ্যুদয় হয়। মৌলিক চিন্তার পর, ব্যাখ্যার যুগ সর্ব্বত্রই আসিয়া থাকে। স্বল্পকথায় ব্যক্ত জ্ঞানতত্ত্বের ব্যাখ্যাব রীতি এই, একই উক্তি ভিন্নমতাবলম্বী ব্যাখ্যাকারদের হাতে পড়িয়া, বিভিন্নরূপ ধারণ করে। সমাজে সকল শ্রেণীর লোকদের গ্রহণ-শক্তি কখন সমান হয় না। উপনিষদ্ যে আর্য্য ঋষিদের চরম চিন্তার ফল, সে সম্বন্ধে মতভেদ কখন হয় নাই, কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা, উপনিষদের ব্যাখ্যা, নিজেদের গ্রহণোপযোগী করিয়া, বিভিন্ন প্রকারে করিতে লাগিল। এক শ্রেণীর প্রতিনিধি হইয়া শঙ্কর উপনিষদের ব্যাখ্যা এক ভাবে করিলেন; অন্য এক শ্রেণীর মুখপাত্র হইয়া রামানুজ, তার ব্যাখ্যা অন্য এক ভাবে করিলেন। মায়াবাদী হইয়া, জগৎ মিথ্যা বলিয়া, ব্রহ্মকে একেবারে গুণহীন করার জন্য, শঙ্করের বিরুদ্ধে আমরা যাহা বলি না কেন, উপনিষদ্ তত্ত্বকে সর্ব্ব-সাধারণের গ্রহণযোগ্য করিবার জন্য তাকে ক্ষুণ্ণ কবিতে তিনি কখন চেষ্টা করেন নাই। শঙ্কর, তখনকার সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা চিন্তাশীল শ্রেণীর পক্ষ হইতে উপনিষদ্ তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রামানুজ, সাধারণ লোকদের মনের ভাবের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া উপনিষদের মর্ম্মগ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সেজন্য তাঁর ব্যাখ্যায়, সাধারণ লোকদের বিশ্বাস, সুখ, দুঃখ, এবং কামনার কথা, স্থান পাইয়াছে। সাধারণ লোকেরা উচ্চে উঠিয়া উপনিষদ তত্ত্বের মর্ম্মগ্রহণ করিতে না পারিয়া, তাকে নিম্নে টানিয়া আনিয়া, নিজেদের ধরণে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছে! উপনিষদ-যুগের পূর্ব্বে, যেরূপ লোকেরা ঈশ্বরকে বহু দূরে রাখিয়া, ভক্তি এবং পূজার দ্বারা তৃপ্ত করিত, রামানুজ সেই প্রথা, জনসাধারণের প্রীতির জন্য ফিরাইয়া আনিলেন। আবার মানব-হৃদয়, স্তুতি এবং পূজা করিয়া ধন্য

হইল। উপনিষদ-যুগে, ঋষিরা, জীবাত্মা এবং পরমাত্মা অভিন্ন, যে গভীর সত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সাধারণ লোকেরা তাহা গ্রহণ করিতে সাহসী হইল না। আবার মানুষ, বহুদূরে থাকিয়া, ঈশ্বরকে উপাসনার দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া, হৃদয়কে পরিতৃপ্ত এবং শান্ত করিতে লাগিল!

অক্লান্ত প্রচারের গুণে, হিন্দুর মনে মায়াবাদ এরূপ বিঁধিয়া রহিয়াছে, বিস্তৃত আলোচনার দ্বারা, তাহা যে কেবল শঙ্করের একটি মনগড়া কল্পনা, না দেখাইলে, উপনিষদ্ সম্বন্ধে গবেষণা সম্পূর্ণ হইবে না ভাবিয়া, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে, ঐ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমার ধারণা, মায়াবাদ খণ্ডন না করিলে, আত্মতত্ত্বের গৌরব এবং বিশেষত্ব নষ্ট হইয়া যাইবে। যদি আমরা মোহে আচ্ছন্ন হইয়া আজীবন ঘুরিতেছি, আমাদের চিন্তার মূল্য কি? মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তির সব চিন্তাই অলীক। তাহা হইলে, জীবাত্মা এবং পরমাত্মা অভিন্ন, উপনিষদের এই সিদ্ধান্ত, মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তির কেবল একটা অলীক কল্পনা! উপনিষদের সারতত্ত্ব, মায়াবাদীর প্রসাদে, একেবারে অসার হইয়া যায়। আর এক কথা, মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তি, মোহে আচ্ছন্ন হইয়া আছে, বুঝে কি করিয়া? ইহা ত যেমন-তেমন মোহ নয়, আগা-গোড়া, সৃষ্টি-ব্যাপী, চাপ-বাঁধা মোহ! মোহ যে কাটিল, তাহাই বা বুঝা যায় কি করিয়া? এরূপ অদ্ভুত কল্পনা উপনিষদে আছে কি না, তাহা অনুসন্ধান করা দরকার।

পুরাতন এবং আধুনিক মতে, মায়াবাদ স্বপক্ষে প্রত্যেকটি উক্তির আলোচনা করিয়াছি। ঋক্‌বেদের দীর্ঘতমস এবং নাসদিয়া স্তুতি, উপনিষদের উক্তিগুলি, গৌড়পাদ এবং শঙ্করের যুক্তিগুলি, প্রত্যেকটি আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে, সেগুলি মায়ার স্বপক্ষতা আদৌ করে না। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে প্রথম 'মায়া' শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, কিন্তু ঐ উপনিষদ্ অপেক্ষাকৃত নূতন, সেজন্য জার্মানির প্রসিদ্ধ দার্শনিক ডয়সন্, উহা বাদ দিয়া, পরোক্ষভাবে, বৃহদারণ্যক এবং ছান্দোগ্যের কতগুলি উক্তির সাহায্যে, উপনিষদে মায়াবাদের প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রত্যেকটি উক্তি সম্বন্ধে তাঁর ভ্রম আমি দেখাইয়াছি।

শঙ্করের মায়াবাদ আলোচনা করিবার সময়ে, লোকেরা একটি বিষয় ভুলিয়া যায়। মায়াবাদ খাড়া করিয়া, সৃষ্টিরহস্য সম্বন্ধে একটি স্বাধীন কল্পনার চেষ্টা, যেরূপ ইয়োরোপের প্রসিদ্ধ দার্শনিক কান্ট্ করিয়াছেন, তাহা করিলে আপত্তির কোন কারণ ছিল না। ঐ মত গ্রহণ করিতে পারা যায় কিনা,

তার স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে যুক্তিগুলি বিবেচনা করিয়া, যাহা হয় একটা সিদ্ধান্ত করা চলে। কিন্তু যখন বলা হয়, উপনিষদে মায়াবাদ আছে, এবং আত্মতত্ত্ব ঐ মায়া-ভিত্তির উপর গড়িযা তোলা হইয়াছে, বিষয়টি একেবারে স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে, কারণ মায়াবাদ ঋষিদের ঘাড়ে চাপান হয়। শঙ্করের মায়াবাদ খণ্ডন কবিবার জন্য ব্যগ্র হওয়ার ঐ একমাত্র কারণ। শঙ্কর, যদি তাঁর নাম দিয়া নূতন একটি সৃষ্টিতত্ত্ব জগৎকে দিতেন, কেহ সেরূপ আশ্চর্য্যান্বিত হইত না, কারণ জগতে প্রত্যেক শতাব্দীতে, সৃষ্টি রহস্য উন্মোচন হয় দাবি করিয়া, দশ-বিশটা তত্ত্বের প্রচার হইয়া থাকে, শঙ্করের সৃষ্টিতত্ত্ব তার মধ্যে একটি হইত।

আমি এখানে কেবল শঙ্করের মায়াবাদ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বলিব। এত বড় তার্কিক শঙ্কব, যিনি নানাত্ববাদী, দ্বৈতবাদী, এবং একেশ্বরবাদীর বিরুদ্ধে, যুক্তির পর যুক্তি প্রয়োগ করিযা তাদের মত খণ্ডন করিয়াছেন, মাযাবাদ স্বপক্ষে কিন্তু তাঁর যুক্তি খুঁজিতে গিযা পাঠক হতাশ হইয়া পড়ে! ঋষিদের শ্রেষ্ঠতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, তিনি মায়ার অবতারণা করিয়া বুঝাইতেছেন, ঐ মায়া কোথায় পাইলেন, সে সম্বন্ধে একটিও কথা তাঁর পাঠককে বলিয়া কৃতার্থ করেন নাই। তিনি গোড়া হইতে ধরিয়া লইয়াছেন, মায়া অনাদি এবং ব্রহ্মের সমসাময়িক! একমাত্র ব্রহ্ম ছাড়া যিনি অন্য কোন বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, মাযা কোথা হইতে ব্রহ্মের পাশে নিঃশব্দে আসিল, সে সম্বন্ধে শঙ্কর কিছুই বলেন নাই। আমি দেখাইয়াছি যে তিনি বৌদ্ধদের অস্ত্রশালা হইতে, গৌড়-পাদের সাহায্যে, ঐ মায়া অস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু বৌদ্ধদের নাস্তানাবুদ করার পর, তাঁর সাধ্য ছিল না প্রকাশ করা, তিনি ঐ ধারণার জন্য তাদের নিকট ঋণী! মায়াবাদ প্রসঙ্গের গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত, শঙ্করের কেবল ঐ এক কথা—মায়া বরাবর আছে—কিন্তু ঐ উক্তির স্বপক্ষে উপনিষদের একটিও বাক্য উদ্ধৃত করেন নাই।

গৌড়পাদ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। তিনি গোবিন্দের শিক্ষক, যে গোবিন্দ পরে শঙ্করের শিক্ষক হইয়াছিলেন। শঙ্করের জন্ম ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে, তিনি বত্রিশ বছর বয়সে, ৮২০ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। সুতরাং গৌড়পাদ, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে জীবিত ছিলেন, বেশ ধরা যাইতে পারে। গৌড়পাদের জন্মের পূর্ব্বে, বৌদ্ধ ধর্ম্মের সমৃদ্ধি, এবং মাধ্যমিক ও বিজ্ঞানবাদ সম্প্রদায়ের শূন্যবাদ এবং মায়াবাদ প্রচার, বহুলভাবে হইয়াছিল। গৌড়পাদ ঠিক বৌদ্ধ না হইলেও, বৌদ্ধ দর্শনের যে খুব পক্ষপাতী, তার কোন

সন্দেহ নাই। গৌড়পাদ "মাণ্ডুক্য-কারিকা" নাম দিয়া একখানি কারিকা রচনা করেন। তিনি অন্য কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই। মাণ্ডুক্য-কারিকা চারিভাগে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে, মাণ্ডুক্য উপনিষদের টীকা আছে, সেজন্য কারিকার নাম মাণ্ডুক্য-কারিকা। মাণ্ডুক্য উপনিষদ্ একখানি ক্ষুদ্র উপনিষদ্, সকলের মতে, তত্ত্বগৌরবে পুরাতন উপনিষদগুলির সমকক্ষ হইতে পারে না, এবং তাহাতে মাযার কোন উল্লেখ নাই। গৌডপাদ কিন্তু মায়ার সাহায্যে ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন! তাঁর কারিকার ব্রহ্ম-তত্ত্ব এবং মাধ্যমিক ও বিজ্ঞানবাদ সম্প্রদায়ের মায়াবাদের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। সুতরাং গৌড়পাদের ব্রহ্ম বৌদ্ধদের নাস্তিক্যে বা শূন্যে পরিণত হইয়াছেন।

শঙ্কর গৌড়পাদের মাণ্ডুক্য-কারিকার একখানি ভাষ্য লিখিয়াছেন, এবং গৌড়পাদেব প্রভাব স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন যে, একমাত্র গৌডপাদই বৈদিক যুগের জ্ঞান পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছেন! বাদরায়ন ব্রহ্মসূত্রের প্রণেতা, যার ভাষ্যও শঙ্কর লিখিয়াছেন। ক্ষুদ্র একখানি কারিকার লেখক গৌড়পাদের অশেষ প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু বিরাট ব্রহ্মসূত্রের প্রণেতার সুখ্যাতি করিয়া একটিও কথা শঙ্কর বলেন নাই! ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, শঙ্কর গৌড়পাদের মতের কিরূপ পক্ষপাতী। অনেকে সেজন্য শঙ্করকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়া থাকে।

শঙ্করের সময় হইতে হিন্দুরা জগৎ মায়াময়, অতএব মিথ্যা, পাখীর মত উচ্চারণ করিয়া মনের তৃপ্তি লাভ করিতে শিখিয়াছে। জগৎ মোহপূর্ণ, অতএব মানুষের চরম কাম্য, তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকা, এই ধারণা যে কতক পরিমাণে হিন্দুদের সাংসারিক নিশ্চেষ্টতা ও রাজনীতিক অধঃ-পতনের কারণ, সে বিষয়ে কি কোন সন্দেহ আছে ?

মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া আমি নিরস্ত হই নাই। কেন শঙ্করের ন্যায় একজন বিচক্ষণ পণ্ডিত ভারতবর্ষে, এবং কান্টের ন্যায় একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ইয়োরোপে, মায়াবাদের একান্ত পক্ষপাতী হইয়াছেন, তার আলোচনাও করিয়াছি। শঙ্কর দেখিলেন, ব্রহ্ম আনন্দময়, তাঁর আনন্দ উথলিয়া উঠিতেছে, কিন্তু জীব সর্ব্বদা দুঃখের দ্বারা পীড়িত। আনন্দময় ব্রহ্মের পাশে জগতের দুঃখ-ক্লিষ্ট ছবি ধারণ করিয়া শঙ্কর হতাশ হইয়া পড়িলেন। ইহা কি সম্ভব, সদানন্দ ব্রহ্ম এই দুঃখময় পৃথিবীর স্রষ্টা। অমনি হৃদয় হইতে কাতর বাণী উঠিল, কখনই সম্ভব নয়। আনন্দময় ব্রহ্মকে কখনই দুঃখময় জগতের স্রষ্টা বলিতে পারা

যায় না—তাঁর দ্বারা এরূপ অসঙ্গত কাজ কখনই হইতে পারে না। দুঃখময় জগতের স্রষ্টা বলিয়া আনন্দময়ের কলঙ্ক ঘোষণা করা অপেক্ষা, জগৎকে মিথ্যা প্রচার করা অধিক যুক্তিসঙ্গত এবং বাঞ্ছনীয়। ব্রহ্মপ্রেমিক শঙ্কর, ব্রহ্মের ত্রুটি হইয়াছে চিন্তা করিতে না পারিয়া, সিদ্ধান্ত করিলেন, জগৎ মায়া-প্রসূত, অতএব মিথ্যা, এবং তাহাই প্রচার করিলেন। অনেক শতাব্দীর পর, ইয়োরোপে, কাণ্ট্‌ও ঠিক ঐ ধরণে চিন্তা করেন। মঙ্গলময় ঈশ্বরের সহিত বৈষম্যপূর্ণ সৃষ্টির সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়া, কাণ্ট্‌ও বলিলেন, সৃষ্টির প্রকৃত কল্পনা মানুষ করিতে পারে না, এবং তিনি তাহাই প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা কবিলেন।

শঙ্কর এবং কাণ্টের পূর্ব্বে, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতাও অবিকল ঐ ধরণে চিন্তা করেন। দেশের ভবিষ্যৎ রাজা সিদ্ধার্থ, যখনই প্রাসাদের বাহিরে আসিতেন, চারিদিকে দুঃখপীড়িত লোকদের অবস্থা দেখিযা তাঁর চিত্ত অভিভূত হইত। জগৎব্যাপী ঐ দুঃখের কারণ অনুসন্ধানের জন্য তিনি সংসার ত্যাগ করিলেন, এবং অবশেষে স্থির করিলেন, দুঃখেব কারণ ভ্রান্তি বা মিথ্যাজ্ঞান, যাহা নিবারণের একমাত্র উপায, সৃষ্টিকে মায়াপ্রসূত এবং অলীক জ্ঞান করা।

বুদ্ধ, শঙ্কর, এবং কাণ্ট্, তিনজনই দুঃখের কারণ ঠিক ধরিতে না পারিয়া যে জগৎকে মিথ্যা বলিয়াছেন, সে বিষযে কোন সন্দেহ নাই। এই তিনজনের মধ্যে চেষ্টা করিলে, একমাত্র শঙ্কর দুঃখের প্রকৃত অর্থ করিতে পারিতেন, যদি তিনি বৌদ্ধভাবাপন্ন হইয়া মায়াবাদের আশ্রয় না লইতেন। আমি দেখাইয়াছি, উপনিষদে দুঃখের মীমাংসা সুন্দর এবং প্রাঞ্জলভাবে করা হইয়াছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদে, দুঃখ সমস্যার আলোচনা করিয়াছি। ভয় বা আশঙ্কা, মানুষের সর্ব্বপেক্ষা আদি চিত্তবৃত্তি। চারিদিকে বিরাট প্রকৃতির সহিত আদিম মানব মনের ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে, প্রথম হইতে মানুষ অজানিত আশঙ্কায় অভিভূত হইয়াছিল। প্রকৃতির যে দিকে সে চাইয়া দেখিত, নিজেকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র অসহায় জীব মনে করিয়া ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়িত। বুদ্ধির অভাবে অধিকাংশ বিষয় বুঝিতে পারিত না, এবং যাহা বুঝিতে না পারিত, তার মধ্যে আশঙ্কার কারণ লুকাইয়া রহিয়াছে ভাবিয়া তার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিত। তাই আমরা দেখিতে পাই, প্রাচীন আর্য্য-সন্তানেরা, প্রাকৃতিক বিবিধ শক্তিকে দেবতা মনে করিয়া স্তব-স্তুতির দ্বারা প্রসন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছে। বজ্র-ঝটিকার অধিষ্ঠাতা দেবতা ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে, ঋগ্বেদের প্রায় একচতুর্থাংশ স্তুতি রচনা করা হইয়াছে। জাতবেদা অগ্নিকে প্রসন্ন করিবার জন্যও অনেক স্তুতি রচনা

করা হইয়াছে। সময়ে স্তুতিবাদে প্রসন্ন হইয়া দেবতারা মানুষের পক্ষ লইয়া তাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন! দেবতারাও ভয়ের হাত হইতে পরিত্রাণ পান নাই! তাঁবা দানবের ভয়ে সর্ব্বদা শঙ্কিত হইয়া সময় কাটাইতেন। অতএব দেখিতে পাওয়া যায়, সৃষ্টির সকলেই আদিকাল হইতে, অমঙ্গল বা মন্দের আশঙ্কায় ভীত হইবা দিন কাটাইয়াছে। মন্দের একটি বিরাট কল্পনা প্রথম হইতে মানুষেব মনে স্থান পাইযাছে। মঙ্গলময় ঈশ্বরের বিরুদ্ধে সয়তানের রূপে, কিংবা মানুষেব মধ্যে নিকৃষ্ট চিত্তবৃত্তির আকারে, মন্দের কল্পনা মানুষেব হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগিয়া রহিযাছে। সুতরাং আদিকাল হইতে মানুষ চিন্তা কবিতে শিখিযাছে, সৃষ্টির মধ্যে দুইটি মূল উপাদন, ভাল এবং মন্দ, পরস্পরেব বিরোধী হইয়া রহিয়াছে।

আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায়, কু বা মন্দ বলিয়া কোন একটি স্বতন্ত্র স্থায়ী বস্তু নাই। কোন একটি বস্তু বা অবস্থা চিরকাল মন্দ বলিয়া গণ্য হয় নাই। মন্দ বা অমঙ্গলকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, শারীরিক এবং নৈতিক। প্রথমে শারীরিক কোন একটি অমঙ্গলের কারণ আলোচনা করা যাক। পুরাকালে মানুষ অশনিপাতকে ইন্দ্রের নিক্ষিপ্ত বজ্র মনে করিয়া ভয়ে কাঁপিয়া উঠিত। এখন সে কি আর সেইরূপ বজ্রাঘাতের আশঙ্কায় কাতর হইয়া দিন কাটায়? পর্ব্বতশৃঙ্গের উপর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া এবং তাহাতে বিজলীশূল সংযুক্ত করিয়া, সে এখন নির্ভাবনায় বর্ষাকাল কাটায়। একটি নৈতিক অমঙ্গলের কারণ লওয়া যাক। হিন্দুদের এক সময়ে দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, বেদ ঈশ্বরের বাক্য স্বীকার না করিলে, কিংবা জাতির বাহিরে বিবাহ দিলে, মন্দ কাজ করা হয়, অতএব ঘোর অমঙ্গল অনিবার্য্য। এখন কি হিন্দু মাত্রেই ঐ সব কারণে অমঙ্গলের আশঙ্কা করিয়া থাকে? যে পরিবর্ত্তন প্রাচীন ধারণা সম্বন্ধে হইয়াছে, আধুনিক ধারণা সম্বন্ধেও পরিবর্ত্তন সেইরূপ ভবিষ্যতে হইবে। জ্ঞানের বিকাশ এবং অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত ধারণার পরিবর্ত্তন হয়। যদি একবার মানুষ বুঝিতে পারে, মন্দের কল্পনা অজ্ঞান হইতে প্রসূত, মন্দ কিংবা পাপ সম্বন্ধে তার ধারণা আমূল পরিবর্ত্তিত হইবে।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা সিদ্ধার্থ, দুঃখ-পীড়িত মানুষের দুর্দ্দশা দেখিয়া হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত পাইয়াছিলেন। ন্যায়সূত্রের প্রণেতা গোতম ঋষিও জগতে দুঃখের আধিক্য দেখিয়া অতিশয় অভিভূত হইয়াছিলেন। যদি বুদ্ধ এবং গোতম, তাঁদের সেকালের মনের ভাব লইয়া এখন পৃথিবীতে ফিরিয়া আসেন,

তাঁরা কি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন না, চারিদিকে যেগুলি একসময়ে দুঃখের কারণ মনে করা হইত, তাদের মধ্যে অনেকগুলি এখন দুঃখের অনিবার্য্য কারণস্বরূপ গণ্য হয় না? শঙ্কর এবং কাণ্ট্‌ও যদি জগতে ফিরিয়া আসিতেন, দুঃখ সম্বন্ধে তাঁদেরও মতের পরিবর্ত্তন হইত। নিশ্চয়ই তাঁদের মনে এ চিন্তা আসিত, এরূপ সময় আসিবে, যদিও দূর ভবিষ্যতে, যখন জগতে সর্ব্ববিধ মন্দের কারণ অদৃশ্য হইবে।

ভাল ও মন্দ, পাপ ও পুণ্য, সম্বন্ধে উপনিষদের উক্তিগুলি যেরূপ সরল, সেইরূপ জ্ঞানপ্রদ এবং মর্ম্মস্পর্শী। বৃহদারণ্যকে, যাজ্ঞবল্ক্য জনক বৈদেহকে বলিতেছেন, মানুষ ভাল কাজ করিযা বড হয় না, কিংবা মন্দ কাজ করিয়াছে, সেজন্য ছোট হয় না। যে মানুষ ভীতিশূন্য চিত্তে, বস্তুগুলিকে ভাল এবং মন্দে বিভাগ করে না, সেই ব্রহ্মের ন্যায় ভীতিশূন্য হয়। অজ্ঞান হইতে ভয় জাত হয়, ব্রহ্মজ্ঞান বা পূর্ণজ্ঞান হইলে ভয় দূর হয, এবং ঐ সঙ্গে ভাল ও ও মন্দের পার্থক্য অদৃশ্য হয়।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হইয়াছে, যে ব্রহ্মের আনন্দের ধারণা করিতে পারে, ভয় তাকে ত্যাগ করে। সে আর চিন্তা করিতে পারে না, কেন আমি করিলাম না, যাহা কি ভাল, কেন আমি করিলাম, যাহা কি মন্দ। যে এই-ভাবে, ভাল এবং মন্দ সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারিয়াছে, সেই মুক্ত হইয়াছে।

পূর্ণজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত, ভাল এবং মন্দের মধ্যে, পাপ এবং পুণ্যের মধ্যে, প্রভেদ মানুষ দেখিয়া থাকে। যখন মানুষের পূর্ণজ্ঞান হয়, অর্থাৎ সে ব্রহ্মবিদ্ হয়, বস্তুবিষয়ের সম্বন্ধ সে ভালরূপ বুঝিতে পারে, তার ভেদাভেদ জ্ঞান অদৃশ্য হয়, এবং জগৎ আর বৈষম্যপূর্ণ মনে হয় না। এই দুই ভিন্ন অবস্থার কথা মনে রাখা দরকার।

ঈশা উপনিষদে বলা হইয়াছে, যখন সব বস্তু ব্রহ্মের মধ্যে এবং ব্রহ্ম সব বস্তুর মধ্যে রহিয়াছেন, দেখিতে পাওয়া যায়, তখন শোক কিংবা দুঃখ থাকে না। যখন অজ্ঞান অন্তর্হিত হয়, পূর্ণজ্ঞানের দ্বারা মানুষ বুঝিতে পারে, সে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন, দুঃখে পীড়িত হওয়া দূরের কথা, সে তখন অপার আনন্দে নিমগ্ন হয়।

মন্দ বা অমঙ্গল যে নাই, কিংবা থাকিতে পারে না, এ সিদ্ধান্ত অন্য প্রকারে বেশ করা যায়। ব্রহ্মসম্বন্ধে উপনিষদে কি বলা হইয়াছে? তিনি জ্ঞানময় এবং আনন্দময়। ব্রহ্মের আনন্দের মাপ নাই। যদি ব্রহ্ম জ্ঞানময় এবং তিনিই

সৃষ্টির একমাত্র সত্তা, সমস্ত সৃষ্টি নিশ্চয়ই নিখুঁত হইবে, বৈষম্য তার মধ্যে কখনই থাকিতে পারে না। যদি কাহারও যথার্থ উপলব্ধি হয়, ব্রহ্ম জ্ঞানময় এবং আনন্দময়, এবং সে বিশ্বাস করে, যেরূপ আমাদের ঋষিরা বিশ্বাস করিতেন, সৃষ্টি প্রেমপ্রসূত, সে কখনই সৃষ্টির মধ্যে মন্দ বা অমঙ্গলের কণা-মাত্রও দেখিতে পাইবে না। মানুষ, অসম্পূর্ণ জ্ঞান এবং অহমিকার জন্য, দুঃখে এবং শোকে বিব্রত হইয়া দেখে, সৃষ্টির মধ্যে পাপ সর্ব্বদা বিচরণ করিতেছে। একবার, মানবের শৈশবে, এই আর্য্যভূমিতে মূলতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কিন্তু যেরূপ তখন, এখনও অধিকাংশ লোকেরা, তাহা গ্রহণ করিতে অক্ষম।

সপ্তম পরিচ্ছেদে, উপনিষদে নীতির আলোচনা করিয়াছি। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের ধারণা, উপনিষদে নীতির স্থান নাই। জগৎ যখন মিথ্যা, ভাল এবং মন্দের বিচার নিশ্চয়ই অনাবশ্যক—নীতির কথা উঠে কি করিয়া? আমাদের দুর্ভাগ্য, একই সুদৃষ্টিতে, পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা আমাদের সব বিষয় দেখিয়া থাকে। আমাদের আগাগোড়া সবই খারাপ! আমাদের যাহা কিছু আছে, তলাইয়া দেখিবার পূর্ব্বে, মত প্রকাশ করা হয়, কিছুই ভাল বলিবার নাই! পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, বহু-শতাব্দী ধরিয়া আমাদের জ্ঞানের ভাণ্ডার মানুষের স্মৃতিতে রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। সকলেই বেশ বুঝিতে পারে, এরূপ অবস্থায়, বিস্তৃত ভাবে কোন বিষয়ের আলোচনা থাকা সম্ভব নয়, সংক্ষিপ্ত ভাবেই থাকিবার কথা, এবং তাহাই আঁছে। সংক্ষিপ্ত ভাবেও যে আছে, ইহা আমাদের এবং মানব-জাতির পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয়। এখনকার দিনে, দুই তিন বড় খণ্ডে, যেরূপ নীতি বিজ্ঞানের আলোচনা করা হয়, উপনিষদে ঠিক ঐভাবে নীতির আলোচনা দেখিতে না পাইয়া, পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিতরা বলিয়া বসিয়াছেন, উপনিষদে নীতির কথা নাই! আমি দেখাইয়াছি, ব্যক্তিগত এবং সামাজিক নীতির কল্পনা, উপনিষদে অল্প কথায় এরূপ বিশদভাবে রহিয়াছে, যার তুলনায় পাশ্চাত্য দেশের নীতির কল্পনা ম্লান হইয়া যায়। যে কোন বিষয় সম্বন্ধে, যত বেশি কেহ লিখুক না কেন, তার সারমর্ম্ম অল্প কথায় বেশ প্রকাশ করা যায়, এবং বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট।

যাজ্ঞবল্ক্যের দুই স্ত্রী, মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী। বৃহদারণ্যকে দেখিতে পাই, বানপ্রস্থ আশ্রমে যাইবার পূর্ব্বে, যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নীর মধ্যে

সম্পত্তি বিভাগ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। স্ত্রী-প্রজ্ঞা কাত্যায়নী অপেক্ষা ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী স্বামীর অধিক প্রিয় ছিলেন। বুদ্ধিমতী মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য্য তাঁর হয়, তাহা হইলে তিনি কি সুখী হইবেন? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, তাহা হইলে ধনী লোকের মত জীবন কাটাইতে পারা যায়, অমৃতত্বের আশা থাকে না। কোন বস্তু আনন্দদায়ক হইলে হিতকর হইবে, কখনই বলা যাইতে পারে না। নীতি আলোচনার মূলে ঐ কথাই উঠিয়া থাকে: যাহা ভাল লাগে, তাহাই কি হিতকর? গ্রীস্-দেশের এক দল প্রাচীন দার্শনিকেরা বলিতেন, যাহা ভাল লাগে, তাহা করিয়া তৃপ্ত হও! আমাদের দেশেও ঐরূপ এক শ্রেণীব লোক ছিল, যারা ঋণ করিযা ঘৃত খাইবার জন্য উপদেশ দিযা গিযাছে!

বৃহদাবণ্যকে, অন্য একস্থানে বলা হইযাছে, তিনটি বিষয যেন সর্ব্বদা স্মরণ থাকে: সংযম অভ্যাস, পরের দুঃখ মোচনেব জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা, এবং ক্ষমশীল হওয়া।

তৈত্তিরীয উপনিষদে, যে গুণগুলি আদবণীয, তাব উল্লেখ করা হইয়াছে: সদা সত্য কথা কহিবে, সংযম অভ্যাস করিবে, চিত্ত-ব্যাকুলতা হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে সতত চেষ্টা করিবে, এবং আতিথ্যধর্ম্ম পালন করিবে। বেদ অধ্যাপন শেষ করিযা, গুরু শিষ্যকে উপদেশ দিয়া থাকেন, কখন সত্যপথ ত্যাগ কিংবা কর্ত্তব্য পালনে অবহেলা করিবে না; পিতামাতাকে দেবতুল্য জ্ঞান কবিবে, এবং যাহা দান করিবে, হৃষ্ট-চিত্তে দিবে।

কঠ উপনিষদে স্পষ্ট বলা হইয়াছে, যে মন্দাচরণ হইতে বিরত হয নাই, সংযম অভ্যাস করে নাই, কিংবা যার চিত্ত শান্ত হয় নাই, সে কখন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। এই সব উক্তির পর নিশ্চয়ই বলা চলে না যে, উপনিষদে নীতির স্থান নাই! যারা মনে করে, জ্ঞানমার্গে অগ্রসর হইতে গেলে, নীতি চর্চ্চার প্রয়োজন নাই, তারা অত্যন্ত ভ্রান্ত।

যম নচিকেতাকে মানুষের উচিত কামনা সম্বন্ধে উপদেশ দিতে গিয়া, নৈতিক আদর্শের একটি অনুপম বিবৃতি দিয়াছেন। শ্রেয় এবং প্রেয়ের মধ্যে প্রভেদ, যম নচিকেতাকে বুঝাইতেছেন: শ্রেয় এবং প্রেয়ের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র; জ্ঞানিলোক শ্রেয়কে আশ্রয় করিয়া উন্নতির মার্গে অগ্রসর হয়, মূর্খ প্রেয়ের অধীন হইয়া দুঃখে কাল কাটায়। মানবের শৈশবে, অন্য কোন জাতির মধ্যে, নীতি সম্বন্ধে এরূপ উক্তি পাওয়া যায় না। যাহা মঙ্গলজনক তাহা

সৎনীতি, ইহাই এখনকার শ্রেষ্ঠ উক্তি। আধুনিক নীতি বিজ্ঞানে, ইহার অধিক কোন মৌলিক চিন্তা পাওয়া যায় না।

ব্যক্তিগত নীতির চূড়ান্ত আলোচনার পর, উপনিষদে, সামাজিক নীতি, অর্থাৎ, মানুষের সহিত মানুষের সম্বন্ধ-গত নীতির উল্লেখ স্পষ্টভাবে আছে। ঈশা উপনিষদে বলা হইয়াছে, সর্ব্বাত্মদর্শী ব্যক্তি সর্ব্বভূতে ব্রহ্মের স্বরূপ দর্শন করে, সেজন্য কাহাকেও ঘৃণার চোখে দেখিতে পারে না। জ্ঞানী ব্যক্তির আত্মপর জ্ঞান থাকে না, সে সকলকে সমান ভাবে দেখিয়া থাকে। ইহা অপেক্ষা সামাজিক নীতির উচ্চ আদর্শ কি সম্ভব? অধিকতম লোকের প্রভূততম সুখ, সামাজিক এবং রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত—পাশ্চাত্য দেশের এই আধুনিক আদর্শ—উপনিষদের আদর্শের নিকট খাট হইয়া যায়। আত্মৈকত্বদর্শী ব্যক্তি, সর্ব্বাত্মদর্শনের ফলে, সকলকে আপনার করিয়া লয়, ভেদনীতি অদৃশ্য হয়, এক স্নেহের বন্ধনে সকলে আবদ্ধ থাকিয়া সুখে কাল কাটায়। উপনিষদে নৈতিক আদর্শের অভাব দূরের কথা, তাহা এরূপ উচ্চ, সাধারণের পক্ষে পালন করা অনেক সময়ে কষ্টকর হইয়া পড়ে।

তত্ত্ববিদ্যার সহিত নীতির সম্বন্ধ, উপনিষদে কিরূপ কল্পনা করা হইয়াছে, তাহাও আলোচনা করিয়াছি। স্বাধীন ইচ্ছা বা স্বেচ্ছাকর্ত্তৃত্ব স্বীকার না করিলে, নীতির অনুসরণ বৃথা হইয়া যায়। মন্দ হইতে ভাল বাছিয়া লইবার ক্ষমতা যদি লোকের না থাকে, মন্দ কাজের জন্য তাকে দায়ী করা চলে না। সেজন্য নীতিবিজ্ঞান লেখক মাত্রেই পৌরুষবাদের পক্ষপাতী।

পৌরুষবাদের স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে যত প্রকারের উক্তি আছে, সঙ্ক্ষেপে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি, প্রচলিত তত্ত্ববিদ্যার মতে, মানুষের স্বতন্ত্র ইচ্ছা একেবারে অসম্ভব। জড়বাদী কিংবা ঈশ্বরবাদী, উভয় মতে, ফল একই দাঁড়ায়। ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতার সহিত মানুষের স্বেচ্ছাকর্ত্তৃত্ব, একেবারেই সামঞ্জস্য করা যায় না। এই প্রসঙ্গে, দুইজন প্রসিদ্ধ ইংরাজ নীতি-বিজ্ঞান লেখক, মার্টিনিউ এবং জেম্‌সের, ঈশ্বর সম্বন্ধে অদ্ভুত কল্পনার উল্লেখ করিয়াছি। তাঁদের মতে, ঈশ্বর সবই জানেন, কেবল মানুষ ভবিষ্যতে কি করিবে তাহা জানেন না! মানুষকে বড় করিতে গিয়া, ঈশ্বরকে তাঁরা খর্ব্ব করিয়া বসিয়াছেন! ইঁহাদের দেশের লোকেরা আমাদের পরিহাসের পাত্র মনে করিয়া থাকে! ঈশ্বর কেবল সর্ব্বজ্ঞ নহেন, তিনি সর্ব্বপরিচালক। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে গাছের পাতাটিও নড়ে না। জগতে একটিও পদার্থ নাই,

যাহা মানুষ সৃষ্টি করিয়াছে। এক বস্তুর সহিত অন্য বস্তুর সংযুক্ত হইবার ক্ষমতাও সে সৃষ্টি করে নাই। যে বস্তুগুলি সৃষ্টির নিয়মের বশীভূত হইয়া সংযুক্ত হইতে পারে, সেগুলিকে কেবল মানুষ সংযুক্ত করিতে পারে। কোন পদার্থের গুণের অতি সামান্য পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতাও মানুষের নাই। সে মানুষের স্বাধীন পরিচালক হওয়া কখনই সম্ভব নয়।

ফরাসী দেশের বিখ্যাত পৌরুষবাদী বার্গসন্, যাঁর অভিমত উদ্ধৃত করিয়া আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরা ধন্য হইয়া থাকে, তাঁর গবেষণা আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি, বাক্-পটুতা ছাড়া তাহাতে সারাংশ কিছুই নাই।

একমাত্র আত্মতত্ত্বের দ্বারা মানুষ বুঝিতে পারে, সে যথার্থ স্বাধীন। যে পর্য্যন্ত ঈশ্বর এবং মানুষকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে কল্পনা করা হয়, মানুষের স্বেচ্ছাকর্ত্তৃত্ব সম্ভব হয় না। যখন আত্মজ্ঞানী ব্যক্তির উপলব্ধি হয়, জীবাত্মা এবং পরমাত্মা অভিন্ন, তখন সে বুঝিতে পারে, সব কাজের মূলে সেও রহিয়াছে, এবং তার স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা প্রত্যেকটি কাজ হইতেছে। সে তখন বুঝিতে পারে, ভালমন্দের বিচার করিয়া, স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ব্যগ্র হইবার প্রয়োজন নাই। সে কাহারও আজ্ঞাবাহী ভৃত্য নয়, তার স্বাধীন ইচ্ছা-প্রসূত কাজই সে করিয়া থাকে। জীবাত্মার রূপ ধরিয়া সে নিজেরই পরিকল্পিত ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকে। একমাত্র আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি বুঝিতে পারে, সে যথার্থই স্বাধীন।

শেষ পরিচ্ছেদে, আত্মতত্ত্বের ক্রিয়াত্মক ফলের আলোচনা করিয়াছি। কোন তত্ত্বজ্ঞান যদি জীবনে প্রয়োগ করিতে পারা না যায়, তার মূল্য কিছুই নয়, বলিতে হইবে। তত্ত্বজ্ঞান পিপাসু লোকদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এক শ্রেণীর মতে, যে তত্ত্বজ্ঞান সৃষ্টি, ঈশ্বর, এবং আত্মা, মূল বিষয়গুলি, দুই-চারি কথায় মীমাংসা করিতে না পারে, তার সারবত্তা খুবই কম। অন্য এক শ্রেণীর মত, ঠিক তার বিপরীত। তত্ত্বকথা যত জটিল হইবে, বুঝিবার শত চেষ্টা যত বিফল করিবে, ততই তাহা গরীয়ান হইবে! তত্ত্বকথা যদি সরল হইল, তার মহত্ত্ব থাকে কি করিয়া? তৃতীয় শ্রেণীর লোক হইতেছে এ কালের এক দল লোক, যাদের মতে, পুরাতন চিন্তা অতিক্রম করিয়া, যদি নূতন কিছু কোন তত্ত্বজ্ঞান নির্ণয় করিতে না পারে, তার মৌলিকতার দাবি মঞ্জুর করা চলে না! পরিবর্ত্তনশীল জগতে, নিত্য-নূতন

আবিষ্কারের যুগে, যদি একটা বকেয়া সৃষ্টিতত্ত্ব মানিয়া চলিতে হয়, আধুনিক কালের দাবি অগ্রাহ্য করা হইল, মনে করিতে হইবে। এই বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের দু'টি বিষয়ে মতের মিল বেশ দেখা যায়, যাহা তাদের মতে, মানব জাতির ন্যায্য দাবি। যেরূপ তত্ত্বজ্ঞান হউক, সর্ব্বপ্রথম, মানুষের স্বেচ্ছাকর্তৃত্ব বজায় রাখা দরকার; তারপর, চরম সত্য, ঈশ্বর অথবা যে নামে বর্ণিত হউক, তাঁকে সব কাজের সঙ্গে না জড়াইয়া, দূরে একধারে রাখা বাঞ্ছনীয়! জ্ঞানপিপাসু লোকেরা খুব কম সময়ে বুঝিয়া থাকে, তত্ত্বালোচনার প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে, বিজ্ঞানের সত্যগুলিকে অঙ্গীভূত করিয়া চরম বিষয়ের কল্পনা যতদূর সম্ভব বিস্তীর্ণ করা। যে তত্ত্বজ্ঞান তাহা করিতে না পারে, নিশ্চয় বুঝিতে হইবে, তার উদ্দেশ্য সাধন হয় নাই। বৈজ্ঞানিক সত্যের অতিরিক্ত কল্পনা করা উচিত নয়, তাহা বলা হইতেছে না—কারণ বস্তু-বিষয় সম্বন্ধে সমস্ত সত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে আবিষ্কার করিতে এখনও অনেক সময় লাগিবে। কিন্তু যে তত্ত্বজ্ঞান বিজ্ঞান-সম্মত সত্যগুলিকে নিজস্ব করিতে পারে না, তার উদ্দেশ্য সাধন হইয়াছে কখনই বলা চলে না। অতএব, আত্মতত্ত্বের সারবত্তা নির্ণয়ের জন্য, আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত সত্যের সহিত তার সম্বন্ধ আলোচনা করা দরকার।

আত্মতত্ত্ব আলোচনা করিয়া আমরা জানিতে পারিয়াছি, পরম সত্য, বাস্তব বস্তু, এক, বহু নয়। সেই অদ্বিতীয় বস্তু, চিন্ময় এবং আনন্দময়। বহুকে উড়াইয়া দিয়া একের বাস্তবতা নির্ণয় করা হয় নাই। বহুকে সর্ব্বোচ্চে তুলিয়া, একের অন্তর্গত করিয়া দেখান হইয়াছে যে, বহু একের অবিভাজ্য অংশস্বরূপ। সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমণ্ডল, জীবজন্তু, চেতন ও অচেতন বস্তু, সকলের মধ্যে সেই এক পরম সত্তা রহিয়াছে। সেই এক হইতে বহুর উৎপত্তি, নাম এবং রূপের কেবল পরিবর্ত্তন হইয়াছে। চৈতন্য ও জড়তার মধ্যে আসলে কোন প্রভেদ নাই, কারণ, সমুদয় সৃষ্টির মূল হইতেছে সেই এক বস্তু। ভাববাদ এবং বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ পরস্পর বিরোধী, লোকেরা মনে করিয়া থাকে। ভাববাদীদের ধারণা, বস্তুর স্বাতন্ত্র্যকে উড়াইয়া দিতে না পারিলে, ভাববাদের মর্য্যাদা রক্ষা হয় না। আত্মতত্ত্বে কিন্তু উভয়ের মধুর মিলন দেখা যায়। জগৎ মিথ্যা নয়। সেই পরম বস্তু হইতে জগৎ উদ্ভূত এবং তাঁর অঙ্গীভূত হইয়া রহিয়াছে। শঙ্করের সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়, জগৎকে সেই পরমবস্তু হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, উড়াইয়া দিয়া, একের বিশুদ্ধতা রক্ষা

করিবার চেষ্টা হইতেছে। তখন আত্মতত্ত্বের গভীর সত্য উপলব্ধির পক্ষে যথেষ্ট বাধা ছিল। যতই স্পষ্ট ভাবে উপনিষদে বলা হউক না কেন, সেই নিত্য বস্তু সমস্ত সৃষ্টির পরম সত্তা, চেতন ও অচেতন বস্তুকে এক সমষ্টিতে রাখিতে তখন কেহই সাহসী হয় নাই। শঙ্কর এবং রামানুজ, উভয়ের ভাষ্যে, সেকালের বিজ্ঞানেব দারিদ্র্য প্রতিফলিত হইয়াছে। শঙ্কর জগৎকে ব্রহ্মেব সঙ্গে গ্রথিত করিতে না পারিয়া, তাহা মিথ্যা প্রচার করিলেন। রামানুজ জগৎকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন, কিন্তু জীবাত্মাকে পরমাত্মা হইতে চিরকাল পৃথক করিযা দূরে রাখিলেন। সৌভাগ্যক্রমে এই বিজ্ঞান-প্রধান যুগে লোকেরা বুঝিতে পাবিবে, আত্মতত্ত্বের মধ্যে কি চিরন্তন সত্য নিহিত রহিয়াছে। যদি তাহা বুঝিতে না পারিত, যতই কেন ঐ তত্ত্ব, অনন্যসাধারণ নির্ণয়ের জন্য লোকদেব মনকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হউক, কখনই তাদের প্রতীতি জন্মাইতে পারিত না।

আধুনিক বিজ্ঞান মতে, মূল বস্তর কল্পনা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সৃষ্টিকে বহুবিধ মূল পদার্থের সমষ্টি বলিয়া এখন আব গ্রহণ করা হয় না। সৃষ্টিব মূল উপাদান এখন একটি মাত্র বস্তুতে দাঁড়াইয়াছে। জড়বস্তু এবং মনের মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য চিবস্থায়ী ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল, তাহা অদৃশ্য হইযাছে। অচেতন বস্তুর মূল কারণ যে জড়তা, তাহা বৈজ্ঞানিকরা আর গ্রহণ কবিতে পাবিতেছে না। সবই চিন্ময়, এবং তাহা একের বিবর্ত্তন। এই বিরাট বিচিত্র সৃষ্টির মূলে এক বস্তু আছে, যাহা জ্ঞানময়।

এখন আমরা নিশ্চয়ই বলিতে পারি, চাবি হাজার বছর পূর্ব্বে যে আত্মতত্ত্বের প্রচার হইয়াছে, তাহা আধুনিক বিজ্ঞানের পূর্ণ সমর্থন লাভ করিতেছে। ইহার পর আর বলা চলে না, আত্মতত্ত্ব উচ্ছৃঙ্খল চিন্তার ফল! এখন বেশ বুঝিতে পারা যায়, বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ভাষ্যকারদের হাতে পড়িয়া ঐ চিরন্তন সত্যের কি অবস্থা দাঁড়াইয়াছে!

শঙ্করের সহিত রামানুজের তুলনা করিলে বেশ বুঝা যায়, শঙ্কর অপেক্ষা রামানুজকে খুবই গুরুভার বহন করিতে হইয়াছে। একধার হইতে উপনিষদের সব উক্তিগুলি উপেক্ষা করিয়া, জগৎকে মিথ্যা বলিয়া, কাটিয়া ছাঁটিয়া ব্রহ্মকে একটি সূক্ষ্ম অমূর্ত্ত সত্তায় পরিণত করিতে, শঙ্করকে অসাধ্য সাধন করিতে হয় নাই। কিন্তু রামানুজ যখন দেখিলেন, প্রতিপদে উপনিষদে স্পষ্ট বলা হইয়াছে, জগৎ সত্য, কারণ তাহা পরম সত্য হইতে উদ্ভূত, এবং

একমাত্র ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নাই, জীবাত্মাই পরমাত্মা, তখন তিনি খুব গোলে পড়িলেন। একদিকে উপনিষদের স্পষ্ট চরম উক্তি, জীবাত্মা এবং পরমাত্মা অভিন্ন, অপরদিকে সাধারণ লোকের দুর্ব্বল হৃদয়, যেখানে ঈশ্বর উপাসনার জন্য আসন বহুকাল হইতে একরূপ স্থায়ীভাবে প্রস্তুত করা রহিয়াছে! রামানুজ দেখিলেন, উপনিষদ্ উচ্চকণ্ঠে দেবোপাসনা নিষেধ করিয়া, জীবকে তার নিত্য স্বরূপ উপলব্ধি করিতে বলিতেছেন। বহুকাল হইতে মানুষ অজ্ঞানান্ধকারে থাকিয়া অলীক দেবতাদের তুষ্ট করিয়া আসিতেছিল, আত্মতত্ত্ব সে অন্ধকার নাশ করিয়া, জীবাত্মাকে পরমাত্মায় পরিণত করিয়াছে। ঐ মহান উক্তি সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিবার বল রামানুজের অভাব হইল। রামানুজ আর সব দেবতাকে ত্যাগ করিলেন, কিন্তু একটি দেবতাকে ছাড়িতে পারিলেন না, যাঁকে মানুষ, চিরকাল মানুষ থাকিয়া—যেরূপ আবহমানকাল হইতে করিয়া আসিতেছে—সেইরূপ যেন উপাসনা করিয়া ধন্য হয়!

রামানুজকে কি সেরূপ দোষী করা যাইতে পারে? কয়জন লোক জগতে এ পর্য্যন্ত জন্মিয়াছে, যারা অকপটভাবে অন্তরের সহিত গ্রহণ করিয়াছে, জীবাত্মা এবং পরমাত্মা অভিন্ন? জ্ঞানীলোকের অন্বেষণে জীবন কাটাইয়াছি। অনেক উপাধিধারী নামজাদা বৈদান্তিকের সংসর্গে আসিয়াছি। একজনকেও সৎসাহসের সহিত, অনন্যচিত্তে, আত্মতত্ত্বের সত্য গ্রহণ করিতে দেখি নাই। অনেককে তর্কে নিযুক্ত হইতে দেখিয়াছি, প্রখর বুদ্ধির দ্বারা তর্কযুদ্ধে জয়লাভ করিতে দেখিয়াছি, কিন্তু সকলেই ঘুরিয়া ফিরিয়া, ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়া তাঁর অনুগ্রহ লাভের জন্য ব্যগ্র! ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কোন কারণ নাই। দুর্ব্বল মানুষ, সাংসারিক ঘাত-প্রতিঘাতে, অধিক দুর্ব্বল হইয়া খুব কম সময়ে কেবল সত্যের উপর নির্ভর করিয়া দিন কাটাইতে পারে। কেবল সত্যের আকর্ষণে উদ্দীপ্ত হইয়া, আত্মতত্ত্বের মধ্যে মানুষ যখন বিশুদ্ধচিত্তে প্রবেশ করিতে শিখিবে, যখন ঐ চিন্তা পুরুষানুক্রমে রক্তমাংসের সহিত জড়িত হইয়া, সৃষ্টির প্রথম হইতে প্রচলিত দুর্ব্বল চিন্তাগুলির স্থান অধিকার করিবে, তখনই সে সাহস মানুষের হইবে, যে সাহস এখন হইতেছে না, এবং তখন সে আনন্দে অধীর হইয়া দেখিবে, সৃষ্টির মূলে সেও চিরকাল রহিয়াছে। তখন সে বুঝিতে পারিবে, যাহা সে এখন বুঝিতে পারিতেছে না, স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য নাই, স্রষ্টাই মহানন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া সৃষ্টিতে প্রকটিত হইয়াছেন। অনাদি অনুপ্রাণিত

সবই অনাদি। অনাদি কখনই তাঁর নিত্য স্বরূপ ত্যাগ করেন না। যতদিন মানুষের সে জ্ঞান না হইতেছে, আত্মতত্ত্ব সে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে না। আত্মতত্ত্ব প্রচারক ঋষিরা তাহা সম্যকরূপে জানিতেন, সে জন্য যারা ঐ তত্ত্ব গ্রহণের যোগ্য, কেবল তাদের উহা আলোচনা করিতে বলিয়া গিয়াছেন। যদি ধর্ম্মকে দর্শন হইতে অন্যায়রূপে বিচ্ছিন্ন করা না হইত, আত্মতত্ত্ব তার জন্মভূমিতে এরূপ অনাদৃত হইত না, এতদিনে বহু বিস্তৃত হইয়া লোকদের সাধারণ চিন্তার বস্তু হইত।

চারিদিকে শুনা যায়, ধর্ম্মে মানুষের আস্থা দিন দিন কমিয়া আসিতেছে, ধর্ম্মশূন্য হইয়া সে দিন কাটাইতে পছন্দ করে! ইহার কারণ নয় যে, মানুষ জড়বাদী হইয়া ঈশ্বরে বিশ্বাস হারাইয়াছে। যদি কখন মানুষের মনে ধারণা ছিল, বিজ্ঞানচর্চ্চা ঈশ্বরে বিশ্বাস হরণ করিয়া লয়, সে ধারণা সমূলে বিনাশ হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা বিজ্ঞানই এখন স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিতেছে, সৃষ্টির মূলে এক অপরিসীম শক্তি আছে, যাহা চৈতন্যে পরিপূর্ণ। ধর্ম্মে অনাস্থার প্রধান কারণ, মানুষ ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণাগুলি আর গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক নয়। সে আর বিশ্বাস করিতে চায় না যে, ঈশ্বর, স্বর্গ ও নরক, দুই বিভাগ প্রস্তুত রাখিয়া, পৃথিবীর লোকদের দুইটির একটি স্থানে পাঠাইয়া দিতেছেন! বৈজ্ঞানিক সত্যের বিপরীত বিশ্বাস তাকে আর পরিতৃপ্ত করিতে পারিতেছে না। সৃষ্টিকর্ত্তার সহিত মানুষের সত্যানুগত সম্বন্ধের ধারণা করিবার জন্য সে ব্যগ্র। অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিয়া লোকেরা বহুকাল হইতে যাহা-তাহা একটা বিশ্বাস করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছে. এখন সেরূপ আর করিতে ইচ্ছুক নয়। চারিদিকে পুরাতন অলীক বিশ্বাসগুলি ভূমিসাৎ হইতেছে, কিন্তু প্রকৃত বস্তুতে বিশ্বাসের পিপাসা দিন দিন বাড়িতেছে। বিশ্বাসশূন্য হইয়া মানুষ কখনই জীবন ধারণ করিতে পারে না, কিংবা তার অন্ধ বিশ্বাস চিরকাল থাকে না।

যারা সত্যপথে অগ্রসর হইতে উৎসুক, আত্মতত্ত্ব তাদের জন্য অতি আনন্দের বাণী প্রচার করিতেছে। অনাদি পরম বস্তুর সহিত মানবের সম্বন্ধের এই সত্যানুগত তথ্য, তত্ত্বপিপাসীদের পরিতৃপ্ত করিয়া, যুগে যুগে তাহাদিগকে চরম উন্নতির পথ প্রদর্শন করিবে। আর মানুষকে ভয়ে কাঁপিয়া চিন্তা করিতে হইবে না যে, ঈশ্বর অতিদূরে, মানুষের অগম্য স্থানে থাকিয়া, জটিল সমস্যা মীমাংসার জন্য পাঠাইতেছেন, এবং ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া পুরস্কৃত করিতেছেন,

কিংবা সাজা দিতেছেন! আর চিন্তা করিয়া মনকে কলুষিত করিতে হইবে না যে, ঈশ্বরের প্রীতিলাভের জন্য অপব একজনের আনুকুল্যের দরকার, কিংবা ভ্রান্ত মানুষকে সৎপথে লইয়া যাইবার জন্য, মাঝে মাঝে তাঁর একজন প্রতিনিধি পাঠান আবশ্যক! মানুষকে কষ্ট-কল্পনা করিয়া আর হতাশ হইতে হইবে না যে, জগৎ একজন মায়াবীর সৃষ্টি, যে সকলকে মায়াজালে আবদ্ধ রাখিয়া আনন্দ উপভোগ কবিয়া থাকে! এমন কোন জীব বা বস্তু নাই, যার অন্তরাত্মা সেই পরম বস্তু নহেন। নিয়ম, যাহা সর্ব্বব্যাপী এবং সৃষ্টিকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, তাহা সেই অনাদির ইচ্ছা ছাড়া আর কিছুই নয়। সেই ইচ্ছা একের অধিকবার প্রকাশ করা দরকার হয় না, কারণ তাহা অভ্রান্ত। সেই ইচ্ছা সর্ব্বদা নির্ভুল ভাবে প্রকটিত হইতেছে, যদিও আমাদের অসম্পূর্ণ জ্ঞানেব জন্য মাঝে মাঝে সংশয় হয়, ভুল পথে যাইতেছে। যদি সত্য হয়, সৃষ্টির মূলে একটি অসীম সর্ব্ববেত্তা শক্তি রহিয়াছে, তার ধারণা অন্যভাবে করা অসম্ভব। সেই মূল শক্তিকে ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া, সৃষ্টির বিভিন্ন অংশগুলি ভিন্ন ভিন্ন শক্তির দ্বারা পরিচালিত, কখনই বলিতে পাবা যায় না। কখনই ইহা সম্ভব হইতে পারে না যে, সমষ্টির অংশগুলি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন, মূলবস্তুর অবিভাজ্য অংশস্বরূপ নয়। বহু একের সম্পূরক, অর্থাৎ অপরিহার্য্য অংশ। স্রষ্টা এবং সৃষ্টি সম্বন্ধে এইরূপ তথ্য গ্রহণ করিয়া, পরিতৃপ্ত হইয়া, মানুষ জীবন অতিবাহিত কবিতে পারে। আত্মতত্ত্ব, চারি হাজার বছর পূর্ব্বে, জগতে এই মহান বাণী প্রচার করিয়াছে।

আত্মতত্ত্বের নীতির আলোচনা করিয়া হৃদয় অসীম আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। মন্দ বা পাপ বলিয়া কোন জিনিষ নাই, তাহা কেবল অজ্ঞানের উপাধি বা বর্ণনা মাত্র। জ্ঞানবিকাশের সহিত, মন্দ বা পাপ অন্তর্হিত হয়। অসম্পূর্ণ জ্ঞান মানুষের মনে মন্দের একটি স্বতন্ত্র ধারণা জাগাইয়া রাখে। পূর্ণজ্ঞান লাভ হইলে মানুষ বুঝিতে পারে, সৃষ্টিতে কোন বৈষম্য নাই। অজ্ঞানের ন্যায় মন্দ বা পাপের কল্পনা ক্ষণস্থায়ী। পূর্ণজ্ঞান অজ্ঞানকে, এবং ঐ সঙ্গে পাপের কল্পনাকে, বিনাশ করে। আত্মতত্ত্বের দ্বারা মানুষ বুঝিতে পারে, সৃষ্টি আনন্দের নিত্যভূমি, কারণ তাহা আনন্দময় ব্রহ্মের মধ্যে অবস্থিত। যখন ঐ জ্ঞান হয়, পাপকে আর পাপ বলিয়া মনে হয় না, দুষ্কর্ম্মকে দুষ্কর্ম্ম মনে হয় না, নরঘাতীকে নরঘাতী মনে হয় না, অর্থাৎ প্রচলিতভাবে মানুষকে যেরূপ দায়ী করা হয়, আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি আর সে ভাবে তাকে দায়ী করিতে পারে না। কিন্তু যত-

ক্ষণ পূর্ণজ্ঞানের দ্বারা সকলের অজ্ঞান অন্তর্হিত না হয়, প্রচলিত ধরণে, দুর্জ্জনকে সাজা দেওয়া হয়, এবং সাধুকে পুরস্কৃত করা হয়। সৃষ্টি, অসংখ্য অবস্থা-সংযুক্ত একটি বিরাট প্রক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়, যার দ্বারা ব্রহ্ম তাঁর ইচ্ছা প্রকটিত করিতেছেন।

আত্ম-তত্ত্বে নীতির কল্পনা, মানুষের কার্য্যাবলী বিচারের এক নূতন নিরিখ প্রচার করিয়া, মানব জাতির মধ্যে নব জীবনের সঞ্চার করে। মানুষ আজীবন পাপের কল্পনার চাপে অভিভূত হইয়া দিন কাটায়, পাপ যেন তার পশ্চাতে দিবারাত্রি ছুটিতেছে, এক মুহূর্ত্তের জন্য তাকে নিশ্চিন্ত হইতে দেয না। মানুষ নিজেকে স্বভাবসিদ্ধ পাপী মনে করে, যেন তার পাপে জন্ম, পাপে বৃদ্ধি, এবং অবশেষে পাপে মৃত্যু হয়! আত্মতত্ত্ব জগৎ হইতে পাপ ও পাপী, দুষ্কর্ম্ম এবং দুষ্কৃতকারীকে, চিরকালের জন্য নির্ব্বাসিত করে। মানুষের আশে পাশে পাপ সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এই হীন কল্পনা চিরকালের জন্য মানুষের মন হইতে দূর করে। মঙ্গলময়ের সৃষ্টির মধ্যে পাপ থাকিতে পাবে না। জ্ঞানের বিকাশ, স্বল্প হইতে অধিক, অধিক হইতে অধিকতর, যথাক্রমে হইয়া থাকে, এবং ক্রমশ সব ভ্রান্ত ধারণাগুলি অদৃশ্য হয়। আত্মতত্ত্ব উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিতেছে, তুমি কে বুঝিয়া দেখ, আত্মজ্ঞান লাভ কর। উপলব্ধি কর, তুমি পাপী তাপী নও, তৎ ত্বং অসি, তুমি হইতেছ সেই ব্রহ্ম, যিনি মঙ্গলময়, কেননা তিনি জ্ঞানময়।

আমার ক্ষুদ্র জীবনীর পাঠক, তুমি কি বুঝিতে পারিয়াছ, এই আত্মতত্ত্ব মানবজাতির কি অপরিসীম উন্নতির সূচনা করিতেছে? ইহা যে নিত্য-সুখের পথ নির্দ্দেশ করিতেছে, তাহা কি বুঝিতে পারিয়াছ? আমাদের দুর্ভাগ্য, শঙ্কর এবং রামানুজ, সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের বশীভূত হইয়া, এ অমরত্বলাভের বাণী বিকৃত করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। মানুষের জীবন যথার্থই মহিমামণ্ডিত। অজ্ঞান দূর করিলে মানুষ দেখিবে, জীবন জ্যোতির্ম্ময় হইয়া রহিয়াছে। আত্মতত্ত্বে অনুপ্রাণিত হইলে, মানুষ আর মানুষকে পাপী মনে করিয়া ঘৃণা করিবে না, বদ্ধপরিকর হইয়া জগতে জ্ঞান বিস্তার করিতে চেষ্টা করিবে। একবার পাপ নাই প্রত্যয় হইলে, মানুষের নৈতিক এবং ধর্ম্মজীবন উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। মানুষ তখন বুঝিতে পারিবে, ব্রহ্মের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে থাকিয়া সে মহানন্দে জীবন অতিবাহিত করিতেছে। জগৎ-সৃষ্টি পাপে ডুবিয়া রহিল, আর ব্রহ্ম কোন এক দূর অচিন্তনীয় স্থানে আনন্দে

মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন, ইহা কখনই সত্য হইতে পারে না! আনন্দময়ের সৃষ্টিও আনন্দময়। সৃষ্টির সহিত তিনি সর্ব্বদা আনন্দে ভাসিতেছেন, তাই তিনি আনন্দময়। মানবজাতির চরম অবস্থা প্রাপ্ত হইতে এখনও অনেক সময় লাগিবে, কিন্তু একবার জীবাত্মা এবং পরমাত্মা অভিন্ন উপলব্ধি হইলে, জীবন উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর এবং পৃথিবী আনন্দের লীলাভূমি বলিয়া গণ্য হইবে।

আমার উপনিষদের বই, কেম্ব্রিজ্ লাইব্রেরির ডক্‌টর্ ই, জে, টোমাস্ পড়িয়া বলিয়াছেন, আমার গবেষণার পর, উপনিষদ্ নূতন করিয়া পড়িতে হইবে, এবং আধুনিক দার্শনিক চিন্তার সাহায্যে তার সারবত্তা নির্দ্ধারণ করিয়া, প্রাচীন ও নব্য ভাষ্যকারদের বুদ্ধিবৈকল্য হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। আমি বেশ জানি, দেশের দার্শনিকেরা, যাঁরা কেবল নামে দার্শনিক কিন্তু আসলে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের গোঁড়া, তাঁদের বিরুদ্ধে তীব্র মত প্রকাশের পর, আমার গবেষণা কিরূপ দৃষ্টিতে দেখিবেন। সত্যপ্রতিষ্ঠার জন্য, বিদেশী প্রাচ্য সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে কটাক্ষ করিতে ছাড়ি নাই, সেজন্য আমার প্রতি তাঁদেরও মনের ভাব বেশ অনুমান করিতে পারি। কিন্তু ইহাও বেশ জানি, উপনিষদের পঙ্কোদ্ধার করিয়া, আত্মতত্ত্ব বিজ্ঞান-সম্মত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত করিয়া, তাকে যেরূপ মহিমান্বিত করিলাম, তাহা এই প্রথম হইল। জগতে সত্যের প্রতিষ্ঠা হইতে চিরকালই সময় লাগিয়াছে, নিশ্চয়ই এক সময় আসিবে, যখন যার সূচনা করিয়া গেলাম, তাহা নির্ভীক সত্যসেবীদের যত্নে পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িবে।

(৩) হিন্দুর অবনতি

যখন পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে, লোকেরা ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিয়া কোন রকমে জীবন ধারণ করিত, তখন ভারত-ভূমিতে ঋষিরা এরূপ তত্ত্ব প্রচার করিলেন, যাহা চিরকালের জন্য মানবজীবনের গতি নির্ণয় করিবে, কিন্তু সেই পুণ্যভূমির অবস্থা দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! যে ভূমিতে ঋষিরা আনন্দকণ্ঠে প্রচার করিলেন, সর্ব্বভূতই আত্মার সঙ্গে এক ও অভিন্ন, সে দেশে ভেদজ্ঞানের তাণ্ডব নৃত্য চলিতেছে!' যে জাতি পৃথিবীর আদর্শ জাতি হইবার কথা, তার দিকে চাহিয়া এখন অন্য জাতির লোকেরা বিদ্রূপের

হাসি হাসিতেছে! যথার্থই আমরা আত্ম-বিস্মৃত জাতি। ঋষিদের সারবান উক্তিগুলি আমরা অতি যত্নে তুলিয়া রাখিয়াছি, মাঝে মাঝে কেবল বিদেশী-দের প্রশংসা কুড়াইবার জন্য বাহির করি! আমাদের জীবন বহুকাল পঙ্কিল হইয়া, জাতি অধঃপতনের দিকে দ্রুতগতিতে চলিয়াছে। স্বচ্ছ সত্যপথ, বুদ্ধির দোষে, আমবা বহুকাল পরিত্যাগ করিয়াছি। জাতির স্বল্প-সংখ্যক লোক, দীর্ঘকাল সমাজের উপব প্রভুত্ব করিয়া জন-প্রকৃতি হীন করিযা ফেলিয়াছে। ক্ষমতার আস্বাদ একবাব পাইলে, প্রভুত্বেব মোহজালে এক-বার জডাইয়া পডিলে, এই দেবতুল্য মানুষই দানবে পরিণত হয়। সব-দেশে, সব জাতির মধ্যে, এই ক্ষমতা-লোলুপ ক্ষুদ্র প্রভুর দল, সমাজের কণ্ঠ-রোধ করিয়া বাখিয়াছে। দৈবক্রমে এক প্রভুব দল বিতাডিত হইলে, অন্য প্রভুর দল বুকের উপর চাপিয়া বসে! তাহা না হইলে বুঝিতে পারা যায় না, কেন এই আত্ম-তত্ত্বের জন্মভূমিতে সকলেই ব্রাহ্মণ হইল না। যে কোন ব্রাহ্মণ পরিবারকে, শিক্ষা এবং সংস্কারের অভাবে, চণ্ডালের অবস্থা প্রাপ্ত হইতে, তিন জন্মের বেশি সময় লাগে না। উন্নতি অপেক্ষা অধোগতি শীঘ্র হয়, যদি ধরা যায়, কোনও অস্পর্শ্য পরিবারকে, শিক্ষা এবং সংস্কারের দ্বারা, সৎ ব্রাহ্মণের প্রকৃতি লাভ করিতে, কখনই ছয় জন্মের অধিক লাগা সম্ভব নয়। ভারতভূমির উপর দিয়া কতশত যুগ চলিয়া গিয়াছে, উচিত শিক্ষা এবং সংস্কারের দ্বারা সকলেই কি উচ্চ প্রকৃতি-সম্পন্ন হইতে পারিত না? আমি ব্রাহ্মণকে ঘৃণা করি না, সৎ ব্রাহ্মণের জীবন খুব বাঞ্ছনীয় মনে করি, কিন্তু আমি ঘৃণা করি মানুষের ঐ নীচ প্রকৃতিকে, যার বশীভূত হইয়া সে সকলকে একই ঊর্দ্ধদিকে উঠিতে দেয় না। অধিকারীভেদ, যে বচনের প্রসাদে, পীডন সংক্রামিক রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহা অত্যন্ত সারহীন। সৃষ্টির প্রথমে কে কত জিনিষের অধিকারী ছিল? লোক ঠকাইবার জন্য আর কতকাল বলা হইবে, ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে? আমাদের দেশের জ্ঞানী লোকেরা বলিয়াছেন, সকলে শূদ্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, সংস্কারের দ্বারা দ্বিজ হইয়া থাকে। এক সময়ে সকলেই বর্ব্বর ছিল। বর্ব্বর অবস্থা হইতে ব্রাহ্মণের অবস্থায় আসা যায়, কেবল শূদ্রের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় না? আমি ব্রাহ্মণকে অবনত করিতে চাই না, আমি চাই সকলকে ব্রাহ্মণ করিতে। যাহা ভাল, তাহা হইবার সকলের সমান অধিকার আছে। যে দেশে ব্রহ্ম, চেতন-অচেতন সব বস্তুর মধ্যে রহিয়াছেন, গগন

ভেদ করিয়া প্রচার করা হয়, সেই দেশে কিনা বর্ণ-বিভাগ চিরস্থায়ী হইল? বর্ণবিভাগ যখন সৃষ্টি করা হয়, তখন তার প্রয়োজন ছিল স্বীকার করিলেও, সে অবস্থা যে বহুকাল অতীত হইয়াছে কবে আমরা বুঝিব? আমি যদি কোন কারণে ইংরাজকে এদেশের রাজা হইয়া আরও এক হাজার বছর থাকিতে কামনা করি, তাহা এই জন্য যে, তারা ঐ দীর্ঘকাল থাকিয়া আমাদের নানাবিধ সঙ্কীর্ণতাকে যেন সম্পূর্ণভাবে গুঁড়া করিয়া দিয়া যায়। যতই কেন ঘোষণা করা হউক, ঈশ্বর এক শ্রেণীর লোকের দ্বারে বাঁধা, যতই কেন হাতে সোনার চাবি ধরিয়া কেহ বলুক, ঈশ্বরেব স্থানে প্রবেশ করিবার দ্বারের অধিকারী সে, তাঁর ভেদাভেদ বিচার নাই—তাঁর নিকট ছোপান কাপড়ের অপেক্ষা টুপির অধিক আদর নাই, কিংবা উপবীতশূন্য লোক অপেক্ষা উপবীতধারীর অধিক মূল্য নির্দ্ধারিত হয় না!!

জাতিভেদ যে হিন্দুদের অবনতির প্রধান কারণ, তার কি কোন সন্দেহ আছে? জাতিভেদ না থাকিলে হিন্দুরা কি এতকাল পরাধীন হইয়া থাকিত? যতদিন অন্য দেশের লোকেরা লোভের দৃষ্টিতে হিন্দুস্থানকে দেখে নাই, ততদিন জাতিভেদ লইয়া হিন্দুস্থান কোন রকমে স্বাধীন ছিল। লোভগ্রস্ত বিদেশীর প্রথম আক্রমণই হিন্দুস্থান সহ্য করিতে পারে নাই। একতার অভাব যে তার প্রধান কারণ, সে বিষয়ে কি বিন্দুমাত্র সন্দেহ আছে? একতার অভাব কেন হইল? আমাদের জাতি চারিটি নয়, আমাদের মধ্যে অসংখ্য জাতি আছে; প্রত্যেক বর্ণ, খুব কমে পঁচিশটি বিভাগের জন্মদান করিয়াছে! এই অসংখ্য জাতির মধ্যে একের সহিত অপরের সহানুভূতি নাই, একতা হইবে কি করিয়া? একতা ত আর শূন্য হইতে জন্মায় না! তার ভিত্তি বাস্তবের উপর, যার প্রাণ হইতেছে আন্তরিক সহানুভূতি। বাঙ্গালা দেশের ব্রাহ্মণ, পশ্চিম কিংবা দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মণ কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে না, কিংবা ঐ দেশের ব্রাহ্মণের সঙ্গে বসিয়া আহার করিবে না। সেইরূপ, মহারাষ্ট্র দেশের ব্রাহ্মণ, কাশ্মীর দেশের ব্রাহ্মণ-কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে না, কিংবা ঐ দেশের ব্রাহ্মণের সঙ্গে বসিয়া আহার করিবে না। শুধু কি তাই? ক্ষুদ্রতা দিন দিন অধিক ক্ষুদ্রতার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। প্রত্যেক বর্ণের যে সব বিভাগ আছে, তাদের মধ্যেও আদান প্রদান নাই। কন্যার বিবাহ হইলে, সে পর হইয়া যায়, তার পাকের অন্ন খাওয়া নিষেধ! আমার তখন কয়েক বছর বিবাহ হইয়াছে।

পুরী হইতে ফিরিয়া যাইবার পথে, আমার শ্বশুর ও শাশুড়ী কটকে নামিয়া আমাদের বাড়ীতে আসিলেন। আমার স্ত্রীর আহ্লাদের সীমা রহিল না, কিন্তু অন্ন পাক করিয়া পিতাকে আহার করাইবার অধিকার তার নাই, ঐ তৃপ্তি হইতে সে বঞ্চিত রহিল! পরিষ্কার এবং শুদ্ধভাবে পাক করার প্রয়োজন খুব বুঝি, সাত্বিক আহারের উপকারিতা খুবই জানি, কিন্তু ইহা বুঝিতে পারি না, নিকট আত্মীয়ের পক্বান্ন কি জন্য পরিত্যজ্য! বড় ফরাস্ বিছাইয়া ধনী মুসলমান আহারে বসিয়াছে; হাজার ক্রোশ দূর হইতে সম্পূর্ণ অপরিচিত একজন মুসলমান অতিথি আসিলে, তৎক্ষণাৎ সেই ধনী মুসলমান, অপরিচিত মুসলমান অতিথিকে পাশে বসাইয়া পান-ভোজনের দ্বারা পরিতৃপ্ত করাইবে! তাই যে কোন মুসলমান, অন্য একজন মুসলমানের জন্য, প্রয়োজন হইলে প্রাণ দিতে দ্বিধা করে না। তাই এক সময়ে আরব হইতে স্পেন্ পর্য্যন্ত মুসলমানদের জয়পতাকা উড়িয়াছিল, কিন্তু যখন হিন্দুর ধর্ম্ম ও দেশ বিপন্ন হইল, মুষ্টিমেয় শত্রুকে অসংখ্য হিন্দুরা তাড়াইয়া দিতে পারে নাই! সৌভাগ্যক্রমে, জাতিভেদ প্রথার মূল শিথিল হইতে আরম্ভ করিয়াছে। যাহা নিজেদের মধ্যে বুদ্ধি খাটাইয়া বহুকাল আগে করা উচিত ছিল, তাহা বিদেশী চাপের নীচে থাকিয়া সম্পন্ন হইতেছে। মনে হয় না যে আর বেশি দিন, মনুষ্যত্ব এবং আত্ম-সম্মান হারাইয়া, দেশের অসংখ্য লোককে দিন কাটাইতে হইবে।

জনসাধারণের জাগরণ সব দেশেই আরম্ভ হইয়াছে। যারা সমাজের মেরুদণ্ড অথচ পদদলিত হইয়া রহিয়াছে, তাদের চক্ষু ফুটিয়াছে। তারা বুঝিতে পারিয়াছে, যত বড় নির্য্যাতক হউক, তার দুই হাত এবং দুই পা'র অধিক অঙ্গ দেহে নাই! মানুষের বিরুদ্ধে মানুষ দাঁড়াইলে, মুষ্টিমেয় নির্য্যাতককে ভূমিতে লুটাইতে, চোখের পলক না ফেলিতে পারা যায়, তারা বেশ বুঝিয়াছে। অনেক দেশের রাষ্ট্রশাসন ওলট্-পালট্ হইয়া গিয়াছে। এই ব্যাপারের যেটা প্রধান মন্দ দিক, তার বিষ সমস্ত জগতে ছড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। যখন ধারাবাহিক উৎপীড়নের ফলে ঘোর সামাজিক বিপ্লব দেখা দেয়, নিগৃহীত লোকেরা কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়া নির্য্যাতকের সব অনুষ্ঠানই সমূলে উৎপাটন করে, মন্দের সহিত সামাজিক যাহা কিছু ভাল তাহাও উচ্ছেদ করিয়া ফেলে। লাঞ্ছনার তীব্র স্মৃতি মানুষের

সুবুদ্ধি নাশ করে। তাই এখন দেখিতে পাওয়া যায়, জগতের সকল স্থানে, নিগৃহীত লোকদের সুর একই ধরণে চড়ান, যাহা কিছু পুরাতন, সব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া রসাতলে দাও! পুরাতন মুছিয়া ফেল, জীবন নূতন করিয়া আরম্ভ কর! যাহা পুরাতন সবই খারাপ, পুরাতন একেবারে অন্তর্হিত না হইলে সুখশান্তির আশা নাই! আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকেরা, ধর্ম্মের নামে সামাজিক অত্যাচারে এরূপ জর্জ্জরিত, আমাদের যাহা কিছু পুরাতন সবই ঘৃণার চোখে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহা না হইলে কোটি কোটি তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতির লোকেরা বলিতেছে, হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ না করিলে আর সুখ-সম্মান নাই! তারা, পুরাতন ভাণ্ডারের মধ্যে, গুপ্তভাবে কোথায় আর্য্যচিন্তার মণি-মাণিক্য আছে, তার সংবাদ রাখে না। প্রচলিত ধর্ম্মের চাপে তাদের নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে, তারা চায নির্য্যাতন হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া স্বাধীনতার বায়ু সেবন করিতে।

ইহা ত আমাদের সমাজের নিগৃহীত লোকদের অবস্থা। আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অবস্থাও কম শোচনীয় নয়। আমাদের সময়ে, অবস্থা তত খারাপ হয় নাই, কারণ তখনও পুরাতনের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় নাই। প্রচলিত ধর্ম্ম, ভাল বা মন্দ যাহা ছিল, তার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া আমরা জীবন আরম্ভ করিয়াছি। পুরাতন যাহা কিছু ত্যাগ করিয়াছি, তাহা সজ্ঞানে, ইচ্ছা করিয়া। কিন্তু তারপর এই চল্লিশ বছরের মধ্যে ঘোর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। শিক্ষার সহিত ধর্ম্মের কোন সংস্রব নাই, কোন প্রকারে বিলাতী নীতির সহিত যাহা কিছু সম্বন্ধ বজায় আছে! এরূপ অবস্থায় যাহা হইয়া থাকে, তাহাই হইয়াছে। হিন্দু শিক্ষিত লোকেরা একরূপ ধর্ম্মশূন্য হইয়া দিন কাটাইতেছে। তবে কিছুদিন স্রোতটা অল্প ফিরিতে আরম্ভ করিয়াছে। দেশের প্রতি প্রীতি বর্দ্ধনের সহিত, ধর্ম্মের পুনরালোচনা আরম্ভ হইয়াছে। আমি এখানে সমাজের সেই অতি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের কথা ধরিতেছি না, যাদের শাস্ত্র বা ধর্ম্মালোচনা একরূপ ব্যবসায়। তারা ধিকি ধিকি ভাবে বরাবরই আছে। আমি আমাদের আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া কথাগুলি বলিতেছি। আমাদের শিক্ষিত লোকদের মধ্যে জন-কয়েকের দৃষ্টি যে স্বধর্ম্মের উপর পড়িয়াছে, ইহা মন্দের ভাল। কিন্তু দিক্‌ভুল করিয়া কাজ্‌টা আরম্ভ হইয়াছে।

যে ছাঁচে আমাদের দেশের ধর্ম্ম প্রস্তুত হইয়া বহুকাল চলিয়া

আসিতেছে, যখনই আমাদের ধর্ম্মের উপর টান পড়ে, টানটা সেই ছাঁচের মধ্যে পড়িয়া পাক খায়। এই অবতার-প্রধান দেশে, সাধু চরিত্রের লোককে, সাধু থাকিয়া দিন কাটাইতে, লোকেরা দেয় না। কেহ বেশি লোকের প্রিয় হইলে, তাকে হয় ষোল আনা, না হয় চারি আনা আন্দাজ অবতার করিয়া তোলে! ইহার প্রধান উদ্দেশ্য, বংশ পরম্পরায়, আমাদের রক্ত-মাংসের সঙ্গে অবতারের প্রতি যে টান জড়ান রহিয়াছে, সেই দুর্ব্বলতার সাহায্যে একটা দল পাকান! একটা দল খাড়া করিতে পারিলে, অনেক সুবিধা আছে, এবং ঐ দল যদি সময়ে প্রচলিত বিশ্বাসের সাহায্যে বেশ পরিপুষ্টি লাভ করে, সুবিধা-সুযোগের মাত্রা বাড়িয়া উঠে! আমার তত্ত্বানুরাগ এবং খোলা মন দেখিয়া, একজন বাল্য-বন্ধু ঐরূপ একটি দলের মধ্যে আমাকে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিয়াছিল। আমার বন্ধু যে ঐ দলের একজন চাঁই, বেশ জানিতাম, এবং তার অভিপ্রায়ও বুঝিলাম, কিন্তু আমি যে তার উদ্দেশ্য বুঝিয়াছি, তাকে জানিতে দিলাম না। বন্ধুর পক্ষ হইতে চেষ্টার পালা কিছুকাল চলিবার পর, যখন দেখিলাম, যে সাধুকে লইয়া দল পাকান হইয়াছে, তাঁকে হঠাৎ ভগবানের আসনে বসান হইল, আমি তখন দড়ি ছিঁড়িলাম, বন্ধুর দিক আর মাড়াইলাম না। সেই সাধুর কোন অপরাধ নাই, তিনি অনেক দিন দেহত্যাগ করিয়াছেন, এবং যদি পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিতেন, লোকেরা তাঁকে কিরূপ করিয়া তুলিয়াছে, আমার বিশ্বাস তিনি সকলের অপেক্ষা বেশি মনে কষ্ট পাইতেন, এবং এই হতভাগ্য দেশের অবস্থা চিন্তা করিয়া হতাশ হইয়া পড়িতেন।

আমার জীবনে, কয়েকজন লোককে সাধুশ্রেণী হইতে তুলিয়া লইয়া ভগবানের আসনে বসাইতে দেখিয়াছি। আমি সাধুকে উচিত সম্মান দেখাইবার পক্ষে মোটে বাধা দিতে ইচ্ছা করি না, আমি ঘোর আপত্তি করি, পরমবস্তু সম্বন্ধে ঐরূপ হীন এবং উচ্ছৃঙ্খল কল্পনা করা। কোন মানুষকে বড় করিতে গিয়া, পরমবস্তু সম্বন্ধে অপকৃষ্ট ধারণা করার আমি অত্যন্ত বিরোধী। ঐরূপ করিয়া মূলবস্তু সম্বন্ধে ধারণা আমরা এত ক্ষুণ্ণ করিয়া ফেলিয়াছি, ভগবানকে মানুষের রূপ ধরিয়া হাটে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইতে লোকেরা দেখিয়া থাকে! অতি-বিশ্বাসের মাত্রা এরূপ দাঁড়াইয়াছে, অনন্য-সাধারণ কিছু দেখিলেই লোকদের মাথা ঘুরিয়া যায়, সুচিন্তার পথ রোধ হইয়া আসে।

আমি কখন ঐরূপ একটা দলের মধ্যে ঢুকিয়া চিন্তার স্বাধীনতাকে বিনাশ

করি নাই। দল গড়িয়া তোলার প্রণালী বেশ বুঝি। এখনকার প্রচার-বহুল দিনে, দল পুষ্টি করার সুবিধা খুবই হইয়াছে। দল-পুষ্টি করার জন্য দুটি জিনিষের দরকার : জনকয়েক নাম্‌জাদা লোকের আনুকূল্য, এবং অর্থ। কোন অনুষ্ঠানের সহিত, যাদের আমরা খ্যাতনামা লোক মনে করি, সেরূপ কয়েকজনের সহানুভূতি আছে, এবং অর্থসাহায্য আসিতেছে, যদি দেখিতে পাই, তার সম্বন্ধে আমাদের ধারণা উঁচু হইয়া উঠে, এবং দিন দিন প্রচারের চটকে দলটি যদি বেশ জাঁকাইয়া রাখা হয়, তার সম্বন্ধে আমাদের স্থায়ী শ্রদ্ধা-যুক্ত ধারণা না হইয়া যায় না। নাম্‌জাদা লোক হইলে, সে যে একজন অসাধারণ বিজ্ঞ লোক, ধরিয়া লওয়া, জনসাধারণের একটা বড ভ্রান্ত ধারণা আছে। রাজনীতিক ক্ষেত্রে নাম করিতে পারিলে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে তার মত অতুলনীয়, এ ধারণা যেরূপ ভ্রান্ত, ভাল উপন্যাসলেখক কিংবা সাহিত্যিক হইলে, নীতিবিজ্ঞান সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতা অপরিসীম, এ ধারণাও সেইরূপ ভ্রান্ত। সাধারণ লোকের চোখে কোন একটা কারণে যারা বড় হইয়া উঠিয়াছে, তারা জনপ্রিয়তা বজায় রাখিবার জন্য, আনুকূল্য বিতরণের জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত, একটি তেলেব প্রশংসাপত্র দেওয়া হইতে, কোন নূতন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠ-পোষকতা করা পর্য্যন্ত! সেজন্য কোন একটি নূতন অনুষ্ঠানের স্বপক্ষে, নাম্‌জাদা লোকের দু'একজনকে ধরা মোটেই শক্ত কাজ নয়। লক্ষ্মী এবং সরস্বতীয় কলহ চিরপ্রসিদ্ধ। ধনবান হইলে গুণবান কিংবা গুণগ্রাহী হইতে হইবে, বিধির এরূপ কোন অলঙ্ঘনীয় নিয়ম ত নাই, সচরাচর তার বিপরীত দেখা যায়। কারবার করিয়া টাকা জমাইয়াছে, কিংবা অর্থশালী লোকের গৃহে জন্মিয়া বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছে, অথবা অন্য কোন কারণে, বহু অর্থ হাতে আসিয়া জমিয়াছে, কিন্তু বিদ্যার ভাণ্ড শূন্য, সেরূপ লোকের অভাব কোন দেশেই নাই। ঐরূপ দু'একজন লোককে, খ্যাতনামা লোকের আনুকূল্যে চরিতার্থ কোন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে টানিয়া আনিতে, অসাধ্যসাধন করিতে হয় না। তাহা ছাড়া, সাধারণ মানুষের মন এত দুর্ব্বল, একটা দলের মধ্যে গিয়া না পড়িলে, সে মনে বল পায় না—দলের বল হইতে বল সংগ্রহ করিয়া সে দুর্ব্বল মনকে বলযুক্ত করিতে চেষ্টা করে! তাই দেখিতে পাওয়া যায়, পসারওয়ালা দলের পসার অধিক বাড়িতেছে। একবার দলের ভিতর গিয়া পড়িলে, দলের চক্র এরূপ, স্বাধীন চিন্তা চিরকালের জন্য বিসর্জ্জন দিতে হয়। জ্ঞানের ক্ষেত্রে দলাদলি নাই।

জ্ঞানপিপাসু লোক, যত বড় বিখ্যাত লোকের মত হউক, সত্য-বিবর্জ্জিত হইলে, কখনই গ্রহণ করিয়া ধন্য হয় না।

যখন দেশের শিক্ষিত লোকদের দলের পাকে পড়িতে দেখি, তখন যথার্থই হৃদয়ে কষ্ট অনুভব করি। আমাদের শাস্ত্রানুরাগের নব জাগরণের দিনে, সরল চির-সত্যের পথে না গিয়া, ক্ষুদ্র সম্প্রদায়-ভুক্ত হইয়া শিক্ষিত লোকেরা মনে করে তাদের উদ্দেশ্য সাধন হইতেছে, ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। তার কারণও বেশ বুঝিতে পারে। আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীর দোষে, দেশের জ্ঞান-শাস্ত্রের সহিত সম্পর্কশূন্য হইয়া দিন কাটাইয়া, লোকেরা জানে না, কোথায় আমাদের সঞ্চিত অমূল্য রত্নরাজি আছে। নূতন অনুরাগের বশীভূত হইয়া, চিত্তাকর্ষক যাহা সম্মুখে পায় গ্রহণ করিয়া, আসল বস্তু পাইয়াছে মনে করে! কলিকাতার একজন বড় উকিল, যিনি মাসে দশহাজার টাকা রোজগার করিতেন, এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দ্বারা সকলকে চমৎকৃত করিতেন, বেশি বয়সে হিন্দু ধর্ম্মানুরাগী হইয়া, একটি সাধুর সংসর্গে আসিলেন। সাধু, সাধারণ যোগীদের ন্যায়, কয়েকটি ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। উকিল বাবু বড় জোর পতঞ্জলির নাম শুনিয়াছিলেন, বিভূতিপাদের কোন সংবাদই রাখিতেন না। তিনি সাধুর কয়েকটি ক্ষমতা দেখিয়া, একেবারে লুটাইয়া পড়িলেন। তাঁর জীবতাবস্থায়, তাঁর একজন উকিল আত্মীয় এবং আমি, তাঁর মানসিক অবস্থার আলোচনা অনেক সময়ে করিতাম। তাঁর বুদ্ধি যেরূপ প্রখর ছিল, যদি তিনি যোগশাস্ত্র একবার পড়িতেন, সাধুর সম্বন্ধে উচিত ধারণা করিতে তাঁর বেশি সময় লাগিত না। কিন্তু ঐ সামান্য জ্ঞানের অভাবে, সাধুর অনুগ্রহ লাভ করিয়া, চরিতার্থ হইয়া, জীবনের শেষভাগ কাটাইয়াছিলেন।

অনুগ্রহলাভ! আমাদের জ্ঞান-শাস্ত্রের কোন সংবাদ না রাখার পর, ঐ অনুগ্রহ-লাভ হইতেছে আর একটি কারণ, যার জন্য আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেককে দেখিতে পাই সাধুদের সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ায়। ধর্ম্ম করিতে গিয়া যদি অনুগ্রহলাভের আশা না থাকিত, পনর আনা সাড়ে তিন পাই লোক প্রচলিত ধর্ম্মপথ মাড়াইত না। উড়িষ্যার একজন কৃতী সন্তান, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ভাল ছাত্র, বড় সরকারি চাকরি করিয়া উপাধিও পাইয়াছেন এবং সকলের নিকট পরম বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত, একদিন জগন্নাথ দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিবার সময়ে, একজন বিষ্ণুভক্ত

বন্ধুর নিকট দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "জগন্নাথের নিকট প্রত্যহ ত যাইতেছি, কই আমার অবস্থার উপর এখনও ত তাঁর দৃষ্টি পড়িল না!" তাঁর আর্থিক অবস্থা আগেকার অপেক্ষা তখন খারাপ হইয়াছিল। কেবল তিনি কেন, কে এমন আছে, দেবস্থানে গিয়া থাকে, কিংবা উপাসনা করিতে বসে, হৃদয়ে অভিলাষ না লইয়া, যাহা দেব অনুগ্রহে পূর্ণ হইবে, সে কামনা করে না? ক্ষমতাপন্ন একজন সাধুর কথা প্রচার হইলে, তাঁর শিষ্য হইবার জন্য হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায়! আমার একজন বন্ধু, ঐরূপ একজন সাধুর ঝাঁ করিয়া শিষ্য হইয়া পড়িল। প্রথম কিছুদিন খুব হাঁটাহাঁটি করিয়া গুরুর অনুগ্রহলাভের চেষ্টা করিল। অনুগ্রহলাভের মানে, বলা দরকার করে না যে, ভাল একটি চাকরি লাভ, চাকরি থাকিলে তাহাতে উন্নতি, অন্য কোন উপায়ে অর্থলাভ, সাংসারিক স্বচ্ছন্দতা, কিংবা কোন রোগ হইতে মুক্তি, ইত্যাদি। আমার বন্ধুটি সময়ের অপব্যবহারের একেবারে পক্ষপাতী নয়। কিছু সময় ঘোরার পর, যখন দেখিল গুরুর অনুগ্রহলাভ শীঘ্র হইতেছে না, সে যাওয়া আসা খুবই কমাইয়া দিল, এবং পরে কেবল সম্বন্ধটা বজায় রাখিয়াছিল! সকলে কিন্তু আমার ঐ বন্ধুর মত নয়। অনেকে ধৈর্য্য শীঘ্র হারায় না। দীর্ঘকালের মধ্যে, এমনিই মানুষের অবস্থা অনেক সময়ে পরিবর্ত্তন হয়। অবস্থা ভালর দিকে গেলে, তারা মনে করে অনুগ্রহ-লাভ হইয়াছে! কোন পরিবর্ত্তন না হইলে কিংবা মন্দের দিকে গেলে, আমাদের দেশের প্রচলিত সান্ত্বনা বাক্য, বরাত খারাপ বলিয়া শান্তিলাভ করিতে চেষ্টা করে!

যদিও আমাদের দেশে এক সময়ে যোগীর সংখ্যা খুব বেশি ছিল, এবং এখনও জনকয়েক যোগী দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাদের মধ্যে জ্ঞানী লোকের সংখ্যা খুবই কম। যোগ একটি প্রক্রিয়া বা প্রণালী, যার দ্বারা পূর্ণ একাগ্রতা লাভ করা যায়। যোগ প্রক্রিয়াকে আমি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সহিত তুলনা করিয়াছি। যোগ একটি মহান ক্ষমতাশালী যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। কিরূপে, কি উদ্দেশ্যে, তাকে ব্যবহার করিতে হইবে, সে জ্ঞান না থাকিলে, ঐ প্রক্রিয়ার দ্বারা বিক্ষুব্ধ চিত্তকে শান্ত করা ছাড়া আর কোন ফল হয় না—যেরূপ, ক্ষমতাশালী দূরবীণের দ্বারা, সৌরজগতের জ্ঞানবিহীন ব্যক্তির জ্ঞানের সীমা কিছুমাত্র বাড়ে না। আমাদের দেশের তত্ত্বজ্ঞান বিহীন যোগীদের অবস্থা ঠিক ঐরূপ। তারা যোগ-প্রক্রিয়ার দ্বারা কেবল

কয়েকটি ক্ষমতার অধিকারী হয়, কিন্তু পরমবস্তু সম্বন্ধে তাদের ধারণা অত্যন্ত আদিকালিক। পাখীর মত, তত্ত্ববিষয় সম্বন্ধে চলিত গোটা কয়েক কথা অভ্যাস করিয়া এবং কয়েকটি ক্ষমতার অধিকারী হইয়া মনে করে, তাদের ইষ্ট সাধন হইয়াছে!

চিত্তবিজ্ঞান সম্বন্ধে এই শ্রেণীর লোকদের জ্ঞান অতিশয় কম। মনস্তত্ত্ব এবং আত্মিক ক্রিয়ার নানাবিধ গবেষণার কোন সংবাদ তারা রাখে না। যদি রাখিত, পদে পদে ভ্রমে পড়িয়া, কতগুলি মিথ্যা ধারণাকে প্রত্যক্ষ-সত্য ধরিয়া লইত না, কিংবা অপরকে তাহা গ্রহণ করিতে প্ররোচিত করিত না। আত্ম-সম্মোহনের দ্বারা মানুষ যে নিত্য কতশত মিথ্যা কল্পনাকে সত্য মনে করিয়া থাকে, সে সম্বন্ধে ইহাদের কোন জ্ঞান নাই। যেরূপ কোন ব্যক্তি অপরকে সম্মোহনের দ্বারা বশীভূত করিয়া কতগুলি মিথ্যা ধারণা তার মনে জন্মাইয়া থাকে, সেইরূপ মানুষ কোন একটা ধারণার অত্যন্ত বশীভূত হইয়া পড়িলে, নিজের ধারণার দ্বারা সম্মোহিত হইয়া, বাঞ্ছিত কতগুলি মিথ্যা রূপ দেখিয়া থাকে! তাহা দেখিয়া সে মনে করে, তার অভীষ্ট দেবতা কিংবা বাঞ্ছিত কোন ব্যক্তি আসিয়া দেখা দিয়াছে। ঐ সব অলীক মূর্ত্তি দেখিয়া, তার দৃঢ় প্রত্যয় হয় যে, সে উন্নতির চরমমার্গে উঠিয়াছে এবং পরমবস্তুর সাক্ষাৎলাভ করিয়াছে! নিজে ভ্রমে পড়িয়া দিন কাটায়, এবং অপরকে ভ্রান্তির পথে লইয়া যায়।

আত্মতত্ত্ব এরূপ গভীর এবং এত অধিক চিন্তা ও জ্ঞানের বস্তু, কেবল আসনে বসিয়া কয়েকটি বিষয় দিবারাত্রি চিন্তা করিলে, তাহা আয়ত্ত করা যায় না। যার মন অত্যন্ত উদার এবং প্রশস্ত নয়, যার বিবেক সর্ব্বতোমুখী নয়, যে সর্ব্ববিধ জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের সত্য আয়ত্ত করে নাই, সে কখনই আত্মতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না। কেবল সংযম অভ্যাস করিলে আত্মজ্ঞানী হওয়া যায় না। সরল চিত্তের অধিকারী, সংযমী, এবং বিশ্বাস-প্রবণ হইলে, ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া মনে শান্তি পাওয়া যায়, কিন্তু ঐ সম্বল লইয়া আত্মজ্ঞানী হওয়া যায় না। আমি তার একটি দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি। ষোল বছর পূর্ব্বে, আমি কাশীধামে কিছুদিন ছিলাম। হাইকোর্টের আমার একজন শ্রদ্ধেয় উকিল বন্ধু, যিনি ইহজগত হইতে বিদায় লইয়াছেন, আমি সাধুসন্ন্যাসীদের সঙ্গ ভালবাসি জানিয়া, কাশীর একটি সন্ন্যাসীর সহিত আমার আলাপ করাইয়া দিলেন। ঐ সন্ন্যাসীর বয়স তখন নব্বুই বছর।

তাঁর তখন ত্রিশ বছর কাশীবাস করা হইয়াছে। দিনের অনেক সময় তিনি ধ্যানে বসিয়া কাটাইতেন। অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা স্থাপন হইল। আমি তাঁকে 'দাদা' বলিয়া সম্বোধন করিলাম, তিনিও আমাকে ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ করিতে লাগিলেন। আমি যে আত্মতত্ত্ব লইয়া দিবারাত্রি কাটাই, তাঁকে প্রথম বলি নাই, তাঁর ভক্তির অঙ্গের কথা খুব মন দিয়া শুনিতাম। যোগাভ্যাসের দ্বারা তাঁর কিরূপ উন্নতি হইয়াছে, অকপটচিত্তে আমাকে বলিলেন, এবং উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে তাঁর পরমারাধ্য বস্তু দেখিয়াছেন, তাহাও বলিলেন। মাঝে মাঝে আমাকে বলিতেন, আমি ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, আমাকে পরমবস্তু পাইবার পথ বলিয়া দিবেন। আমি তাঁর কথার উত্তরে বেশি কিছু বলিতাম না, কিংবা তিনি মনে কষ্ট পান, সেরূপ কোন কথা বলিতাম না। আমি প্রায় প্রত্যহ কিছু সময় তাঁর সঙ্গে কাটাইয়া আসিতাম। একদিন কিছু শীঘ্র গিয়া পৌছিলাম। সেদিন খুব সম্ভব পূর্ণিমা। কিছুক্ষণ তাঁর সঙ্গে কাটাইবার পর, সন্ধ্যা হইল। আকাশ নির্ম্মল, চাঁদের আলোকে সমস্ত দিক প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, ঐ সঙ্গে আমার হৃদয়ও উৎফুল্ল হইল। যাহা সমস্ত সময় আলোচনা করি, তাহা সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর সম্মুখে সব সময়ে চাপিয়া রাখা যায় না। আমি আত্ম-তত্ত্বের দু'একটা কথা বলিলাম। সন্ন্যাসী শুনিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন। তাঁর আহ্লাদ দেখিয়া আমার উৎসাহ বাড়িল। আমি একজন যোগ্য শ্রোতা পাইয়া, অতি আনন্দে আত্মতত্ত্ব সন্ন্যাসীর নিকট উন্মুক্ত করিলাম। তিনি তন্ময় হইয়া শুনিলেন, এবং মাঝে মাঝে বলিলেন, "কি মধুর কথা তুমি আমাকে শোনাচ্ছ!" অবশেষে বলিলেন, "আমি ত্রিশ বছর কাশীধামে কাটিয়েচি, আমাকে কেউ এরূপভাবে এ সব কথা শোনায়নি।" সেদিন হৃষ্ট-চিত্তে অধিক রাত্রে বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিন সন্ন্যাসীর নিকট উপস্থিত হইলাম, ভাবিলাম সেদিনও ঐরূপ অনেক কথা হইবে। দেখিলাম, তাঁর ভাব অত্যন্ত গম্ভীর, গম্ভীর ভাবে আমাকে একখানি কুশাসন দিয়া বলিলেন, "সুরেশ বাবু, বসুন।" তিনি আমাকে ভায়া সম্বোধন করিতেন, আমি তাঁর ব্যবহারে কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম।

বসিবার পর সন্ন্যাসী খুব গম্ভীর অথচ সরলভাবে বলিলেন, "আমি গোঁপ-দাড়ি কামান লোকদের বরাবরই খুব সন্দেহের চোখে দেখি।"

সন্ন্যাসীর দেহ খুব দীর্ঘ, বয়সের জন্য এবং যোগ করিয়া, তাহা অত্যন্ত শীর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু তার শোভা বাড়াইয়া লম্বা পাকা দাড়ি ছিল। আমার গোঁপ-দাড়ি কামান। আমি অবাক হইয়া তাঁর কথাগুলি শুনিলাম, এবং কি অপরাধ করিয়াছি, জানিতে চাহিলাম।

সন্ন্যাসী বলিলেন, "কাল আপনি আমার মনের ভিতর কি তুফান তুলে দিয়ে গেছেন, আমি সমস্ত রাত্রি ঘুমুতে পারিনি।"

আমি একমুহূর্ত্তে অবস্থাটা বেশ বুঝিতে পারিলাম। তিনি মাতৃমূর্ত্তি কল্পনা করিয়া সাধনা করিতেন, ভক্তিতে হৃদয় সর্ব্বদা পূর্ণ থাকিত, জগন্মাতাকে ভক্তির অঞ্জলি দিয়া মনে শান্তিলাভ করিতেন। আমি ধীরে ধীরে, কথার প্রভাবে, জীবের স্বতন্ত্র কায়া পরিত্যাগ করাইযা, ব্রহ্মময় সৃষ্টির মধ্যে তাঁকে লইয়া গিয়াছিলাম। একাগ্রচিত্তে কথাগুলি শুনিযা, অন্তরস্থ আত্মার স্বরূপ মুহূর্ত্তের জন্য দেখিয়া মহানন্দে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। আমি চলিয়া আসিবার পর, তাঁর দীর্ঘকালের বিশ্বাস আমার বর্ণিত আত্মতত্ত্বের বিরুদ্ধে আসিয়া দাঁড়াইল। মনের মধ্যে ঝড় বহিতে লাগিল। আমার উপর তিনি বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।

যথাসাধ্য আমার ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া, যেরূপ ধীরে ধীরে তাঁকে ভক্তির স্তর হইতে তৎত্বমসির মহানন্দের মধ্যে লইয়া গিয়াছিলাম, পুনরায় ধীরে ধীরে, আত্মতত্ত্বের সহিত ভক্তির সম্বন্ধের আলোচনা করিয়া, তাঁর চিরাভ্যস্ত ভক্তি প্রসূত আনন্দে বিভোর করিয়া দিলাম। পূর্ব্বদিন রাত্রে যেরূপ একাগ্রচিত্রে আমার কথাগুলি শুনিয়াছিলেন, সেইরূপ নিবিষ্ট মনে, ঐ কথাগুলিও শুনিলেন। দেখিতে দেখিতে সন্ন্যাসীর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। হাস্যবদনে আমাকে বলিলেন, "সুরেশ ভায়া, তুমি আমার ওপর রাগ করনি ত?" তাঁর আগেকার মনের ভাব ফিরিয়া আসিল, আমি আর কখন আত্ম-তত্ত্বের কথা তাঁর নিকট তুলি নাই।

ঐ সময়ে, কাশীধামে, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক, মহামহোপাধ্যায় অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণির সঙ্গে কিছু ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। তিনি সাঙ্খ্যদর্শনের টীকা লিখিতেছিলেন, আমরা মাঝে মাঝে তত্ত্ববিষয়ের আলোচনা করিতাম। একদিন তাঁর বাড়িতে গিয়াছি, কয়েকটি কথার পর তিনি বলিলেন, "চলুন, গঙ্গাবক্ষে একজন সাধু এসেছেন, তাঁকে দেখে আসি।" অন্য কয়েকজন পণ্ডিত আসিয়াছিলেন, তাঁরাও ঐ সাধুকে দেখিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

আমি অন্নদাচরণকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "সাধুর সম্বন্ধে কোন সংবাদ পেয়েছেন—তিনি কি খুব জ্ঞানী ?"

অন্নদাচরণ উত্তর করিলেন, "তাঁর জ্ঞানের কথা কিছুই শুনিনি, তবে তিনি দিবারাত্রি আশ্রয়-শূন্য অবস্থায় গঙ্গাবক্ষে স্বচ্ছন্দে সময় কাটিয়ে থাকেন।"

আমি অল্প হাসিয়া বলিলাম, "তবে, একজন শারীরিক কষ্ট-সহিষ্ণু লোককে দেখ্‌বার প্রস্তাব কচ্চেন ?"

আমার কথা শুনিয়া, তিনিও অল্প হাসিয়া বলিলেন, "আপনি ঠিক্ বলেছেন, আমি ঐ সাধুকে দেখতে যেতে ইচ্ছা করিনে।"

কষ্ট-সহিষ্ণু হইলে, কিংবা কিছু ক্ষমতা থাকিলে, নিশ্চয়ই জ্ঞানী ধরিয়া লওয়া, অন্যের পক্ষে যাহা হউক, শিক্ষিত লোকের পক্ষে একটি অমার্জ্জনীয় ভুল। তারপর, অনুগ্রহ লাভের আশায় ঘুরিয়া বেড়াইয়া ধর্ম্মাচরণ করা হইতেছে মনে করা, আরও একটি বিষম ভুল। যারা মনে করে, শত শত ইচ্ছা, বিভিন্নভাবে সৃষ্টির মধ্যে কাজ করিতেছে, তারা খুবই ভ্রান্ত। পরম বস্তুর ইচ্ছাই নিয়ম, সে নিয়ম নিশ্চয়ই মঙ্গলময়, তাহা পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হয় না, কারণ তাহা পূর্ণজ্ঞান হইতে প্রসূত, শিক্ষিত ব্যক্তি যদি ইহা সর্ব্ব-প্রথম বুঝিতে চেষ্টা না করে, ধর্ম্মপথে যাইবার আকাঙ্ক্ষা তার পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র। কামনা পরিত্যাগে যে অপরিসীম আনন্দ, তার আস্বাদ যে পায় নাই, ধর্ম্মাচরণের মর্ম্ম সে কখনই বুঝিতে পারিবে না।

আমার "দেবনাথ" উপন্যাসের শেষ অংশে, দেবনাথের পিতা শিবনাথ, আমারই অন্তরের কথা অত্যন্ত দুঃখে বলিয়াছে: "আমার ধারণা বদ্ধমূল, হিন্দুর অবনতি, তাহার বিশুদ্ধ শাস্ত্রের সহিত সংসর্গ ত্যাগ হেতু ঘটিয়াছে। কালের গুণে শাস্ত্রের রাশিও এত জমিয়াছে, দৈবাৎ কাহারও শাস্ত্রে অনুরাগ জন্মিলে, তাহাকে দিশেহারা হইতে হয়। নির্ম্মল, উজ্জ্বল, সর্ব্বব্যাপী, অথচ অতি সহজবোধ্য চিন্তাগুলি যেখানে নিহিত আছে, সেদিকে কাহারও চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। কেবল ক্ষুদ্র চিন্তা এবং বিতণ্ডার জালে আবদ্ধ হইয়া, অবশেষে চরিতামৃত কিংবা কথামৃতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে।"

যে উপনিষদ পড়িয়া জার্ম্মান্ দেশের প্রসিদ্ধ দার্শনিক সোপেন্‌হর্ বলিয়াছেন, "ভারতবর্ষে আমাদের ধর্ম্ম কখনই স্থায়ী হইবে না * * * আর্য্যদের জ্ঞান ইয়োরোপ প্লাবিত করিয়া, আমাদের চিন্তা ও জ্ঞানের আমূল পরিবর্ত্তন করিবে," তার চর্চ্চা এবং আদর আমরা কবে করিতে শিখিব ?

নবম পরিচ্ছেদ

পারিবারিক জীবন

তত্ত্বালোচনার চূড়ান্ত করিলাম, মৃত্যু নিকট হইয়া আসিল, অথচ একটি বিষয়েব আক্ষেপ গেল না—যাহা ভাল কিংবা মন্দ, তাহা অল্পবয়সে কেহ বুঝাইয়া দেয় নাই কেন! যথার্থ শিক্ষা হইয়া থাকে, যতদিন তাঁরা বাঁচিয়া থাকেন, পিতামাতার নিকট। বালক-বালিকার কোমল হাত দুখানি ধরিয়া, তাদের আকাশের মত নির্ম্মল চোখের দিকে চাহিয়া, দেবতুল্য পিতা কিংবা স্নেহময়ী মাতা যাহা বলেন, সংসারের অনেক ঝটিকা মাথার উপর দিয়া বহিয়া গেলেও, কেহ তাহা একেবারে ভুলিতে পারে না। প্রকৃতি যেরূপ হউক, ভাল-মন্দ কাজ জীবনে যাহাই করুক, সে কথাগুলি হৃদয়ে সব সময়ে প্রতিধ্বনিত হয়। আর শিখা যায়, চরিত্রবান শিক্ষকের নিকট। আমাদের দেশের আধুনিক শিক্ষকদের দুরাবস্থার কথা বলিয়াছি। অধিক বয়সে, সৎসঙ্গে মিশিয়া আত্মোন্নতি করিবার সুযোগ খুব কম লোকের ভাগ্যে ঘটে। কোমল বয়সে কোন জিনিষের প্রতিকৃতি চিত্তেব উপর যেরূপ আজীবন মুদ্রিত হইয়া থাকে, অন্য কোন বয়সে তাহা হয় না। সব ছাড়িয়া দিয়া, দু'টি জিনিষ, যাহা পরস্পরের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং মনুষ্যত্বের মূলে রহিয়াছে, আত্মনির্ভরতা এবং আত্ম-সম্মান জ্ঞান, যদি প্রত্যেক বালককে শিখান যায়, জীবনসংগ্রামের মীমাংসা অনেক পরিমাণে হইয়া আসে। যে নিজের উপর নির্ভর করিবার মন্ত্রে দীক্ষিত এবং আত্ম-সম্মানের মর্য্যাদা বুঝিয়াছে, জীবনে তার উন্নতি নিশ্চয়ই হইয়া থাকে।

কর্ম্মক্ষেত্রে স্বার্থের মোহে পড়িয়া যাহা করি না কেন, অল্পবয়সে আত্ম-মর্য্যাদা-জ্ঞান ফুটিয়া উঠিতে চেষ্টা করিয়াছিল। পিতা কোর্ট হইতে আসিলে, আমার ভাই বোনেরা ছুটিয়া গিয়া তাঁকে ঘিরিয়া পয়সা চাহিত। ঐরূপ-ভাবে পয়সা চাইবার বয়স আমার খুবই ছিল, আমি কিন্তু চাহিতাম না। পিতা তাদের পয়সা দিয়া, আমার কাছে আসিয়া আমাকে পয়সা দিতেন। পয়সা পাইয়া, ভাই-বোনদের অপেক্ষা কোন অংশে আমার আহ্লাদ কম

হইত না। আহারের জিনিষ সম্বন্ধেও আমার মনের ভাব ঐরূপ ছিল, খুব বেশি লোভ না হইলে, কোন আহারের দ্রব্য কখন চাহিয়া লইতাম না।

উনিশ বছর বয়সের একটি ঘটনা ভুলিতে পারি নাই। ঐ বয়সেও, খরচ করিবার জন্য এক সঙ্গে চারি-আনা আট-আনার বেশি কখন পাই নাই। অল্প বয়সে বেশি পয়সা না দেওয়ার নিয়ম, আমি ভাল মনে করি। প্লিডার্‌-সিপ্‌ ক্লাশে ঢুকিব কিংবা ঢুকিয়াছি, একদিন দুপরে মার কাছে শুইয়া আমার দুঃখের কথা বলিলাম: মাঝে মাঝে দু-আনা চারি আনা কেহ চাহিলে, কিংবা নিজের সামান্য কোন জিনিষের দরকার হইলে, পয়সা কাছে থাকে না, সেজন্য মনে খুব কষ্ট পাই। আমার কথা শুনিয়া মা বলিলেন, আমাকে মাসে দু'টাকা দিবেন। আমার অহ্লাদের সীমা রহিল না। কয়েক দিন ধরিয়া, ঐ টাকার খরচ কিরূপ ভাবে করিব, তার হিসাব শেষ করিয়া উঠিতে পারিলাম না! মাসের দিনগুলি ব্যগ্র হইয়া গুণিতাম। দুই কিংবা তিন মাস টাকা পাইয়াছি, আবার মাস পুরিলে মাকে টাকা চাহিলাম। মা বলিলেন, ঐ মাসের টাকা তিনি আমাকে দিয়াছেন। আমি বলিলাম, মিথ্যা কথা বলিতেছি না, টাকা আমি পাই নাই। মা আমাকে বিশ্বাস করিলেন না। খুব মনের কষ্টে বলিলাম, আমি মিথ্যা কথা বলি না, তাঁকে মিথ্যা বলি নাই। মার তবুও বিশ্বাস হইল না। আমি আর টাকার কথা তুলিলাম না, এবং সেদিন হইতে জীবনে আমি মাকে কখনও কোন টাকা চাই নাই। পরে উকিল হইয়া, আমার রোজগারের টাকা, যতদিন তিনি লইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই, প্রত্যহ তাঁকে দিয়াছি।

আমি প্রত্যেক ঘটনা আলাদা করিয়া দেখিয়া থাকি, এবং কোন বিষয় সম্বন্ধে মনের ভাব পুষিয়া রাখিয়া, অন্য কোন বিষয়ে প্রয়োগ করি না। জীবনে ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম কখন হয় নাই। মাকে আমি খুব ভাল-বাসিতাম। জাহাজের পথে কটক হইতে কলিকাতায় আসিয়া, বি, এ, পড়িবার সময়ে, মাকে দেখিতে না পাইয়া কত কাঁদিয়াছি, কিন্তু যখন উচিত মনে করিয়াছি, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিয়াছি। কোন একটা বিষয়ে, বাড়িতে কাহার সঙ্গে মতের মিল হইল না, সেজন্য অন্য বিষয় সম্বন্ধে তার প্রতি মনের ভাব বিকৃত হয় নাই, কিংবা তার প্রতি কর্ত্তব্যের ত্রুটি করি নাই।

একটি মনের বৃত্তি জীবনে আমাকে খুবই বিব্রত করিয়াছে। রাগ অল্প

বয়স হইতে দেখা দিয়া, বেশি বয়স পর্য্যন্ত খুবই উত্যক্ত করিয়াছে, এবং এখনও সম্পূর্ণরূপে তার প্রভাব হইতে নিষ্কৃতি পাই নাই। আমার জ্যাঠাই বরাবর বলিতেন, 'চক্রবর্ত্তী' গুষ্টির আর কিছু না থাক, রাগটা ষোল আনা আছে! আমার জ্যাঠা খুব রাগী ছিলেন, আমার পিতাও কম রাগী ছিলেন না। জ্যাঠা জীবনে কখন রাগ দমন করিতে চেষ্টা করেন নাই, জ্যাঠাইকে তার ধাক্কা খুবই সামলাইতে হইয়াছিল। পিতা কিন্তু রাগ দমন করিতে চেষ্টা করিয়া সফল হইয়াছিলেন।

আমার বয়স নয় বছরের বেশি হইবে না, একদিন সন্ধ্যার সময়ে, মার উপরে কোন কারণে, ঠিক মনে নাই, রাগ করিলাম। রাগ করিয়া সে রাত্রে খাইলাম না। দুপুরে খাইয়াছিলাম, বৈকালে কিছুই খাই নাই। রাত্রে শুইতে যাইবার আগে খুব ক্ষুধা পাইয়াছিল। রাত্রি কাটিল, স্কুলে যাইবার সময় আসিল, রাগ তখনও পড়ে নাই, ক্ষুধায় টলিতেছিলাম, তবুও না খাইয়া স্কুলে গেলাম। স্কুলে গিয়া বসিতে পারিলাম না, মাথা ঘুরিতে লাগিল। খাইয়া আসি নাই, ছুটি লইয়া বাড়ি আসিলাম। বাড়ির নিকট আসিয়া ভাবিলাম, কেহ দেখিতে পাইয়া খাইবার জন্য নিশ্চয় ডাকিয়া লইয়া যাইবে। কাহারও সঙ্গে দেখা হইল না। আমাদের বাড়ির পর, রাস্তার অপর ধারে, একজন মুসলমান জমিদারের বাড়ি, তাঁর সদর দরজার দুই পাশে বসিবার ছোট রক আছে। লজ্জায় বাড়িতে ঢুকিতে না পারিয়া, জমিদারের বাড়ির এক পাশের রকে বসিলাম। পিতা তখন কোর্টে গিয়াছেন। যতদূর মনে পড়ে, স্কুলে যাইবার আগে তেমন ভাল করিয়া খাইবার জন্য কেহ বলে নাই, তাহা না হইলে শরীরের অবস্থা যেরূপ হইয়াছিল, নিশ্চয়ই না খাইয়া স্কুলে যাইতাম না। স্কুলে যাইবার পর, কেহ যদি যাইয়া স্কুল হইতে লইয়া আসিত, মান বজায় থাকিল ভাবিয়া সুড়সুড় করিয়া তার সঙ্গে আসিয়া খাইয়া বাঁচিতাম। সে সব কিছুই হয় নাই। সেই রকে বসিয়া বাড়ির দিকে চাহিয়া রহিলাম। কতক্ষণ পরে মনে নাই, আমাদের একজন চাকর বাহিরে আসিয়া, আমাকে দেখিতে পাইয়া মাকে সংবাদটা দিল। মা তখন খাইতেছিলেন। সে লোক ফিরিয়া আসিয়া বলিল, মা ডাকিতেছেন। আমি তার সঙ্গে চলিলাম, এবং মা ডাকিবামাত্র তাঁর সঙ্গে বসিয়া খাইয়া, রাগের শান্তি করিয়া বাঁচিলাম!

অল্প বয়সে, বুদ্ধি যখন কম, রাগের মাত্রা বেশি, সামান্য কারণে রাগ

করিতাম। উপনয়নের পর, প্রতিজ্ঞা করিলাম, যে যাহা বলুক কিংবা করুক, রাগ হইলেও বাহিরে প্রকাশ করিব না। অল্প বয়সের সে প্রতিজ্ঞা মাঝে মাঝে ভঙ্গ হইত, কিন্তু রাগ-প্রকাশ অনেকটা কমিয়া আসিল। ষোল বছর বয়সে, বাড়ির বাহিরে সকলে বলিত, আমি খুব ঠাণ্ডা প্রকৃতির লোক। আমি মনে মনে হাসিতাম—বাড়ির লোকেরাও হাসিত—কিন্তু ঐ সময় হইতে যারা আমার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে না মিশিয়াছে, তারা সকলেই আমাকে ঠাণ্ডা প্রকৃতির লোক মনে করিয়াছে। বড় হইয়া, বাড়ির লোক ছাড়া অন্য কাহারও উপর রাগ প্রকাশের কথা, বড় মনে পড়ে না।

কুড়ি বছর বয়সে আমার বিবাহ হয়, কিন্তু আট বছর বয়স হইতে আমার বিবাহের জন্য পাত্রী দেখা আরম্ভ হইয়াছিল! বাড়ীতে মা ছাড়া অন্য স্ত্রীলোক ছিলেন না। জ্যাঠাই দেশ হইতে কটকে মাঝে মাঝে আসিতেন, কিন্তু মার সঙ্গে তাঁর তেমন মনের মিল ছিল না, দিন কয়েক থাকিয়া দেশে ফিরিয়া যাইতেন। মার একটি বৌ আনিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, আমার বাল্যকাল হইতে। অত অল্প বয়সে বিবাহ দিবার বিরুদ্ধে পিতাকে প্রকাশ্যে আপত্তি করিতে কখন শুনি নাই। আট বছর বয়সে, আমাকে সাজাইয়া চাকরের সঙ্গে কটকে যেখানে আমার বিবাহের কথা চলিতেছিল, মা পাঠাইয়া দিতেন! সেখানে যাইয়া যার সঙ্গে বিবাহের কথা চলিতেছিল, তাকে দেখিয়া খেলার একজন সঙ্গী ছাড়া আর কোন ভাব মনে আসিত না। আমি গেলেই, ঐ বাড়ির লোকেরা আমাকে কোলে তুলিয়া লইত! তাদের বাড়ি হইতে মাঝে মাঝে তত্ত্ব আসিত। যতদূর মনে পড়ে, সে মেয়েটির অপেক্ষা এক বছরের বেশি বড় আমি নিশ্চয়ই ছিলাম না। কেন যে সে বিবাহ হইল না, তাহা মনে নাই, তবে সে মেয়ের কটকে বিবাহ হয়, এবং তার স্বামীর সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল।

এইভাবে সম্বন্ধ চলিতে লাগিল, কিন্তু কলিকাতায় বি, এ, পড়িতে আসিয়া বিবাহের প্রসঙ্গটা খুব জোরে চলিল। সম্বন্ধ করিবার ভার পড়িল, চব্বিশ-পরগণা বঁড়িষা নিবাসী আমার মেজ ও সেজ ভগ্নীপতি, জয়গোপাল এবং হরিপদর উপর। আমার সেজ ভগ্নীপতি হরিপদ, আমার অপেক্ষা তিন বছরের বড় ছিল, কিন্তু সে আমার এক ক্লাশ নীচে শরৎ ভায়ার সঙ্গে পড়িত, এবং আমাদের সঙ্গে কলিকাতায় এক বোর্ডিংএ কয়েক মাস ছিল। যদিও চল্লিশ বছরের উপরের কথা, সম্বন্ধের ব্যাপার খুব আধুনিক ধরণে চলিতে লাগিল।

হরিপদ, প্রথম তার এক আত্মীয়ের মেয়ের সঙ্গে আমার বিবাহের প্রস্তাব আনিল। সে আত্মীয় তখন কলিকাতায় গোয়াবাগানে থাকিতেন। স্থির হইল, আমি, আমার ভাই শরৎ, এবং আমার দুই ভগ্নীপতি, একসঙ্গে যাইয়া মেয়ে দেখিয়া আসিব। আমার পছন্দ হইলে, অন্য কথা চলিবে। আমার যে পছন্দ হইবে, ভগ্নীপতিরা ধরিয়া লইয়াছিল, কারণ তারা দেখিয়াছিল মেয়েটি বেশ সুন্দরী। আমরা চারিজন সমারোহে মেয়ে দেখিতে গেলাম। মেয়ে দেখা হইল। আমার স্ত্রীর অপেক্ষা সে মেয়ের গড়ন ও রঙ্গ ভাল। মেয়ে দেখার পর, আমরা সকলে সেখানে আহার করিতে বাধ্য হইলাম। রীতিমত পাকা দেখার মত খাওয়ান! বাড়াবাড়ি করিয়া খাওয়াইবার মতলবটা আমার সেজ ভগ্নীপতি হরিপদর মাথা হইতে বাহির হইয়াছিল। পাত্রীর বাড়িতে কাহারও নিকট কোন মত প্রকাশ করিলাম না। লজ্জায় কিছু বলিলাম না, সকলে তাহাই মনে করিল। ফিরিয়া আসিয়া হরিপদকে বলিলাম, মেয়ে আমার পছন্দ হয় নাই। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সরলভাবে বলিলাম, তার ধরণ আমার তেমন মনের মত নয়!

দ্বিতীয় দফায় মেয়ে দেখা হয়, ভবানীপুরে। ঐ সময়ে আমার জ্যাঠা দেশ হইতে আসিয়া আমাদের বোর্ডিংএ ছিলেন। স্থির হইল, তিনিও আমাদের সঙ্গে মেয়েকে দেখিতে যাইবেন। তিনি যাইতেছেন, ঐ সঙ্গে পাত্রও দেখিতে আসিতেছে, ভাল দেখায় না, সেজন্য পাত্র সঙ্গে যাইতেছে, প্রকাশ করা হইল না। জ্যাঠাকে সঙ্গে লইবার ফন্দিও হরিপদ মাথা খাটাইয়া বাহির করিয়াছিল। তাঁর পছন্দ হইলে, আমার উপর তিনি চাপ দিবেন, হরিপদ মনে করিয়াছিল। আমার জ্যাঠা সাদাসিধে পল্লীগ্রামের লোক, আমাকে খুব ভালবাসিতেন, আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে কোন আপত্তি করিলেন না। মেয়েকে খুব সাজাইয়া দেখান হইল, কিন্তু বেঁটে হইতে পারে মনে করিয়া আমি পছন্দ করিলাম না!

হরিপদ হাল ছাড়িয়া দিল না। তৃতীয় দফায়, খাওয়া-দাওয়ার কোন ব্যবস্থা না করিয়া, সাজাইতে নিষেধ করিয়া, একদিন সকালে সে কেবল আমাকে সঙ্গে লইয়া, হেদোর নিকট একস্থানে একটি মেয়ে দেখাইয়া আনিল। আগের দুটি মেয়ের অপেক্ষা, ঐ মেয়ে দেখিতে ভাল, কিন্তু সে চুরি করিয়া একবার আমাকে দেখিয়াছিল, সেজন্য তাকে পছন্দ করিলাম না!

সুপারিশের চাপে, হরিপদর শেষ চেষ্টা হইয়াছিল, পাকে প্রকারে,

দেখিতে মোটেই ভাল নয়, নিজের দূর সম্পর্কীয়া একটি বেশি বয়সের মেয়েকে আমার স্কন্ধে চাপান। কন্যার অভিভাবক পাকা লোক, আমার তোয়াক্কা না রাখিয়া, পিতার সঙ্গে দেখা করিয়া কথা পাকা করিতে চেষ্টা করিলেন। তখন আমি কটকে ফিরিয়া আসিয়াছি। পাত্রী যে আমার মোটেই পছন্দ নয়, প্রকাশ করার দরকার হয় নাই। কোন কারণে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল, আমিও রক্ষা পাইলাম।

পছন্দ করিয়া বিবাহ করার কয়েক অঙ্ক অভিনয়ের পর, যেখানে আমার বিবাহ হইল, ঐ সম্বন্ধ আনিলেন, কলিকাতা-খিদিরপুর (পুরাতন) কুমেদান বাগান রোড নিবাসী গোপালচন্দ্র ঘোষ। গোপালচন্দ্র, কটকের ভূতপূর্ব্ব সরকারি উকিল দীননাথ সরকারের বড় জামাই। শোভাবাজার-রাজবাটীতে, আমার শ্বশুরের সহিত গোপালচন্দ্রের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। রাজবাটীর সহিত গোপালচন্দ্রের কুটুম্বিতা ছিল, এবং আমার শ্বশুর, রাজা রাধাকান্ত দেবের বংশধরদের গুরুদেব ছিলেন। কলিকাতা হইতে কটকে তখন সমুদ্র-পথে আসিতে হইত। পাত্রপক্ষের কেহ পাত্রী দেখে নাই, পাত্রীপক্ষের কেহ পাত্র দেখে নাই, তৃতীয় ব্যক্তির নিকট পরস্পরের সংবাদ লইয়া, চিঠির দ্বারা কথা পাকা হইয়া উঠিল। পিতা কটকের বাড়ির সকলকে সঙ্গে লইয়া, বিবাহ দিবার জন্য কলিকাতায় রওনা হইলেন। ইহাকেই বলে ঘটনা-সংযোগ বা বিধির পাক!

কলিকাতায় আসিয়া কন্যা দেখিতে যাইবার সময়ে, আমার দেখিতে যাইবার কথা মোটেই উঠিল না, এবং আমি যে সেজন্য অসন্তুষ্ট হইলাম, তাহা স্মরণ হয় না। পিতা কন্যা দেখিতে গেলেন, এবং তাঁর সঙ্গে গেল আমার ভাই শরৎ। স্ত্রীর মুখে শুনিয়াছি, পিতা তাকে দেখিয়া বলিলেন, "খাসা মেয়ে"! শরৎ বাড়ি আসিয়া, স্ত্রীর বর্ণনা করিয়া আমাকে তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিল। কন্যাপক্ষ হইতে আমাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, আমার ছোট শ্যালক, বিজয়কৃষ্ণ।

আমার বিবাহ, কলিকাতা নিবাসী শ্রীনারায়ণ কাঞ্জিলাল-চক্রবর্ত্তীর কনিষ্ঠা কন্যা সরোজবাসিনীর সহিত হইয়াছে। বিবাহের সময়ে আমি এফ্,এ, পাশ করিয়া প্লিডারসিপ্ পড়িতেছিলাম। আমার স্ত্রীর বয়স তখন এগার বছর। আমার শ্বশুরের আদি নিবাস, চব্বিশ পরগণার জয়নগর-মজিলপুর গ্রামে। তাঁর পিতামহ নবকুমার তর্কপঞ্চানন, প্রথম কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন।

শ্রীনারায়ণের তিন পুত্র এবং পাঁচ কন্যা। প্রথম পুত্র আশুতোষ, ডেরাডুন্ হইতে পাশ করিয়া বন-বিভাগে বড় চাকরি পাইয়াছিলেন, কিন্তু বছর কয়েক কাজ করিয়া, অল্পবয়সে, ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে, মারা গিয়াছেন। দ্বিতীয় পুত্র কালীকৃষ্ণ, পুনা হইতে ইঞ্জিনিয়ার হইয়া মার্টিন্ কোম্পানির অধীনে কাজ লইয়াছিলেন, ৫৪ বছর বয়সে, ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে, মারা গিয়াছেন। কনিষ্ঠ পুত্র বিজয়কৃষ্ণ, বি, এল, পাশ করিয়া, কলিকাতা হাইকোর্টের আপিল বিভাগে বেঞ্চ্ অফিসার্ হইয়াছিলেন, এখন অবসর ভোগ করিতেছেন। শ্রীনারায়ণের বড় কন্যা তারকভাবিনীর বিবাহ, জনাই মুখোপাধ্যায় বংশের, প্রাণকৃষ্ণের পুত্র প্রাণনাথের সহিত হইয়াছিল। তিনি এবং তাঁর স্বামী অনেক দিন ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। দ্বিতীয় কন্যা হরিভাবিনীর বিবাহ, হাওড়া শিবপুর নিবাসী, হরকুমার মুখোপাধ্যায়ের পুত্র উপেন্দ্রনাথের সহিত হইয়াছিল। হরিভাবিনী অল্পবয়সে স্বামী রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। তৃতীয় কন্যা মৃণালিনীর বিবাহ হইয়াছিল, কলিকাতা নিবাসী অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র সুরেন্দ্রনাথের সহিত। সুরেন্দ্রনাথ মারা গিয়াছেন, মৃণালিনী জীবিতা আছেন। চতুর্থ কন্যার শৈশবে মৃত্যু হয়। আমার স্ত্রী শ্বশুরের কনিষ্ঠা কন্যা এবং অষ্টম সন্তান।

আমার শাশুড়ী কাদম্বিনীর মাতা, প্রসন্নকুমারী, ঈশ্বরীপুরের অধিকারী-বংশের কালীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা। প্রতাপাদিত্যের রাজধানী, ঈশ্বরীপুর বা যশোর, আমার দেশ পানিয়া হইতে আট মাইল দূরে।

আমার শ্বশুরকে কলিকাতায় সকলে চরিত্রবান লোক বলিয়া সম্মান করিত। আমার শাশুড়ীর ন্যায় আদর্শ হিন্দুরমণী খুব কম দেখিয়াছি। শ্বশুর বাষট্টি বছর বয়সে, ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে, ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁর মৃত্যুর আট বছর পরে, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে, আমার শাশুড়ী সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করিয়াছেন।

আমার ফুলশয্যা দিনের একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। বিবাহ উপলক্ষে আমাকে সোনার ঘড়ি এবং চেন দেওয়া হয়। বিবাহের দিন না দিয়া, ফুলশয্যার তত্ত্বের সঙ্গে তাহা পাঠান হইয়াছিল। যখন তত্ত্ব আসিল, আমাদের কালীঘাটের বাসায় গোপালচন্দ্র ছিলেন। আমার পিতা অত্যন্ত সরল অন্তঃকরণের লোক ছিলেন, ঘড়ি এবং চেন ভাল কি না মোটেই লক্ষ্য করিতেন না, কিন্তু গোপালচন্দ্র খুব সম্ভব পিতার নিকট নিজের কর্ম্মপটুতা দেখাইবার জন্য, ঘড়ি এবং চেন হাতে লইয়া, বড় গলায় বলিয়া উঠিলেন,

উহার অপেক্ষা ভাল ঘড়ি এবং চেন দিবার কথা, ঘড়ি এবং চেন ফিরাইয়া দাও! ঘড়ি এবং চেন ফেরত দেওয়া হইতেছে শুনিয়া, আমি বলিয়া পাঠাইলাম, যদি ফিরাইয়া দেওয়া হয়, তার বদলে অন্য যে ঘড়ি এবং চেন আসিবে, আমি ব্যবহার করিব না। ঘড়ি এবং চেন ফেরত দেওয়া হইল না।

বিবাহের কিছুদিন পরে বুঝিতে পারিলাম, স্বাধীন পছন্দের বিবাহ এবং হিন্দুধরণে সদ্বংশজাতা কন্যার পাণিগ্রহণের মধ্যে কতটা প্রভেদ। ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, আমাদের সময়ের হাইকোর্টের একজন বড় ব্যারিষ্টার্ ছিলেন। তাঁর এক কন্যার বিবাহে, হাইকোর্টের অন্যান্য ব্যারিষ্টার্ এবং উকিলদের সহিত আমিও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। ব্যোমকেশের অনেক ইংরাজ বন্ধুও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ব্যোমকেশ সমাজ ত্যাগ করেন নাই, হিন্দুমতে কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। একজন সাহেব বন্ধু, তাঁর কুসংস্কার যায় নাই শুনিয়া উপহাস করিলেন। ব্যোমকেশ, সাহেব বন্ধুকে বলিলেন, পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা কুকুর, ঘোড়া, প্রভৃতি, জানোয়ার কিনিবার সময়ে খুঁটিয়া বংশ দেখিয়া থাকে—তাদের বাপ মা এবং উর্দ্ধতন অনেকের খবর লইয়া থাকে—আর হিন্দুরা মানুষের বিবাহের সময়ে বংশ বাছিয়া কাজ করে, সেটা হইল কিনা কুসংস্কার!

গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করিলাম। যে গার্হস্থ্য জীবন কাটায় নাই, সংসারের আসল রূপ সে দেখে নাই। কবির ঐ জীবনের কল্পনা যেরূপ অতিরঞ্জিত, সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসীর ধারণাও সেইরূপ অযথার্থ। সেখানে এরূপ কোন নিয়ম নাই, গৃহের কর্ত্তাটি ভাল হইলে, সংসার সোনার বরণ ধারণ করিবে। পুরাকাল হইতে সক্রেটিস্ পাশ্চাত্য জগতের একজন শিক্ষাগুরু গণ্য হইয়া আসিয়াছেন, কিন্তু বাড়িতে ঢুকিয়া, উগ্রচণ্ডা স্ত্রী জান্‌থিপির ধাক্কা সামলাইতে তাঁর খুব সংযমের প্রয়োজন হইত! লোক মানী হইতে পারে, জ্ঞানী হইতে পারে, দেশের রাজাও হইতে পারে, অন্তঃপুরের মধ্যে কিন্তু এক কথায় তার প্রতিপত্তি হয় না। হিন্দু সমাজে যেখানে একগৃহে, অনেকগুলি লোক একসঙ্গে অবিভক্ত সম্পত্তির অধিকারী হইয়া দিন কাটায়, অবস্থা আরও জটিল। সাংসারিক জীবন কিছুকাল কাটাইয়া, আমার অভিজ্ঞতা লাভ প্রচুর পরিমাণে হইল।

পরিষ্কার বুঝিলাম, অর্থঘটিত গোলযোগই সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বনাশের। সৌভাগ্যক্রমে দেখিলাম, অর্থের উপর লোভ আমার খুবই কম। আমার পিতা

সস্ত্রাক গ্রন্থকার ১৩১৩ সাল

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে মারা গিয়াছেন। আমার শ্বশুরের মৃত্যু হয়, তিন বছর পরে, ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে। শ্বশুরের মৃত্যুর সময়, তাঁর মেজ এবং ছোট ছেলে জীবিত ছিলেন। আমি, আমার ভাই শরতের অপেক্ষা যত বড়, আমার ছোট শ্যালক অপেক্ষা মেজ শ্যালক সেইরূপ অল্প বড়। শ্বশুর বাঁচিয়া থাকিবার সময়ে দেখিতাম, আমার ছোট শ্যালক সংসারের সব দেখা-শুনা করিতেন, কিন্তু শ্বশুরের মৃত্যুর পর, চাবির তাড়া মেজ শ্যালক লইলেন এবং সংসারের কর্ত্তা হইলেন। তাঁকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া আমার প্রথম স্মরণ হইল, কই আমি ত ভাবি নাই পিতার চাবির তাড়া লইয়া কর্ত্তৃত্ব করিতে! পিতা প্রায় ছয় মাস রোগে ভুগিয়া মারা যান। আমি ঐ ছয় মাস কোর্ট কামাই করিয়া বাড়িতে ছিলাম। মৃত্যুর সময়ে পিতার কযেক হাজার টাকা দেনা ছিল। দেখিতাম, রোগশয্যায় তিনি তার জন্য চিন্তা করিয়া কষ্ট পাইতেন। আমাদের অবস্থা যেরূপ ছিল, ঐ টাকা শোধ করিতে একবছরের বেশি সময় লাগিবার কথা নয়। পিতাকে চিন্তামুক্ত করিবার জন্য স্থির করিলাম, তাঁর শরীর কিছু সুস্থ হইলে, আমি দেশেব সম্পত্তির খাজনা আদায় করিয়া আনিয়া, ঐ দেনা শোধ করিয়া দিব। কিছুদিন পরে, তাঁর শরীর অপেক্ষাকৃত ভাল দেখিয়া, আমি দেশের জন্য রওনা হইলাম। পানিয়ার বাড়িতে পৌছিবার দুই ঘণ্টা পরে, টেলিগ্রাম পাইলাম, পিতার শরীর খুব খারাপ হইয়াছে, আমি যেন অবিলম্বে ফিরিয়া আসি। টেলিগ্রাম পাইবার সঙ্গে সঙ্গে কটকের জন্য রওনা হইলাম। আসিয়া দেখিলাম, পূর্ব্বদিন পিতার মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুর সময় হইতে পিতার চাবির তাড়া আমার ভাই শরতের নিকট ছিল। সে লোহার সিন্দুক, আল্‌মারি, ইত্যাদি, খুলিত, এবং টাকা কড়ি রাখিত। আমি সে সম্বন্ধে কখন কিছু চিন্তা করি নাই।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে, পিতার মৃত্যুর তিন বছর পরে, হাইকোর্টে ওকালতি করিতে আসিবার সময়ে, যখন সংসারের সঙ্ঘর্ষে আমার অভিজ্ঞতা বিলক্ষণ হইয়াছে, সংক্রামিক রোগে হঠাৎ কলিকাতায় মৃত্যু হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া, আমি একটি উইল্ সম্পাদন করিলাম। তখন আমার দুই ছেলে এবং এক মেয়ে হইয়াছে। উইলের দ্বারা আমার সমস্ত সম্পত্তি ভাই শরৎকে দিয়া, কেবল স্ত্রী এবং ছোট ছেলে-মেয়েদের প্রতি উচিত কর্ত্তব্য করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তাহা ছাড়া, দেশের সম্পত্তি হইতে যখনই টাকা আদায় করিয়া আনিয়াছি, কিংবা অন্যভাবে বেশি টাকা হাতে আসিয়াছে,

সমস্তই শরৎকে দিয়াছি, এবং একদিনের জন্যও হিসাব লইবার কথা ভাবি নাই।

আমার প্রকৃতি স্নেহশীল। ক্ষীরোদ নামে আমার একটি ছোট বোন শৈশবে মারা যায়। সে দেখিতে ময়লা রঙের, এবং তার গডন তেমন ভাল ছিল না। তাকে বড কেহ আদর করিত না, সেজন্য আমার কষ্ট হইত। আমি তাকে খুব ভালবাসিতাম, সেও আমার কাছে থাকিতে ভালবাসিত। সে হঠাৎ ডবকা রোগে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মারা গেল দেখিয়া মনে অত্যন্ত কষ্ট পাইলাম। আমার বিদ্যা-বুদ্ধি তখন খুব কম, রাত্রে আকাশের দিকে চাহিয়া ভাবিতাম, অসংখ্য নক্ষত্রের মধ্যে কোথায় সে একটি নক্ষত্র হইয়া ফুটিয়া রহিয়াছে! এখনও তার কথা মনে পডে। কাহাকেও স্নেহ হইতে বঞ্চিত করিবার ইচ্ছা যেরূপ কখন হয় নাই, অন্যায়রূপে কাহাকেও নির্য্যাতন করিয়া, অপরকে সন্তুষ্ট করিবার ইচ্ছাও কখনও মনে স্থান পায় নাই। আমি নিজেকে কষ্ট দিয়া অপরকে সন্তুষ্ট করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত, এবং জীবনে তাহা করিয়াছি। অর্থ দ্বারা আকৃষ্ট না হইয়া, এক কথায় জীবনের সব আকাঙ্ক্ষা, মান-অভিমান, পরিত্যাগ করিয়া, অপরকে সন্তুষ্ট করিয়াছি, পারি নাই কেবল কাহারও তাড়নায় উচিত-অনুচিত জ্ঞান বিসর্জ্জন দিতে।

জীবনে ঐ আদর্শ পালন করিয়া, যখন স্ত্রীর পঞ্চাশ বছর বয়সে, অকস্মাৎ মুখ হইতে বাহির হইল, কটকের কথা মনে পড়িলে এখনও তার আতঙ্ক হয়, তখন খুবই কষ্ট অনুভব করিলাম। স্ত্রীর সম্বন্ধে কিছু না বলিলে চলে না, অথচ বলিতে খুবই ইতস্তত করিতেছি। নিজের স্ত্রী-সম্বন্ধে লোকদের সচরাচর যেরূপ ধারণা দেখিতে পাই, আমার সন্দেহ হয়, স্ত্রীর সম্বন্ধে আমার ধারণাও বুঝি ঐ প্রকারের! যখন দেখিতে পাই, যে স্ত্রীলোকের ব্যবহারের ফলে, শ্বশুরকুলের সকলে একে একে গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, এবং ঐ স্ত্রীলোক একাকিনী রাজত্ব করিতেছে—কিন্তু স্বামী তার গুণকীর্ত্তন করিয়া শেষ করিতে পারে না! কিংবা যখন দেখিতে পাই, যে স্ত্রীলোক সংসারের ছোট-বড সকলকে কষ্ট দিয়া, খরচের টাকা পুঁজি করিতেছে, এবং দুপরে আসিয়া অভুক্ত নিকট-আত্মীয় অতিথিকে কিছু চাহিয়া লইয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিতে হয়—অথচ স্বামী আদর্শ রমণী বলিয়া তার প্রশংসা করিতেছে—তখন মনে সন্দেহ হয়, স্ত্রীর সম্বন্ধে আমার ধারণা কি সত্য? তবে যখন এই আত্মজীবনী বাহির হইবে, আমার স্ত্রীকে ভালরূপে জানে

অথচ নিরপেক্ষ, অনেকে নিশ্চয়ই বাঁচিয়া থাকিবে, সেই ভরসায় যাহা কিছু লিখিলাম।

স্ত্রীর সঙ্গে জীবন কাটাইয়া যেরূপ সুখী হইয়াছি, ঐরূপ সুখী কেবল ভাগ্যবান লোকেরাই হইয়া থাকে। মাতা-পিতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, ভ্রাতা-ভগিনী, দেবর-ননদ, আত্মীয়-স্বজন, ঝি-চাকর, পাড়া-পড়শী, সকলের প্রতি উচিত পরিমাণে, আমার স্ত্রীকে স্নেহ প্রকাশ করিতে দেখিয়া, খুবই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। তাই আমার "দেবনাথ" উপন্যাসে, শিবনাথের স্ত্রী হরিপ্রিয়া বলিয়াছে, "সকল অনুরাগের মূল এবং অবয়ব আসলে একপ্রকার। মাতার স্নেহ বল, স্বামীর স্নেহ বল, পুত্রের স্নেহ বল, ভগবানের প্রতি অনুরাগ বল, আসলে সমস্ত অনুরাগই এক। * * * * যে ভালবাস্‌তে পাবে, সে সকলকে ভালবেসে থাকে, আর যে পারে না, সে কাহাকেও ভালবাস্‌তে পারে না।"

আমি পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে, স্ত্রীকে কেবল সঙ্গিনী করিয়া তৃপ্ত হইতে পারি নাই। আমার একজন বাল্য-বন্ধুর স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ পাইয়া, শোক-প্রকাশ করিতে তার বাড়িতে গিয়াছিলাম। স্ত্রী-বিয়োগে আমার বন্ধুর খুবই কষ্ট হইয়াছিল, সে কাঁদিয়া কতকটা ইংরাজীতে এবং কতকটা মাতৃভাষায় বলিল, সে জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান বন্ধু হারাইয়াছে। ঐরূপ ধারণা অবিমিশ্র পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল। স্ত্রী-সম্বন্ধে আমাদের দেশের কল্পনা অনেক উচ্চ। আমি স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী করিতে চেষ্টা করিয়াছি। তত্ত্বালোচনা করিয়া আজীবন কাটাইয়া, স্ত্রীকে তার উচিত অংশ হইতে বঞ্চিত করিবার ইচ্ছা কখনই হয় নাই। আমি নিয়ত চেষ্টা করিয়াছি, চিন্তায় তাকে আমার সমকক্ষ করিতে। স্ত্রীকে, কাশীধামে অন্নপূর্ণার মন্দিরে, আমি তার ইষ্ট মন্ত্র দিয়াছি। স্থান অন্নপূর্ণার মন্দির নির্ব্বাচনের উদ্দেশ্য, পবিত্র স্থানের সাহায্যে চিত্তকে শান্ত এবং বলযুক্ত করা। আমার চরম কল্পনার মধ্যে, বিগ্রহের কিংবা উপাসনার স্থান নাই, কিন্তু যে স্থানে সাধু-চিন্তার স্রোত দিবারাত্রি বহিয়া যায়, তাকে আমি পুণ্যস্থান মনে করি, এবং সাধারণ জীবনের উপর তার প্রভাব স্বীকার করি। স্ত্রীকে ইষ্টমন্ত্র দিবার কৈফিয়ৎ, আমার 'বাসবী' উপন্যাসে, অনাদি তার স্ত্রী বাসবীকে দীক্ষিত করিবার সময়ে দিয়াছে: "উভয়ে যদি এক চরম চিন্তার মার্গে অগ্রসর হইতে পারে, তাহা খুব বাঞ্ছনীয়। সে লৌকিক আচারের বিষয় মনে স্থান না দিয়া, নিজের চরম চিন্তার দ্বারা বাসবীকে দীক্ষিত করিবে, স্থির করিল।"

আমার চার ছেলে এবং দুই মেয়ে। প্রথম দুই ছেলের পর দুই মেয়ে, এবং শেষে দুই ছেলে হইয়াছে। ছোট দুই ছেলের জন্মস্থান কলিকাতা, অন্য ছেলে মেয়েরা কটকে হইয়াছে।

সকলের ছোট, চতুর্থ ছেলে প্রভাতরঞ্জন, তিন বছর বয়সে কটকে মারা গিয়াছে। হিন্দুর সন্তান হইয়া, প্রভাত সম্বন্ধে একটি ধারণা মন হইতে একেবারে দূর করিতে পারি নাই। প্রভাত হইবার কয়েক মাস পরে, ডাক্তারেরা বলিল, তার আজন্মিক হৃদ্‌রোগ হইয়াছে। আমার পিতা হৃদ্‌রোগে ছয়মাস ভুগিয়া মারা গিয়াছিলেন। পিতার রোগের ন্যায় অবিকল প্রভাতের রোগের লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইতেছে—আমার মাতা, প্রভাতের রোগের গতি লক্ষ্য করিয়া বলিতেন। আমার মাতার মৃত্যু, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কটকে হইয়াছে। তাঁর মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে, প্রভাতেরও মৃত্যু কটকে হয়। প্রভাত আমার ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সকলের অপেক্ষা সুন্দর, রঙ্গ পিতার ন্যায় উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। অবিকল পিতার মত তার মাথার চুল হইয়াছিল। পিতার মৃত্যুর পর, কটকে আমার ব্যবহারের জন্য, পৈতৃক বাড়ির সংলগ্ন, ভাল একটি দ্বিতল গৃহ প্রস্তুত করা হয়। গৃহ-প্রবেশের দশ মাস পরে প্রভাতের জন্ম হয়। অনেকের ধারণা, আমার এবং স্ত্রীরও মাঝে মাঝে মনে হয়, পিতা হয়ত আবার পৃথিবীতে আসিয়া, নূতন বাড়িতে আমাদের সঙ্গে কিছুকাল কাটাইয়া, মাকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গিয়াছেন!

আমার বড় মেয়ে সুধাময়ী, যাকে আমরা রেণু বলিয়া ডাকি, ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে, এবং ছোট মেয়ে সুনীতি, যাকে আমরা খুকী বলিয়া ডাকি, ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে, জন্মগ্রহণ করে। আমি মেয়েদের মনের মত শিক্ষিতা করিতে পারি নাই, সেজন্য খুবই দুঃখিত। তার প্রধান কারণ, আমার কোন একস্থানে বেশি দিন না থাকা। তাদের স্কুলে দিব না, প্রথম হইতে স্থির করিয়াছিলাম। তাদের পড়িবার বয়সে, হিন্দু মেয়েদের জন্য ভাল স্কুল ছিল না, এখনও যে হইয়াছে, তাহা স্বীকার করি না। মেয়েদের বিবাহের কয়েক বছর পূর্ব্বে, নিশ্চিন্তভাবে কলিকাতায় থাকিতে পারিয়া, তাদের শিক্ষার যত্ন যৎসামান্য লইতে পারিয়াছিলাম। ঐ সময়ে ভবানীপুর নিবাসী, কলিকাতার একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সঙ্গীতাচার্য্য, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তাদের সঙ্গীত শিক্ষা দিয়াছিলেন। তারা প্রথম হইতে ধ্রুপদ গাইতে শিখিয়াছিল। সে আজ

কুড়ি বছরেরর কথা, তখন কেহ মেয়েদের উচ্চ অঙ্গের সঙ্গীত শিখাইবার কথা ভাবিত না। আমার বড় কন্যার ধ্রুপদ শুনিয়া, ভবানীপুর সঙ্গীত সমাজের একজন ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু যাঁদের বাড়িতে মেয়েদের বিবাহ হইল, সঙ্গীতে তাঁদের উৎসাহ নাই দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। যে দেশেব ঋষিরা বলিয়াছেন, "সুর ব্রহ্ম", সে দেশের লোকদের সঙ্গীতে উদাসীনতা দেখিলে যথার্থই দুঃখ হয়। বাইজিদের নাচগানই আমাদের সঙ্গীত সম্বন্ধে ধারণা কলুষিত করিয়াছে। নূতন যুগে, সঙ্গীতের চর্চ্চা দেখিয়া মন অনেক সময়ে উল্লসিত হইয়া উঠে, কিন্তু "গজলের" উপর যেরূপ ঝোঁক দেখিতে পাই, সঙ্গীতের প্রতি লোকদের যথার্থ অনুরাগ হইতে এখনও অনেক সময় লাগিবে।

আমি মেয়েদেব বিবাহের জন্য একশ্রেণীর পাত্রের উপর লক্ষ্য রাখিয়াছিলাম। অধিকাংশ পাশ করা পাত্রদের সম্বল বিহীন অবস্থা দেখিয়া, কেবল পাশের তালিকা দেখিয়া পাত্র পছন্দ করিতে মোটেই ইচ্ছুক হইলাম না। প্রথম হইতে স্থির করিলাম, পাত্র কতগুলি পাশ না করুক, রোজগার করিতে না পারিলেও সংসার স্বচ্ছন্দে চলিবে, ঐরূপ ঘরে মেয়ে দিব। সৌভাগ্যক্রমে মেয়েদের বিবাহ ঐরূপ ঘরে দিতে পারিয়াছিলাম। পরে যেরূপ ঘটনা হইল, দেখিলাম, ঐরূপ ঘরে মেয়েদের বিবাহ দিয়া খুবই ভাল করিয়াছি।

সাধারণ কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার ন্যায়, আমার মনের ভাব কখন হয় নাই। সৌজন্য প্রকাশ করিতে আমার মত খুব কম লোক পারে, ভাল পাত্র হাত-ছাড়া হইয়া না যায়, সে দিকে আমার বেশ লক্ষ্য ছিল, কিন্তু আত্মসম্মানের দিকে দৃষ্টি কখনই কম ছিল না। আমার মেয়েদের বিবাহ পনর বছর বয়সে দিয়াছি, তখনকার পক্ষে বেশি বয়স বলিতে হইবে। পাত্র-পক্ষের কেহ আসিলে, অমনি অভিভূত হইয়া বয়ঃপ্রাপ্তা মেয়েকে দেখাইতে সম্মত হইতে পারি নাই। মেয়েদের ফটো তোলা ছিল, তাহা দেখিয়া মোটামুটি পছন্দ হইলে, এবং ঘর ও পাত্র আমাদের পছন্দ হইলে, মেয়েকে দেখাইতাম। ঐরূপ করিয়া, মেয়েদের কয়েকবার মাত্র দেখাইতে হইয়াছিল। নিজেকে হীন করিয়া কখন উদ্দেশ্য সাধন হয় না, কেবল দুর্ব্বল মনের পরিচয় দেওয়া হয়।

বড় মেয়ে সুধাময়ীর বিবাহ হইয়াছে, ১৯২১ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে, কলিকাতা বাগবাজার নিবাসী অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র, নারায়ণ চন্দ্রের সহিত। নারায়ণ তখন বি, এল্, পড়িত, সময়ে মুন্সেফ্ হইবার খুবই

সম্ভাবনা ছিল। বিবাহের সময়ে অমৃতলাল নদীয়া জেলার জজ্ ছিলেন। ট্রেন ফেল হইয়া নিরূপিত সময়ে তিনি আমার মেয়েকে দেখিতে আসিতে পারেন নাই। তাঁর মধ্যম সহোদর কন্যা দেখিয়া পছন্দ করিয়া যান। অমৃতলালের সঙ্গে দেখা করিয়া কথা পাকা করিবার জন্য আমাকে কৃষ্ণনগরে যাইতে হইয়াছিল। তাঁর বাড়িতে থাকিবার জন্য অমৃতলাল অত্যন্ত অনুরোধ করেন, আমি তাঁর বাড়িতে উঠিয়াছিলাম। তিনি আমাকে অতিশয় যত্ন করিয়াছিলেন। এক সঙ্গে দুপরে আহারের পর, তাঁর দ্বিতলের শুইবার ঘরে, তিন-চারি ঘণ্টা গল্প হইল। সন্ধ্যার গাড়িতে আমার কলিকাতায় ফিরিবার কথা, বৈকালে তাঁর চাকর আসিয়া খবর দিল, বাহিরে সবজজ্ এবং মুন্সেফ্ আসিয়াছেন। অমৃতলাল বলিলেন, তিনিই তাঁদের আসিতে বলিয়াছেন, এবং আমাকে সঙ্গে লইয়া তাঁদের সঙ্গে দেখা করিবার প্রস্তাব করিলেন। প্রকাশ্যে কিছুই বলিলেন না, কিন্তু বেশ বুঝিতে পারিলাম, বিবাহের আনুষঙ্গিক কথা তাঁদের সম্মুখে তুলিয়া রাখিতে ইচ্ছা করেন। আমার অত্যন্ত রাগ হইল। খুব সংযতভাবে এবং যতদূর সম্ভব বিনয়ের সহিত তাঁকে বলিলাম, বিবাহের কথা ঐ পর্য্যন্ত থাক, আমি কলিকাতায় ফিরিয়া যাই, আমার সম্বন্ধে তিনি আরও সংবাদ লউন—কিরূপ লোকের কন্যা ঘরে লইতেছেন, তার প্রকৃতিই বা কিরূপ—এবং যখন সন্তুষ্ট হইয়া কেবল আমার কথার উপর নির্ভর করিয়া কাজ করিতে পারিবেন, তখনই বিবাহ সম্পন্ন হইবে। বলা বাহুল্য, তখন আমার সঙ্গে বিবাহের সব কথাই হইয়া গিয়াছে। অমৃতলাল বিস্মিত হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিলেন। তিনি অতিশয় খোলা প্রকৃতির লোক, আমাকে তৎক্ষণাৎ বলিলেন, কিছু মনে করিবেন না, যখন তাদের আসিতে বলিয়াছি, চলুন তাদের সঙ্গে গোটাকতক কথা কহিয়া বিদায় দিয়া আসি। আমি বলিলাম, চলুন তবে যাই। নীচে গিয়া, সবজজ এবং মুন্সেফের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিয়া, আমার প্রশংসা করিয়া বলিলেন, সব কথা হইয়া গিয়াছে, কেবল বিবাহের দিন স্থির করা বাকি। সবজজ এবং মুন্সেফের সম্মুখে কেবল দিন স্থির করা হইল।

উভয় পক্ষের পাকা দেখিবার দিন স্থির হইয়াছে, যেদিন আমি পাত্রকে আশীর্ব্বাদ করিতে যাইব, সেদিন সকালে হঠাৎ অমৃতলাল আমার বাড়িতে উপস্থিত হইলেন। আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম। তিনি সেদিন সকালে আমার বাড়িতে প্রায় তিন ঘণ্টা ছিলেন। আসিবার কারণ

বলিলেন, আশীর্ব্বাদ করিবার সময়ে পাত্রীকে প্রথম দেখিবেন, সেটা ভাল হয় না, সেজন্য তার পূর্ব্বে একবার পাত্রীকে দেখিতে আসিয়াছেন। তাঁর ভবিষ্যৎ পুত্রবধূকে দেখিলেন। জলযোগ করিবার পর বলিলেন, একটা কথা তাঁর মনে কিছু খটকা লাগাইয়া দিয়াছে: তাঁর কোর্টে একজন মোক্তার অনেক সময়ে দাওরার মামলা করিতে আসে, সে জ্যোতিষ ভাল জানে, পাত্র-পাত্রীর রাশিচক্র মিলাইয়া বলিয়াছে, একটি দোষ পাওয়া যায়, সেজন্য তাঁর মনটা কিছু খারাপ আছে।

তার পূর্ব্বে, অমৃতলাল পুত্রের রাশিচক্র আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, এবং কলিকাতার বাহিরে থাকেন, সেজন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, কোন ভাল জ্যোতিষীর দ্বারা পাত্র-পাত্রীর রাশিচক্র মিলাইয়া দেখিতে। আমি রাশিচক্র দুটি, কলিকাতার বিখ্যাত জ্যোতিষী এবং মাদ্রাসা স্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেডমাষ্টার, কালীপদ ভট্টাচার্য্যকে দেখাইয়াছিলাম। তিনি দেখিয়া বলিয়াছিলেন, সুন্দর মিলিয়াছে, এবং তাহা আমি অমৃতলালকে জানাইয়াছিলাম। যদিও অধিকাংশ জ্যোতিষীদের গণনা আমি বিশ্বাস করি না, জ্যোতিঃশাস্ত্রে আমার বিশ্বাস আছে, কিন্তু বিবাহের সময়ে রাশিচক্র মিলান আদৌ প্রয়োজন মনে করি না। তার কারণ, জ্যোতিষ বিশ্বাস করি বলিয়া। যাহা বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা বুদ্ধিমান লোকের মত বিশ্বাস করা উচিত। যদি জ্যোতিষ সত্য হয়, এবং ভূমিষ্ঠ হইবার পরই জাতকের সমস্ত ভবিষ্যৎ, জীবনে সে কি করিবে, কবে বিবাহ হইবে, স্ত্রী কিরূপ হইবে, ইত্যাদি, গুণিয়া বলা যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, যাহা নির্দ্ধারিত আছে তাহা নিশ্চয় ঘটিবে। কোন প্রতিকার করিলে ঘটনার স্রোত বদলান যায়, এই যে একটা শাস্ত্র তৈয়ার করা হইয়াছে, তাহা আমি মোটেই বিশ্বাস করি না। তার দ্বারা সম্প্রদায় বিশেষের অর্থোপায় হইতে পারে, হতাশ প্রাণে কতকটা সান্ত্বনা দেওয়া চলিতে পারে, কিন্তু জ্যোতিঃশাস্ত্রের দফা রফা করিয়া ঐ শাস্ত্র খাড়া করিতে হয়। একদিকে গণনা সত্য বলিতে হইবে, এবং ঐ সঙ্গে তার পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করা যায়, স্বীকার করিতে হইবে, অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন লোকের এই গোলমেলে ধারণার আমি পক্ষপাতী নই। জ্যোতির্ব্বিদ্যা যদি সত্য হয়, তার গণনা মতে, যার যে স্ত্রী হইবার কথা, তার সঙ্গেই বিবাহ হইবে, অপরের সঙ্গে কখনই হইবে না। মানুষের মন এরূপ দুর্ব্বল, তর্কের সময়ে আমি যাহা বলিতেছি তাহা স্বীকার করিবে, কিন্তু রাশিচক্র মিলান বদ অভ্যাস আমাদের

এরূপ মজ্জাগত হইয়াছে, হিন্দু বলিয়া যে বড়াই করে, সে কখনও পুত্র-কন্যার বিবাহের সময়ে রাশিচক্র না মিলাইয়া শান্তিলাভ করিবে না!

আমি অমৃতলালের মনের অবস্থা বুঝিলাম। অপরকে আমার বিশ্বাসের কথা অনায়াসে বলিতাম, কিন্তু তাঁকে তখন বলিতে মোটেই ইচ্ছা হইল না। পাত্র এবং ঘর মনের মত হইয়াছে, বিবাহের সব গহণা প্রস্তুত, পাত্রকে তার নাম খোদান যে সোনার বোতাম দিয়া আশীর্ব্বাদ করিব, তাহা আসিয়াছে, কিন্তু আমি অমৃতলালকে তৎক্ষণাৎ বলিলাম, পুনরায় ভাল জ্যোতিষীকে দেখাইয়া, যদি রাশিচক্র তাঁর মনের মত মিল হয়, বিবাহ হইবে, নতুবা হইবে না, সে জন্য আমি দুঃখিত হইব না। তার পর স্থির হইল, তিনি এবং আমি ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতিষীকে রাশিচক্র দেখাইয়া, পরস্পরকে জানাইব, তারা কি বলিয়াছে। ঘণ্টা দুই পরে, বৈবাহিক হাসিয়া আমাকে বলিলেন, তাঁর মোক্তারের গণনা অতিশয় বাজে; আমার গণৎকারও ঐ কথা বলিয়াছিল।

আমার কনিষ্ঠা কন্যা সুনীতির বিবাহ হইয়াছে, ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে, কলিকাতা-ভবানীপুর নিবাসী যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রে, নরনারায়ণের সহিত। আমার বৈবাহিক যদিও উকিল, কখনও ওকালতি করেন নাই। তাঁর সাংসারিক অবস্থা ভাল। যোগেন্দ্রনাথের বড় ভাই খগেন্দ্র শাস্ত্রী, ভবানীপুরের একজন সুপরিচিত পণ্ডিত। বিবাহের সময়ে নারায়ণ বি, এ, পড়িতেছিল। আমার কন্যাকে দেখিতে আসিয়া, সে গান ভাল গাইতে পারে শুনিয়া, যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, তাঁরা পাচকের হাতের রান্না খান না, আমার মেয়েকে তাঁর বাড়িতে রাঁধিতে হইবে। আমি বলিলাম, আমার মেয়ে যদি তাঁদের রাঁধিয়া খাওয়াইয়া সন্তুষ্ট করে, তাহা হইলে গৌরবান্বিত বোধ করিব। পরে শুনিয়াছি, আমার কন্যার রান্নার সুখ্যাতি, তার শ্বশুর বাড়ির সকলে করিয়া থাকে।

আমার ছোট জামাই নরনারায়ণ, অল্প বয়স হইতে ধর্ম্মানুরাগী হইয়াছিল, তাহা জানিতাম না। বিবাহের এক বছর পরে, হঠাৎ একদিন শুনিলাম, সে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিতে অত্যন্ত ইচ্ছুক। আমি প্রথমে মনে করিলাম, কোন কারণে আমার মেয়ের সঙ্গে তার মনোমালিন্য হইয়াছে, সেজন্য ঐরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে। সংবাদ লইয়া জানিলাম, আমার অনুমান সম্পূর্ণ ভুল, সে স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালবাসে, কেবল সন্ন্যাসী হইয়া ধর্ম্মজীবন অবলম্বন করিবার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে। তখন আমার স্মরণ হইল, বিবাহের

রাত্রে, জনকয়েক সাধু বরযাত্র আসিয়াছিলেন, আমরা তাঁদের আদর আপ্যায়িত করিয়াছিলাম, কারণ শুনিয়াছিলাম নরনারায়ণ তাঁদের অত্যন্ত সম্মান করে। আমার বৈবাহিক, ছেলেকে নিরস্ত করিতে না পারিয়া আমাকে সংবাদ দিলেন। আমি অবিলম্বে কটক হইতে কলিকাতায় আসিলাম। নরনায়ণের সঙ্গে কিছুক্ষণ ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলাম, তার ইচ্ছামত কাজ করিবার পূর্ব্বে, কয়েকদিনের জন্য কটকে আমার নিকটে থাকিবার পক্ষে কি কোন আপত্তি আছে, কারণ আমি তার সঙ্গে কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি? সে কটকে যাইতে সম্মত হইল। কাহারও সঙ্গে কোন বিষয়ের আলোচনা করিতে গিয়া, তাকে পরিহাস করিয়া কিংবা চটাইয়া কোন কথা বলি না, বয়সে অনেক ছোট হইলেও, তাকে সমকক্ষ মনে করিয়া কথা কহিয়া থাকি। আমার কথা কহিবার ধরণে খুব সম্ভব নরনারায়ণ আকৃষ্ট হইয়াছিল, কারণ সে কটকে যাইতে সম্মত হইয়াছে শুনিয়া, আমার বৈবাহিক খুবই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

কটকে নবনারায়ণকে সঙ্গে লইয়া প্রত্যহ মহানদীর ধারে বেড়াইতে যাইতাম, এবং ধীরে ধীরে ধর্ম্মজীবন কাটাইবাব জন্য সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন কি না আলোচনা করিতাম। দেখিলাম, সে বিষয়ের চিন্তা অনেকটা করিয়াছে, বুদ্ধি প্রখর, কিন্তু অধ্যযন এবং অভিজ্ঞতা অত্যন্ত কম। অল্প বয়সে সরল চিত্তে সাধুসন্ন্যাসীদের সঙ্গে মিশিয়া, সাধু জীবনের দ্বারা খুবই আকৃষ্ট হইয়াছে। যত প্রকারের প্রশ্ন হইতে পারে, তাকে করিতে বলিতাম, এবং আমি তার উত্তর দিতাম। সংসার-আশ্রম ধর্ম্মজীবনের অন্তরায় নয়, সংসারে থাকিয়া নানাবিধ বিষয়ের সামঞ্জস্য করিয়া, ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধনের অধিক সুযোগ পাওয়া যায়, এবং সেজন্য সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া, কেবল আরাধনা করিয়া সময় কাটান অপেক্ষা গার্হস্থ্য আশ্রম অনেক ভাল, ক্রমশ সে বুঝিতে পারিল। দিন দিন আমার কথার প্রতি তার অনুরাগ বাড়িতে লাগিল, দুই মাস পরে সে স্থির কবিল, সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিবে না। কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া, আগের মত দিন কাটাইতে লাগিল।

ছোট মেয়ের বিবাহ ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে হইয়াছিল, চারি বছর পরে, ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে, অল্পদিন জ্বরে ভুগিয়া, স্ত্রী এবং দুই পুত্র রাখিয়া, ছোট জামাতা নরনারায়ণ ইহধাম ত্যাগ করিয়াছে।

বড় জামাই নারায়ণ, মুন্সেফ্ হইতে না পারিয়া ওকালতি করিতেছিল,

বিবাহের দশ বছর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে, ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে, স্ত্রী, দুই পুত্র, এবং এক কন্যা রাখিয়া, সেও ইহধাম ত্যাগ করিয়াছে।

আড়াই বছরের মধ্যে, আমার স্ত্রী দুই জামাতা হারাইয়া, শোকে অধীর হইলেন। ঐ গভীর শোকের সময়ে, আমার স্ত্রীর প্রতি খুব নিকট আত্মীয়দের সহানুভূতির অভাব দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। তারা একখানা চিঠি লিখিয়াও আমার স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে নাই!

শোকের সময়ে আমি কাহারও নিকট সহানুভূতির আকাঙ্ক্ষা ত করি না, সহানুভূতি প্রকাশ করিতে দেখিলে অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়ি। পৃথিবীর নানাবিধ নিয়ম, যার মধ্যে, গভীর শোকের কারণ মৃত্যু, বিস্তৃত স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তার সম্বন্ধে সাধারণের সহিত আমার ধারণার এত প্রভেদ, সহানুভূতির ভাষা কয়েকটি কথার সংযোগ ছাড়া আমার নিকট আর কিছুই মনে হয় না। আমি কদাচিৎ গভীর শোকের কথা কাহারও নিকট উত্থাপন করি। বড় জামাতার মৃত্যুসংবাদ আমি কটকে পাইয়াছিলাম। সংবাদ পাইবার ঘণ্টা দুই পরে, আমার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু দেখা করিতে আসিল। তাকে ঐ সংবাদ দিই নাই, কিংবা সে আমার সহিত অনেকক্ষণ কথা কহিয়াও আমার তখনকার মনের অবস্থা অনুমান করিতে পারে নাই। কিছুদিন পরে, সে ঐ সংবাদ জানিতে পারিয়া, আমি তাকে সেদিন ঐ সংবাদ দিই নাই, সেজন্য অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়া চিঠি লিখিয়াছিল। এ পর্য্যন্ত কেবল দুজনের নিকট আমার জামাতাদের কথা তুলিয়াছি। তারা জীবনে গভীর শোক পাইয়া আমার সহানুভূতি পাইবার আশায়, তাদের শোকের কথা বলিয়াছিল। নিজের বিশ্বাস এবং ধারণা মত তাদের সান্ত্বনা দিয়াছিলাম, এবং যাহাতে তাদের ধারণা না হয়, আমার কথাগুলি কেবল বড ধরণের অপরের প্রতি ব্যবহারের জন্য প্রবোধ-বাক্য ছাড়া আর কিছুই নয়, সেজন্য জামাতাদের বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলাম।

শোক যতই গভীর হয়, সৃষ্টি-রহস্য ততই মনকে আন্দোলন করিয়া তোলে, চিন্তা বিস্তীর্ণ হয়, ক্রমশ হৃদয়ে সান্ত্বনা পাই। শান্তচিত্তে জ্ঞানের রাজ্যে একবার যাইতে পারিলে, শোক ভিন্নরূপ ধারণ করে। দুর্ব্বল মানুষের মন বেশিক্ষণ ঐ অবস্থায় থাকে না, চারিদিকে শোকের সাধারণ কল্পনা এবং অভিব্যক্তি হৃদয়কে আবার আচ্ছন্ন করে।

আমার দুই বৈবাহিক এবং বেহান বাঁচিয়া আছেন। আমার মেয়েরা

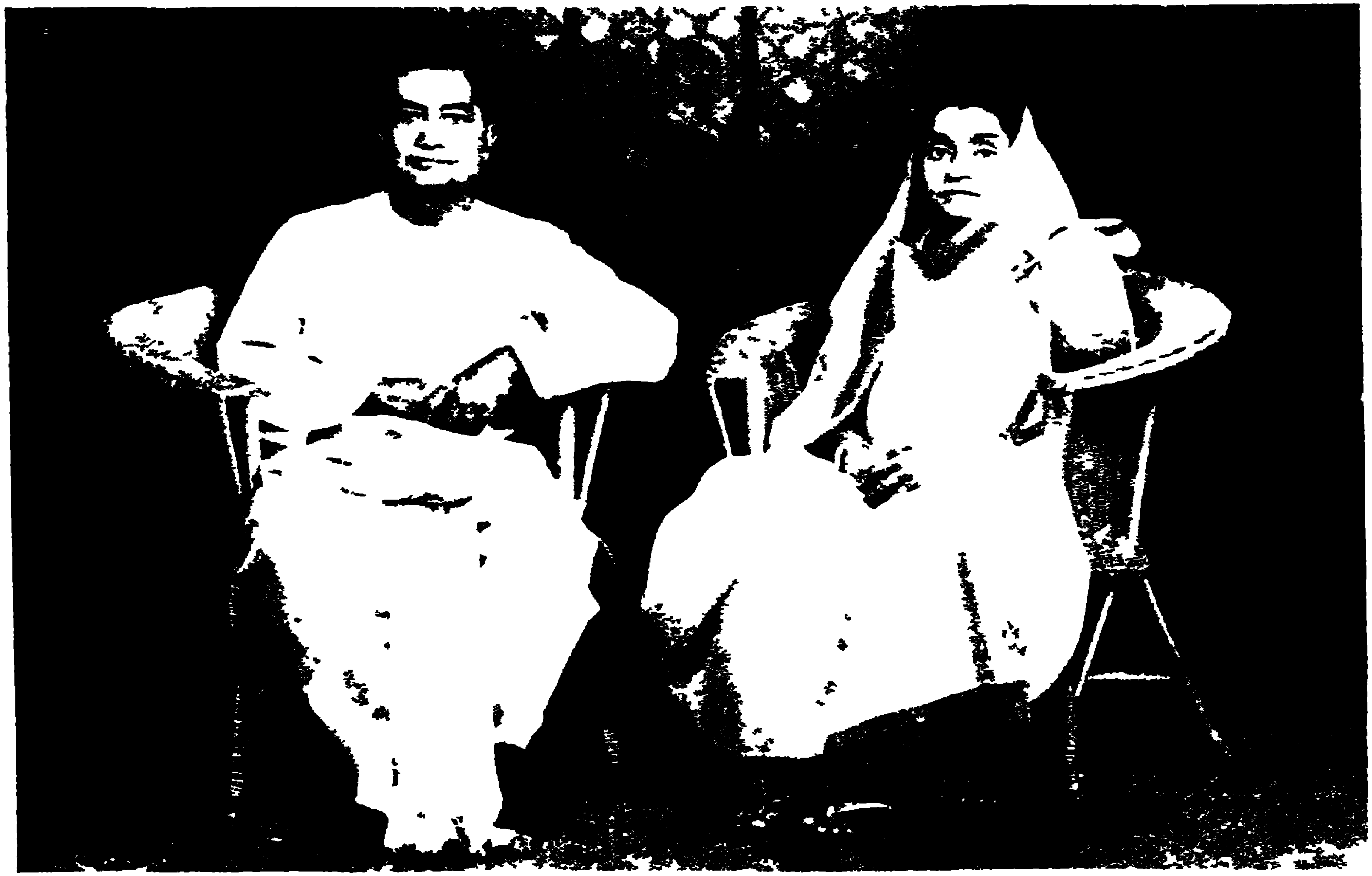

সস্ত্রীক গ্রন্থকার ১৩৪৫ সাল

তাঁদের অত্যন্ত স্নেহের পাত্রী। মনে হয়, ছেলেদের প্রতি স্নেহ প্রকাশে বঞ্চিত হইয়া, তাঁরা বধূদের অধিক যত্ন করিয়া তৃপ্ত হইতেছেন।

আমার বড় ছেলে নীহাররঞ্জন ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে, মেজ ছেলে সুহৃদরঞ্জন ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে, এবং তৃতীয় ছেলে নিশীথরঞ্জন ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে, জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। আমার বাল্যকাল এবং শিক্ষাজীবনের কথা স্মরণ রাখিয়া, যত দূর সম্ভব তাদের মন্দ প্রভাব হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। তিনটি বিষয়ের প্রতি আমার খুব লক্ষ্য ছিল: বার বছরের আগে যেন তারা বিদ্যালয়ে পড়িতে না যায়; সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বিদ্যালয়ে যেন পড়ে; মন্দ সংসর্গে যেন সময় না কাটায়।

আমার তিন ছেলেই, স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে প্রথম ভর্ত্তি হইয়াছে। হিতাহিত জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত, ছেলেরা কেবল অনুকরণ করিয়া চলে। আমাদের বিদ্যালয়গুলির যেরূপ নৈতিক অবস্থা, যাহা কিছু মন্দ অভ্যাস, বালকেরা সেখানেই অনুকরণ করিয়া প্রথম শিখে। তাহা ছাড়া, আমাদের শিক্ষাবিভাগের যথেচ্ছাচারী নিয়মের জন্য, দুগ্ধপোষ্য বালকদের বইয়ের কাঁড়ি যেরূপ পড়িতে হয়, বছর বছর বইও সেরূপ পরিবর্ত্তন হয়! ম্যাট্রিক্ পর্য্যন্ত, একই বিষয়ের জন্য, খুব কমে পাঁচ ছয় খানি ভিন্ন ভিন্ন বই পড়িতে হয়! ইহাদ্বারা কতগুলি গ্রন্থকারের অর্থপ্রাপ্তির সুবিধা ছাড়া আর কোন সাধু উদ্দেশ্য সাধন হয় না। এই দুই অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য, আমি ছেলেদের বার বছরের পূর্ব্বে বিদ্যালয়ে পাঠাই নাই।

ছোট বয়সে কেবল বিদ্যালয়ে না দিলে যথেষ্ট হয় না। বাড়িতে ছেলেদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এবং নীতির দিকে লক্ষ্য রাখা চাই। খুব কম পিতামাতা ঐ দায়িত্ব গ্রহণের যোগ্য। কম খরচে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া, বাড়িতে ছেলেদের ঝঞ্ঝাট হইতে রক্ষা পাইলে সুখী হয় না, এরূপ বাপ-মা খুবই কম আছে। আমি ছেলেদের হাতে বই আট বছরের আগে দিই নাই, তারা ঐ বয়স পর্য্যন্ত শুনিয়া যাহা শিখিয়াছে, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়াছি। আট বছর বয়সে পড়া আরম্ভ করিয়া, বার বছরের মধ্যে, আমার ছেলেরা যতদূর পড়িয়াছে, পাঁচ বছর বয়স হইতে পড়ার চাপে বিব্রত হইয়া, অন্য ছেলেরা কিছুমাত্র বেশি শিখিতে পারে নাই। বাড়িতে তারা বন্দী হইয়া আছে মনে না করে, সেজন্য যে সব স্থান এবং দ্রব্যাদি ছেলেরা দেখিতে ভালবাসে, তাদের সঙ্গে লইয়া দেখাইয়াছি। অভ্যাসের ফল এরূপ, যাহা তিন দিন

করা যায়, তাহা চতুর্থ দিন করিতে ভাল লাগে, নতুবা অসংখ্য ভিন্ন অবস্থায় মানুষ তৃপ্ত হইয়া দিন কাটাইতে পারিত না।

কটকে ভাল পড়ান হয় না, সেজন্য আমার বড় এবং মেজ ছেলে, নীহার এবং সুহৃদ্, সেখানে ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত পড়িয়া, কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছিল, এবং ঐ কলেজে তাদের শিক্ষা জীবন শেষ হইয়াছে। নিশীথ প্রথম হইতে কলিকাতায় পড়িয়াছে। সে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি, এস্‌সি, পাশ করিয়া বিলাতে এখন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িতেছে। ভাল বিদ্যালয়ে ভাল বালকদের সঙ্গে মিশিলে, প্রথম হইতে বালকেরা উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। কিছু বেশি অর্থ ব্যয় করিয়া, ছেলেদের ভাল বিদ্যালয়ে পড়ান, অভিভাবকদের উচিত। অনেক সময়ে, কৃপণ পিতারা মাসে মাসে কয়েকটি টাকা বাঁচাইয়া, ছেলেদের যে কোন বিদ্যালয়ে দিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে দিন কাটায়, এবং তর্ক করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করে যে ফল সমান, এবং তারা কিছু টাকা বাঁচাইয়া খুব বুদ্ধিমানের কাজ করিয়াছে!

ছেলেদের চরিত্র যাহাতে ভাল গড়িয়া উঠে, সেদিকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশি লক্ষ্য রাখিয়াছিলাম। যারা চেষ্টার সার্থকতা কেবল ফলের দ্বারা বুঝিয়া থাকে, তারা অত্যন্ত ভুল বুঝে। কেবল চেষ্টার দ্বারা কি সব সময়ে আশানুরূপ ফল হয়? যে চেষ্টা করে তার ক্ষমতা কিরূপ, কিরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থায় তাকে সময় কাটাইতে হইবে, তাহাও বিবেচনা করা দরকার। ঐ দুই কারণে, একই রকমের চেষ্টার ভিন্ন ফল হইতে দেখা যায়। সেজন্য উচিত চেষ্টা হইতে বিরত হওয়া, বুদ্ধিমান লোকের কর্ত্তব্য নয়। ফলের জন্য বেশি চিন্তিত না হইয়া, উচিত চেষ্টা করিয়া অগ্রসর হইলে, অনেক সময়ে আশাতীত ভাল ফল পাওয়া যায়। আমি শেষফলের জন্য চিন্তিত না হইয়া, ছেলেদের চরিত্র গঠনের জন্য যাহা উচিত মনে করিয়াছি, সর্ব্বদাই করিয়াছি। প্রথম হইতে ছেলেদের সঙ্গে, সব বিষয়ের ভাল-মন্দ দিক, সঙ্কোচশূন্য হইয়া আলোচনা করিয়াছি। যে সব বিষয় অভিভাবকেরা সচরাচার ছেলেদের নিকট উত্থাপন করিতে চায় না, তাহাও বাদ দিই নাই। নিয়ম করিয়া ছেলেদের বন্ধুদের সংবাদ লইতাম। কাহার সহিত মিশিয়া থাকে কিংবা মিশিতে ইচ্ছা করে, কাহার বাড়িতে গিয়া থাকে, ইত্যাদি, সব সংবাদ রাখিতাম। যাদের সঙ্গে মিশা উচিত নয়, স্পষ্ট বলিতাম, এবং তার কারণও

দিতাম, এবং যাদের সঙ্গে মিশা উচিত, তাদের বাড়িতে আনিয়া, মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে বলিতাম।

রসনার লোভে ছেলেরা হোটেলে খাইতে না যায়, সেদিকে আমার প্রখর দৃষ্টি ছিল। হোটেলে খাওয়ার মর্ম্ম খুবই বুঝি। আমাদের দেশে হোটেলে খাইয়া শরীর খারাপ করার মত, শরীর খারাপ করার অন্য সহজ উপায় খুব কম আছে। পরের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খাইবার জন্য আগ্রহও আমি পছন্দ করি না। একটি নিমন্ত্রণ পাইলে, একবেলা ভাল আহারের সুযোগ হইল, মনের এই ভাব আমি ঘৃণা করি। অল্প বয়স হইতে ছেলেদের নানাবিধ ভাল আহার্য্য বাড়িতে মাঝে মাঝে প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইতে বলিয়াছি। আমার স্ত্রী একজন উত্তম পাচিকা। আমার জন দশ বন্ধুকে, তিনি একাকিনী মাছ-মাংসের বিবিধ প্রকারের উপাদেয় আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইয়া পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। মাছ-মাংস রাঁধিতে যেরূপ সিদ্ধহস্তা, নানাবিধ মিষ্টান্ন দ্রব্য প্রস্তুত করিতেও তিনি সেইরূপ নিপুণা। ফলে দাঁড়াইয়াছে, হোটেলে খাইবার আগ্রহ ছেলেদের নাই, এবং খুব কম সময়ে পরের বাড়িতে খাইয়া আসিয়া তারা বলে, বাড়ির অপেক্ষা ভাল রান্না খাইয়াছে। ধনী হইলে যে ভাল খায় এবং খাওয়ায়, তাহা ঠিক নয়। যারা ভাল খাওয়া বুঝে, তারাই ভাল খাইয়া থাকে এবং খাওয়ায়—অবস্থার সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নাই।

আমি সঙ্গীত খুব ভালবাসি, মেয়েদের যত্ন করিয়া সঙ্গীত শিখাইয়াছি, কিন্তু ছেলেদের সঙ্গীতের প্রতি আকর্ষণ নাই, কিংবা তাহা শিখিতে ইচ্ছুক নয়, সেজন্য খুবই বিস্মিত হইয়াছি। আর একটি বিষয়ে তাদের টান নাই দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি; আমি দর্শন চর্চ্চা করিয়া সময় কাটাই, কিন্তু তাদের ঐ বিষয়ের প্রতি কোন স্পৃহা নাই, দুই ছেলে পছন্দ করিয়া অঙ্ক এবং বিজ্ঞান পড়িয়াছে! ছেলেরা উপার্জ্জন যেরূপ করুক, সৎভাবে জীবন কাটাইবে, ইহাই আমার ধারণা।

ছেলে, মেয়ে, এবং বৌএদের মধ্যে বাছিয়া, কম-বেশি কোন এক জনকে ভালবাসা, একেবারে পছন্দ করি না, এবং আমি ও আমার স্ত্রী কখনও তাহা করি নাই। কে দেখিতে ভাল, কে তেমন ভাল নয়, কে পড়ে ভাল, কে ভাল পড়ে না, এমন কি, কে বেশ কথা শোনে, কে তেমন কথা শোনে না, আদর-যত্ন এবং কর্ত্তব্য করিবার সম্বন্ধে, কখন সে সব কথা আমরা ভাবি না। ভাল কাজ করিলে ভাল বলি, মন্দ কাজ করিলে ভর্ৎসনা করি, এবং ঐ করিয়াই

মনের ভাব শেষ হইয়া যায়, মন্দটা মনে রাখিয়া অন্তর কলুষিত করি না। ভাল-মন্দ কাজের মূল কারণ আলোচনা করার পর, ভাল কাজের প্রশংসা করিয়া যেরূপ অজ্ঞান হই না, মন্দ কাজকে সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার মনে করিয়া মাথা খারাপ করি না।

ছেলেদের অল্প বয়সে বিবাহ দিব না, প্রথম হইতে স্থির করিয়াছিলাম। এখনকার মতের বশীভূত হইয়া, ছেলেরাও শীঘ্র বিবাহ করিবে না বলিয়াছিল। ছেলেদের অমতে তাদের বিবাহ দিবার ইচ্ছা, আমার এবং আমার স্ত্রীর ছিল না, কিন্তু যখন দেখিলাম বড ছেলের বয়স ত্রিশ হইয়া গেল, তখন তাকে স্পষ্ট বলিলাম, সে যদি জীবনে বিবাহ করিতে ইচ্ছা না করে, আমার কোন আপত্তি নাই, কিন্তু যদি বিবাহ করে, আর দেরি করা উচিত নয়। ঐ কথা শুনিয়া সে বিবাহ করিতে সম্মত হইল। আমার বড় ছেলের বিবাহ ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে, এবং মেজ ছেলের বিবাহ ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে হইয়াছে।

আমাদের বাড়িতে, ছেলেদের বিবাহের সময়ে, কন্যাপক্ষকে ফর্দ্দ দিবার নিয়ম নাই। ঐ নিয়মের প্রবর্ত্তক আমি। ছত্রিশ বছর পূর্ব্বে, আমার মেজ ভাই শরতের বিবাহেব সময়ে, ঐ নিয়ম করিয়াছিলাম। মেয়েদের বিবাহে অত্যধিক টাকা খরচ করিতে বাধ্য হইয়াও আমার মতের পরিবর্ত্তন হয় নাই। ঐ নিয়মের বিষয় জানিতে পারিয়া, কন্যাপক্ষ সুবিধা করিয়া লইতে কখনও ছাড়ে নাই, তথাচ আমি বিচলিত হই নাই, কিংবা স্পষ্ট কথা, অথবা ইঙ্গিতের দ্বারা, বাড়ির কাহাকেও কুটুম্বের মনে কষ্ট দিতে প্রশ্রয় দিই নাই। কিন্তু খুবই আশঙ্কা হয়, আমার এই নিয়ম ভবিষ্যতে সকলে পালন করিবে না।

আমার মেজ ভাই শরৎ, আমার মত, অল্প বয়সে লেখাপড়া খুবই অবহেলা করিয়াছিল। এণ্ট্রেন্স্ পরীক্ষার সময় হইতে, বি, এল্ পরীক্ষা পর্য্যন্ত, আমি সর্ব্বদা তার পড়ার তত্ত্ব লইতাম। আমার অত্যন্ত ইচ্ছা ছিল সে মুন্সেফ্ হয়, সেজন্য প্রথম শ্রেণীতে বি, এল্ পাশ করার জন্য খুবই উৎসাহ দিয়াছিলাম, এবং সে প্রথম শ্রেণীতে পাশ হইয়া ভাল স্থান পাইয়াছিল। উকিলদের সার্ভে পরীক্ষাও পাশ করিয়াছিল, কিন্তু কোন রকমে তাকে মুন্সফের কাজ লইবার জন্য সম্মত করাইতে পারিলাম না। সে কটকের একজন ভাল উকিল, এবং যদি স্বেচ্ছায় মুন্সেফ্ কোর্টের গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করিয়া না রাখিত, অনায়াসে সময়ে কটকের একজন বড় উকিল হইতে পারিত।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে, বালি নিবাসী শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা, এবং কলিকাতা ঝামাপুকুর নিবাসী রায় বাহাদুর হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৌহিত্রী, নির্ম্মল-নলিনীর সহিত, শরতের প্রথমবার বিবাহ হয়। দুই বছর পরে, তের বছর বয়সে, ঐ স্ত্রীর মৃত্যু হয়। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে, শরতের দ্বিতীয়বার বিবাহ, কলিকাতা বাগবাজার নিবাসী মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা, এবং (পুরাতন) মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট নিবাসী গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৌহিত্রী, চপলাবালার সহিত হইয়াছে। কটক ম্যুনিসিপ্যালিটির সহিত শরতের সংস্রব বহুকাল ছিল এবং তার চেয়ারম্যান্ হইয়া সে কর্ম্মপটুতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছে। শরতের একটি পুত্র।

আমার ছোট ভাই সতীশ, পাটনা হাইকোর্টের এড্ভোকেট্, কটকে ওকালতি করিতেছে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে, জনাই নিবাসী মাখনলাল মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা, এবং কলিকাতা হাজরা রোড নিবাসী রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্যের দৌহিত্রী, নিরুপমার সহিত তার বিবাহ হইয়াছে। সতীশের একটি পুত্র এবং চারিটি কন্যা।

পিতা জীবিতাবস্থায় আমার পাঁচ ভগ্নীর বিবাহ দিয়া যান। আমার বড় বোন সরোজবাসিনীর বিবাহ হয়, কটকের একজন জমিদার, লক্ষ্মীনারায়ণ রায়চৌধুরীর চতুর্থ পুত্র, জগদীশচন্দ্রের সহিত। লক্ষ্মীনারায়ণের আদি নিবাস, চব্বিশ পরগণা বেলঘোরিয়া গ্রামে। পিতার আসিবার অনেক আগে, চৌধুরী বংশের কর্ত্তারা উড়িষ্যায় সরকারি বড় চাকরি গ্রহণ করিয়া, বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে, আমার এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা আরম্ভ হইবার দিন কয়েক পূর্ব্বে, আমার বড় বোনের বিবাহ কটকে সম্পন্ন হয়। কেন যে বিবাহের দিন, আমার পরীক্ষার কয়েক দিন পূর্ব্বে ধার্য্য হয়, বলিতে পারি না। পরীক্ষার দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে আমি পড়া বন্ধ করি, সেজন্য ভাল পাশ করিতে পারি নাই। আমার পড়িবার ঘরের সম্মুখে নহবত-খানা বাঁধা হইয়াছিল এবং আত্মীয়-স্বজনের কোলাহলে গৃহ সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকিত। আমার ভগ্নীপতি জগদীশ, এণ্ট্রেন্স পর্য্যন্ত পড়িয়া শিক্ষা শেষ করে। সে অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট্, এবং ম্যুনিসিপ্যালিটির ভাইস্-চেয়ারম্যান্ এবং পরে চেয়ারম্যান্ হয়। জগদীশ অল্প বয়সে, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে, ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে, এবং তার মৃত্যুর ছয়মাস পরে, আমার ভগ্নীর মৃত্যু হইয়াছে। তাদের কোন সন্তান হয় নাই।

আমার মেজ বোন শৈলবালার বিবাহ হয়, ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে, চব্বিশ পরগণা বঁড়িষা নিবাসী, দীননাথ রায়চৌধুরীর কনিষ্ঠ পুত্র, জয়গোপালের সহিত। পাত্রপক্ষ জাহাজের পথে আসিয়া বিবাহ কটকে সম্পন্ন করেন। জয়গোপাল কেম্প্‌বেল স্কুল হইতে পাশ করিয়া ডাক্তার হইয়া, কলিকাতা কর্পোরেশনের অধীনে চাকরি লইয়াছিল। চাকরির শেষে, কয়েক বছর অসুস্থ থাকিয়া, ১৯৩৭ সালে জয়গোপালের মৃত্যু হইয়াছে। আমার ভগ্নী জীবিতা আছে। তার সাত পুত্র।

আমার সেজ বোন ব্রজবালার বিবাহ, বঁড়িষা নিবাসী শ্যামাবিলাস রায় চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র, হরিপদর সহিত, ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে, কটকে সম্পন্ন হয়। হরিপদ এফ্‌, এ, পর্য্যন্ত পড়িয়া, কলিকাতা কর্পোরেশনে ভাল চাকরি পাইয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ চাকরি হারাইয়া, তার শেষ জীবন ভাল কাটে নাই। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে হরিপদর মৃত্যু হইয়াছে। আমার ভগ্নী এবং তার চার পুত্র এবং চার কন্যা জীবিত আছে।

আমার চতুর্থী ভগ্নী চারুবালার বিবাহ, হাওড়া শালিখা নিবাসী পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র, উপেন্দ্রনাথের সহিত, ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে, কটকে সম্পন্ন হয়। বিবাহের কয়েক দিন পূর্ব্বে, যখন পাত্রপক্ষ বর লইয়া কটকে আসিয়াছে, উপেনকে দেখিয়া আমার পছন্দ হইল না। সে এণ্ট্রেন্স থার্ড ক্লাস্ পর্য্যন্ত পড়িয়া, হাওড়া রেল্‌ওয়ে আফিসে সামান্য চাকরিতে ঢুকিয়াছিল। আমার তখন বিবাহ হয় নাই। সন্ধ্যার পর, দ্বিতলে পিতা এবং মাতা বসিয়া আছেন, আমি সাহসে ভর দিয়া তাঁদের নিকট গিয়া বলিলাম, রূপে-গুণে আমি উপেনকে মোটেই পছন্দ করিতে পারি নাই। পিতা রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, আমার যদি ক্ষমতা থাকে, তার অপেক্ষা ভাল পাত্র আনিতে পারি। আমি আর কোন কথা না কহিয়া চলিয়া আসিলাম। তার পর চল্লিশ বছর কাটিয়াছে। আমার বোন চারুবালা, বিবাহের কুড়ি বছর পরে, ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে, নিঃসন্তান হইয়া ইহ জগৎ ত্যাগ করিয়াছে। দেখিতে ভাল নয়, ভাল লেখাপড়া জানে না, সেই উপেন এখনও জীবিত আছে, কিন্তু তার সম্বন্ধে আমার মতের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন, রূপের কদর এবং গোটাকয়েক পাশের সহিত গুণের সম্বন্ধ, বেশ বুঝিয়াছি। চল্লিশ বছর বয়সে বিপত্নীক হইয়া, উপেন পুনরায় বিবাহ করে নাই। প্রভিডেণ্ট্‌-ফণ্ডের সব টাকা খরচ করিয়া ভাইপোদের বাড়ি করিয়া দিয়া সুখী হইয়াছে। সে আমার চোখে

এখন খুবই উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। তার ইংরাজী বুকনি বিবর্জ্জিত সাদা-সিধে কথোপকথন, একাগ্রচিত্তে শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইয়া থাকি।

আমার বোন চারুবালার বিবাহের সাত বছর পরে, আমার ছোট বোন কিরণবালার—যাকে আমরা হরি বলিয়া ডাকি—বিবাহের সম্বন্ধ আমি স্থির করিয়াছিলাম। পিতা তখন জীবিত ছিলেন, এবং কলিকাতা হইতে কটকে যাইবার রেলের পথ হইয়াছে। আমার ছোট বোনের বিবাহ, ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে, কলিকাতা-ভবানীপুর নিবাসী নৃত্যকালী মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র, নলিনী-মোহনের সহিত হইয়াছে। নৃত্যকালী অতি উন্নত হৃদয়ের লোক ছিলেন। আমার বোনকে পছন্দ করার পর, তিনি যৌতুক সম্বন্ধে একটিও কথা বলেন নাই। নলিনী সংস্কৃতে এম্, এ, প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়া পাশ করিয়া, শাস্ত্রী উপাধি পাইয়া, সিলেটের মুরারীচাঁদ কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক হইয়াছে। শীঘ্র সে পেনসন্ লইবে। তার দুই পুত্র এবং দুই কন্যা। আমার ভগ্নী জীবিতা আছে। সে তেত্রিশ বছর বয়সে, সংসারের কর্ত্রী এবং দিদিমা হইয়াও, বাড়িতে পড়িয়া ম্যাট্রিক্ পাশ করিয়াছে।

পিতা যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, আহারাদি সম্বন্ধে, গোঁড়া হিন্দুর বাড়ির নিয়ম আমরা পালন করিয়াছি, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর বাড়িতে মাংসের ব্যবহার অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। একুশ বছর হইল, নিরামিষ আহারের পক্ষ-পাতী হইয়া, আমি মাছ-মাংস ত্যাগ করিয়াছি। নিরামিষভোজী হইয়া আমার স্বাস্থ্য ভাল হইয়াছে, এবং সূক্ষ্ম চিন্তা ও কাজ করার ক্ষমতা বাড়িয়াছে। যখন অত্যধিক মাংস খাইতাম, বলির মাংস বাড়িতে আনিতে দিতাম না কিংবা খাইতাম না। বলিদান আমি খুবই ঘৃণার চোখে দেখি। পশুর ন্যায় ভগবান, রক্তের আস্বাদে তুষ্ট, মনে করা অত্যন্ত বীভৎসা কল্পনা।

দশম পরিচ্ছেদ

বন্ধুগণ

বন্ধু কা'র নাই, কিন্তু প্রকৃত বন্ধু কয়জনের আছে? কয়জনই বা বন্ধুতার অর্থ বুঝে কিংবা বন্ধু হইবার যোগ্য? যেমন জীবনের অন্য সব সম্বন্ধ লইয়া আমরা খেলা করি, বন্ধুতার অবস্থাও সেরূপ দাঁড়ায়, কিছুদিন বন্ধুদের নাড়া-চাড়া করিয়া, ক্লান্ত হইয়া, অবহেলা বা বিস্মৃতির রাজ্যে ঠেলিয়া দিই! কেবল দৃঢ় হৃদয়ে প্রকৃত বন্ধুপ্রেম বিকশিত হয়। যে হৃদয়ে সরল সহানুভূতি এবং স্থিরতার স্থান নাই, সৌহৃদ্যের সমৃদ্ধি সেখানে সম্ভব নয়। আন্তরিক সহানুভূতিই অবসন্ন চিত্তকে শান্ত করে। যে অর্থের জন্য এমন হীন কাজ নাই মানুষ করিতে পারে না, তাহা কেবল মরীচিকার মত তৃষ্ণা বাড়ায়, কখন শান্তি দিয়াছে, শুনি নাই।

অল্প বয়স হইতে ভাবপ্রধান হৃদয় লইয়া ঘুরিয়াছি। এক সময়ে বন্ধুতার কল্পনা করিয়া এরূপ বিভোর হইয়াছি, মনে হইয়াছে জীবনে অন্য কোন বন্ধনের প্রয়োজন নাই। কোন একটি সহানুভূতিপূর্ণ চিত্তের সহিত চিত্তের সংযোগ থাকিলে, এরূপ দুঃখ নাই যাহা সহ্য করা যায় না। আমার বয়স তখন সতর, একদিন সন্ধ্যার পর একজন সহপাঠীর পড়িবার ঘরে আমরা তিন জন বন্ধু গল্প করিতেছি, সহসা বন্ধুতার কল্পনায় আমার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। আমি বন্ধুতার চিত্র আঁকিলাম। মুগ্ধ হইয়া আমার দুই বন্ধু বলিল, পৃথিবীতে কি ঐরূপ বন্ধুতা সম্ভব? ঐ দুইজনের মধ্যে একজন, সেদিন হইতে তার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত, আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হইয়াছিল।

যে সহানুভূতি তরুণ হৃদয়কে তৃপ্ত করিত, সে সহানুভূতি এখন আর অন্তঃকরণকে উচ্ছ্বসিত করে না, সহানুভূতির কামনা এরূপ ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। জীবনে আমি পূর্ণ সহানুভূতি কাহারও নিকট পাই নাই, আমার আদর্শ সকলের আদর্শ হইতে এত প্রভেদ। আদর্শের মিল না হইলে, চিন্তামার্গের সহযাত্রী না পাইলে, যথার্থ বন্ধুতা হয় না। সহানুভূতির কামনাকে ভাগ করিয়া, ভিন্ন অংশগুলি পৃথক লোকের দ্বারা পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, তবুও এতগুলি অংশ বাকি রহিয়া গিয়াছে, অনেক সময়ে হৃদয়

শূন্য বোধ করি। তখন অন্তর্জগতের দ্বার খুলিয়া, যেখানে অনন্ত আনন্দের প্রস্রবণ ক্রীড়া করিতেছে, তার মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে চেষ্টা করি, কিন্তু কই বেশি সময় ত ঐভাবে কাটাইতে পারি না? কেন পারি না তাহা জানি, সেজন্য দুঃখ করি না, কবে পারিব তাহাও জানি, তার প্রতীক্ষায় দিন কাটাইতেছি।

কেবল যে বন্ধুর সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য আত্মজীবনীর এই অংশ লিখিতে প্রথম স্থির করি, তাঁর নাম যোগেশচন্দ্র ঘোষ। যোগেশচন্দ্র, কলিকাতা-ভবানীপুর হরিশ চাটুর্য্যে ষ্ট্রীট নিবাসী, তাঁর সময়ের একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার, রায় বাহাদুর যাদবচন্দ্র ঘোষের তৃতীয় পুত্র। যাদবচন্দ্রের দানশীলতার পরিচয় দিয়া, এখনও "যাদব ডাক্তারের ঘাট" টালিগঞ্জে ছোট গঙ্গার উপর রহিয়াছে। যোগেশচন্দ্র ১৮৭০ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৭ খৃঃ ভবানীপুর সাউথ্ সুবার্বান স্কুল হইতে এণ্ট্রেন্স্ পাশ করিয়া, প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করেন। ১৮৯১ খৃঃ ইংরাজীতে কৃতিত্বের সহিত বি, এ, ১৮৯২ খৃঃ এম্, এ, এবং ১৮৯৫ খৃঃ বি, এল্, পাশ করেন। কলিকাতা অক্রূর-দত্ত লেন নিবাসী মাখনলাল দত্তের কন্যা, এবং কটকের সরকারি উকিল রায় বাহাদুর হরিবল্লভর বসুর ভ্রাতা, কলিকাতা বাগবাজার নিবাসী বলরাম বসুর দৌহিত্রী, ইন্দুবালার সহিত তাঁর বিবাহ হয়। কটকে হরিবল্লভের বৃহৎ অট্টালিকার দ্বার, আত্মীয়-স্বজনের জন্য সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিত। উকিল হইবার তিন বছর পরে, যোগেশচন্দ্র কটকে ওকালতি করিবার জন্য হরিবল্লভের বাড়িতে আসিলেন। কটকে যোগেশচন্দ্রের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়। তিনি আমার ওকালতি করার পাঁচ বছর পূর্ব্বে ওকালতি আরম্ভ করেন।

যোগেশচন্দ্র সম্বন্ধে আমার প্রথম ধারণা বড় ভাল হয় নাই। তিনি অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন, এবং কাহারও সঙ্গে মিশিবার সেরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন না। শীঘ্রই তাঁর সম্বন্ধে আমার মতের পরিবর্ত্তন হইল। কিছুদিন মিশিয়া দেখিলাম, তাঁর হৃদয় অত্যন্ত উদার এবং কোমল। তিনি স্বদেশী জিনিষ ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। তখন স্বদেশী জিনিষ ভাল প্রস্তুত হইত না, তিনি মোটা স্বদেশী কাপড়ের চাপ্কান্ পরিয়া কোর্টে যাইতেন। যেরূপ বুদ্ধিমান্ ছিলেন, সময়ে ভাল উকিল হইতেন, কিন্তু কটকে বছর কয়েক থাকিবার পর, হঠাৎ তাঁর স্ত্রী একটি মাত্র ছেলে রাখিয়া পরলোক গমন করিলেন। স্ত্রীর মৃত্যুতে যোগেশচন্দ্র হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত

পাইলেন। ওকালতি ছাড়িয়া, কটকের দর্পণ রাজার ম্যানেজারের কাজ লইলেন। কয়েক বছর ঐ কাজ করিয়া, কটক ছাড়িয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। তারপর অন্য কোন কার্য্য করেন নাই।

কিছু সময় একসঙ্গে কাটাইয়া, উভয়ে বুঝিলাম, অনেক বিষয়ে আমাদের মনের মিল আছে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর, যোগেশচন্দ্র তত্ত্বালোচনার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তখন আমার অধিক সময় ঐ চিন্তায় কাটিত। আমরা সে সময়ে হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতাম না, ইংরাজী দর্শন এবং বিজ্ঞানের আলোচনা করিতাম। কোন সন্ন্যাসীর দেখা পাইলে, যোগ ব্যাপারটা কি জানিতে চেষ্টা করিতাম। আমাদের কটকের বাড়িতে একজন যোগীকে আমরা অনেকক্ষণ জেরা করিয়াছিলাম, কিন্তু দেখিলাম, তিনি কেবল নিয়মগুলি পালন করিয়া অভ্যস্থ কাজ করিযা থাকেন, জ্ঞান অত্যন্ত কম। একবার কলিকাতা নিমতলা ঘাটে একটি যোগীকে আমরা দেখিতে যাই। তিনি তখন ধ্যানস্থ ছিলেন। যোগে বসিয়া বাহ্যিক জ্ঞানশূন্য হইতে, আমি ঐ প্রথম দেখি। ঐ যোগী পরে দক্ষিণ কলিকাতার কেওড়া-তলা ঘাটে আসিয়া কয়েক দিন ছিলেন, সেখানেও আমরা তাঁকে দেখিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু বেশি কিছু বুঝিতে পারি নাই।

যোগেশচন্দ্র আমার ন্যায আমোদ-প্রিয় ছিলেন এবং সঙ্গীত ভালবাসিতেন। আমরা কটক ইউনিযন্ ক্লাবে যোগ দিয়াছিলাম। সেখানে বিলিয়ার্ড খেলিতাম। যোগেশচন্দ্র ভাল বিলিয়ার্ড খেলিতে পারিতেন, এবং একবার ক্লাবে, বিলিয়ার্ডের প্রতিযোগিতায়, চেম্পিয়ন্ হইয়াছিলেন। হিন্দু সঙ্গীত ভাল বুঝিতেন, বিবিধ সুরের রূপের ধারণা তাঁর পরিষ্কার ছিল। হার্মোনিয়ম্ বাজাইতে পারিতেন; গাইতেও চেষ্টা করিতেন, যদিও তাঁর গলা অত্যন্ত খারাপ ছিল। তিনি গান গাইতে আরম্ভ করিলে, আমরা পরিহাস করিতাম, তবুও তিনি গান বন্ধ না করিয়া গাইয়া যাইতেন, আমরা হারিয়া যাইতাম। তিনি টেনিস্, ফুটবল্ এবং ক্রিকেট্ খেলিতে পারিতেন। যোগেশচন্দ্র নিরামিষ আহারী ছিলেন।

১৯০৬ খৃঃ তাঁর সঙ্গে আমার বেশি ঘনিষ্ঠতা হইবার একটি কারণ হয়। ঐ বছর আমার পিতার মৃত্যু হয়। মাতা এবং আমার বড় মাসীমাকে পূজার বন্ধে সঙ্গে লইয়া, পশ্চিমের কয়েকটি তীর্থস্থানে গমন করি। যোগেশচন্দ্রও আমাদের সঙ্গে গিয়াছিলেন। আমরা বৈদ্যনাথ, কাশী, হরিদ্বার, বৃন্দাবন

এবং মথুরা দেখিয়া, আগ্রা, দিল্লী এবং জয়পুরে গিয়াছিলাম। জয়পুর মহারাজার পুরাতন রাজধানী অম্বরে, বাঙ্গালা বিজয়ের পর যশোরেশ্বরীর যে স্বর্ণমূর্ত্তি মানসিংহ লইয়া গিয়াছেন, প্রবাদ আছে, তাহা দেখিতে গিয়াছিলাম। আমাদের সম্মুখে একজন লোক খাপ হইতে তরবারি খুলিয়া, এককোপে একটি মহিষ-শিশুর মাথা কাটিয়া লইয়া মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিল, স্তম্ভান্তঃকরণে দেখিলাম! সন্ধ্যার পর, জয়পুরে আসিয়া দেখিলাম, ভাল ফিটন্ গাড়ি হইতে একজন বাঙ্গালী পূজারি নামিয়া, গোবিন্দজীর আরতি করিতে লাগিলেন!

জয়পুরে আমরা মহারাজার তৎকালীন প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী প্রধান মন্ত্রী, সংসারচন্দ্র সেনের, অতিথি হইয়াছিলাম। সংসারচন্দ্র এবং তাঁর পুত্র অবিনাশচন্দ্রের নিকট এত যত্ন পাইয়াছি, তাঁদের কথা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। প্রবাসে বাঙ্গালী কেন এত সমাদৃত হইয়া থাকে, তাঁদের ব্যবহার দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম।

যতদূর মনে পড়ে, আমার কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করিতে আসিবার পর, আমার ন্যায় যোগেশচন্দ্রেরও হিন্দুদর্শনের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়িল। ঐ সময়ে তিনি যেরূপভাবে জীবন কাটাইতেছিলেন, তার কিছু পরিবর্ত্তন হইল। তাঁর ছেলে গদাধর, মাতামহের নিকট থাকিত। কোন কারণে, সেখানে গদাধরকে আর রাখিতে ইচ্ছা করিলেন না, এবং ভবানীপুরের বাড়ীতে আনিয়া তার শিক্ষার ভার নিজে লইলেন। এত নাম থাকিতে গদাধর কেন ছেলের নাম রাখিলেন জিজ্ঞাসা করাতে, যোগেশচন্দ্র হাসিয়া বলেন, লেখাপড়া না শিখিয়া যদি নাম বানান করিতে ভুল করে, তাই সোজা বানানের নাম রাখিয়াছেন! শান্ত প্রকৃতির লোক হইলেও, মাঝে মাঝে মজার কথা বলিয়া লোককে খুব হাসাইতে পারিতেন।

গদাধরের প্রকৃতি পিতার মত হইয়াছিল, সেইরূপ শান্ত, বুদ্ধিমান এবং সরল। পিতার নিকট পড়িয়া সে শীঘ্র উন্নতি করিতে লাগিল। ম্যাট্রিক্ প্রথম শ্রেণীতে পাশ করিল। কিন্তু যে ছেলেকে কাছে রাখিয়া যোগেশচন্দ্র সুখী হইতে চেষ্টা করিতেছিলেন, হঠাৎ ১৯১৮ খৃঃ তার মৃত্যু হইল। আমি গদাধরকে খুব ভালবাসিতাম, তিনি জানিতেন। তার মৃত্যু সংবাদ আমার নিকট কিছুদিন গোপন রাখিয়াছিলেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর, একমাত্র সন্তানের মৃত্যুতে, তিনি অত্যন্ত কাতর হইলেন। যেরূপ স্ত্রীবিয়োগের জন্য শোক

কথায় প্রকাশ করিতেন না, ছেলের জন্য শোক কখনও বাহিরে প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু সংসারের প্রতি যেটুকু টান ছিল, তাহা অদৃশ্য হইল।

গদাধরের স্মৃতিরক্ষার জন্য, যোগেশচন্দ্র ভবানীপুরের পৈতৃক বাড়ির অংশ, উদ্দেশ্যের উপযোগী করিয়া, "গদাধর আশ্রম" নাম দিয়া, রামকৃষ্ণ মিশনের হাতে দিবেন স্থির করিলেন। সেজন্য একখানি দলিল প্রস্তুত করাইয়া আমাকে দেখাইলেন। দলিলে সর্ত্ত রহিয়াছে দেখিলাম, হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত দেবপূজার ন্যায়, রামকৃষ্ণ পরমহংসের পূজা, ঐ আশ্রমে হইবে। ঐ সর্ত্তের বিরুদ্ধে আপত্তি করিয়া বলিলাম, যেখানে বেদান্ত শিক্ষা দেওয়া হইবে, সেখানে ঘণ্টা-কাঁসর বাজাইয়া একজন সাধুর মূর্ত্তি-পূজা কখনই মানায় না। যোগেশচন্দ্র বলিলেন, তিনি সব বুঝেন, কিন্তু কি করিবেন, মিশন ঐ সর্ত্ত রাখিতে চান, এবং মিশন ভিন্ন অন্য কাহারও হাতে সম্পত্তি দিয়া গেলে তার সদ্ব্যবহার এবং তাঁর উদ্দেশ্য সাধন হইবে না। আমি আর কিছু বলিলাম না, কেবল আইনের ত্রুটি আছে কিনা দেখিয়া দিলাম। কিছুদিন পরে ভবানীপুরে "গদাধর আশ্রম" খোলা হইল।

যোগেশচন্দ্রের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা বাড়িতে লাগিল। একস্থানে থাকিলে, অবসর পাইলেই আমাদের সাক্ষাৎ হইত। আমার স্ত্রী যোগেশ-চন্দ্রকে যত্ন করিয়া খাওয়াইতে ভালবাসিতেন, এবং অনেক সময়ে তিনি আমার বাড়িতে আহার করিতে আসিতেন। তত্ত্বকথা ছাড়া অন্য কথা আমাদের মধ্যে খুবই কম হইত। দুর্ব্বলতা কিংবা যাহাই হউক, ঘুরিয়া ফিরিয়া, বিরাট সৃষ্টির মধ্যে যে উদ্দেশ্য বহুবিধরূপে বিকশিত হইতেছে, তার সঙ্গে কথোপকথনের বিষয় সংযোগ করিতে না পারিলে, আমার মনের তৃপ্তি হয় না। তাহা করিতে না পারিলে আমার মনে হয়, বিষয়টি অসম্পূর্ণ খাপ-ছাড়া করিয়া রাখা হইল। কখন মনে পড়ে না, তত্ত্বকথার আলোচনা করিয়া ক্লান্তি বোধ করিয়াছি। কিন্তু একটি নিয়ম বরাবর পালন করিয়াছি। যখনই বুঝিতে পারি, যার সঙ্গে কথা কহিতেছি, তার তত্ত্বকথা বরদাস্ত হয় না, আমি তার ধার দিয়া যাই না। যে কোন বিষয় লইয়া বাহুল্যভাবে কথা কহিবার ক্ষমতার অভাব আমার কখন হয় না। কোন একটি বিষয় লইয়া কেহ কথা কহিতে ভালবাসে, বুঝিতে পারিলে, আমি ঐ বিষয় ছাড়া অন্য কোন কথা উত্থাপন করি না। আমার বেশ মনে আছে, একদিন কলিকাতার একস্থানে একজন ধনী লোকের সঙ্গে দেখা হইল। কয়েকটি কথার পর বুঝিলাম, তাঁর

বাড়িতে অনেক পাখী আছে, তার গল্প তিনি করিতে ভালবাসেন। কাজের জন্য অনেকক্ষণ ঐস্থানে থাকিতে হইবে দেখিয়া, সমস্তক্ষণ ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে কেবল পাখীর গল্পই করিলাম! তিনি খুবই খুসী হইলেন, কিন্তু আমি কে এবং কি করি, কথা প্রসঙ্গে কোন আভাস না পাইয়া, সামলাইতে না পারিয়া, আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে বাধ্য হইলেন। উপনিষদের বই বাহির হইবার আগে, আমার আত্মীয়-স্বজনই জানিত না, দর্শনের চর্চ্চা অত্যধিক করিয়া থাকি—নিজের চিন্তার বিষয় অপরের নিকট এত কম তুলিতে ইচ্ছা করি। কেবল যোগেশচন্দ্রের সঙ্গে অবিশ্রান্ত তত্ত্বের আলোচনা করিতাম।

যোগেশচন্দ্র সেবক-সেব্য ভাব আশ্রয় করিয়া চরম চিন্তা করিতে ভালবাসিতেন। তাঁর প্রকৃতি মহৎ এবং নির্ম্মল ছিল। নিজের অভাবের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া পরোপকার করিবার জন্য তিনি ব্যগ্র ছিলেন। বুদ্ধিমান এবং পণ্ডিত হইয়াও তাঁর আত্মাভিমান খুবই কম ছিল। আমি তাঁর মধুর সঙ্গ উপভোগ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইতাম। ছোপান কাপড় পরিয়া দিন কাটান নাই, কিন্তু তাঁর হৃদয় অনেক সাধু-সন্ন্যাসী অপেক্ষা উচ্চ এবং বিশুদ্ধ ছিল।

আমার কটকে আইন অধ্যাপক হইবার চারিমাস পরে, ১৭ই নভেম্বর ১৯২৮ খৃঃ, কলিকাতায় তাঁর মৃত্যু হইয়াছে। যখন আশা করিতেছিলাম, অবিচ্ছিন্ন হইয়া জীবনের শেষ ভাগ কাটাইব, সেই সময়ে তিনি ইহলোক ত্যাগ করিলেন। যোগেশচন্দ্রের মৃত্যুতে আমি জীবনের সর্ব্বোত্তম অকৃত্রিম বন্ধু হারাইয়াছি।

মেদিনীপুর জেলার জাড়া গ্রামে, শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। শরতের পিতা, শশিশেখর, কটকে সরকারি কাজ লইয়া গিয়াছিলেন। কটকের রাভেন্সা কলেজ হইতে শরৎ বি, এ, পাশ করে। ১৮৯৭ খৃঃ তার সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। সে বি, এল্ পড়িত, আমি প্লিডারসিপ্ পড়িতাম। বি, এল্ এবং প্লিডারসিপ্ ক্লাশ তখন একসঙ্গে হইত। একজন অধ্যাপক মাথা গুঁজিয়া প্রত্যহ বইয়ের দুই-তিন পৃষ্ঠা কেবল পড়িয়া শুনাইয়া, আমাদের আইন সম্বন্ধে জ্ঞান দান করিতেন! শরৎ ছোটবড় সকলের 'দাদা' ছিল। তার প্রকৃতি সরল ছিল, এবং সে আমোদ খুব ভালবাসিত। আমাদের আমোদ সচরাচর নিরীহ ধরণের ছিল: কাঠজুড়ি কিংবা মহানদীর ধারে

বসিয়া কোন বন্ধুর গান শোনা, দল বাঁধিয়া নদীতে স্নান করা, কটকের কাছাকাছি কোন স্থানে গিয়া আহারাদি এবং গান-বাজনা করা, কিংবা কাহারও বাড়িতে মাংস খাইবার সুবিধা আছে জানিতে পারিলে, তাকে খাওয়াইতে বাধ্য করা। শরৎ আমার অপেক্ষা বয়সে কিছু বড় ছিল।

প্রথম জীবনে শরৎ চিন্তাশীল ছিল না, আমোদ করিয়া সময় কাটাইত। আমি গম্ভীরভাবে বসিয়া আছি দেখিলে, তার চপলতার দ্বারা আমাকে হাসাইতে চেষ্টা করিত। সেই চপল প্রকৃতির শরৎ, কর্ম্মক্ষেত্রে কয়েক বছর কাটাইবার পর, অত্যন্ত ধার্ম্মিক এবং পরোপকারী হইল। বি, এল্ পাশ করিতে না পারিয়া বর্দ্ধমান জজ্-কোর্টের সেরেস্তাদারের চাকরি লইয়াছিল। বর্দ্ধমানে সে সকলের প্রিয় হইয়াছিল, কিন্তু অল্পবয়সে, ১৯২০ খৃঃ, ইহলীলা শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। অনেক সময়ে, ঐ সরল-হৃদয় বন্ধুর স্মৃতি মনকে ব্যাকুল করে।

নরেন্দ্রনাথ বসু আমার কিশোর বয়সের বন্ধু এবং সহপাঠী। নরেন্দ্রনাথের পিতা, মহেন্দ্রনাথ, কলিকাতা-খিদিরপুর সোনাই নিবাসী বসুবংশে জন্মগ্রহণ করেন। এখন সোনাইয়ের চিহ্নমাত্র নাই, পোর্টকমিশনরের গর্ভে অদৃশ্য হইয়াছে। মহেন্দ্রনাথ খিদিরপুরের একজন ভাল ডাক্তার ছিলেন। নরেন, তার মেসো, রায় হরিবল্লভ বসু বাহাদুরের বাড়িতে থাকিয়া পড়িবার জন্য, কটকে গিয়াছিল। বি, এ, পর্য্যন্ত পড়িয়া, দুর্ভাগ্যক্রমে রোগগ্রস্ত হইয়া, খুব অল্পবয়সে, ১৯০৭ খৃঃ, পরলোক গমন করিয়াছে। নরেনের সঙ্গে জীবনের কয়েক বছর খুব ঘনিষ্ঠভাবে কাটাইয়াছি।

আমার সমবয়সী বন্ধুদের মধ্যে যাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল, কেবল দুইজন বাঁচিয়া আছে। একজন হইতেছে, পশুপতি বসু। তার বাড়ি কলিকাতায়। পশুপতি জেলার জজ্ হইয়া, এখন অবসর লইয়াছে। যখনই পাড়া কাঁপাইয়া আমার নাম ধরিয়া কেহ ডাকিতেছে, বাড়ির লোকেরা ধরিয়া লয় যে, আমার বন্ধু পশুপতি ছাড়া আর কেহ নয়! সে কখন কোথায় থাকে তার ঠিক নাই। আজ তার সঙ্গে কলিকাতায় কথা কহিতেছি, কাল হয়ত শুনিব, সে বিলাতে কিংবা জাপানে চলিয়া গিয়াছে! পৃথিবীর অনেক স্থান সে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। সে অত্যন্ত আমোদপ্রিয় এবং তার প্রকৃতি বালকের ন্যায় সরল।

অপর বন্ধুর নাম, রায় সাহেব ব্রজসুন্দর মর্দ্দরাজ। ব্রজসুন্দরের পিতা

জগন্নাথ ভ্রমরবর রায়, কটকের কেন্দ্রপাড়া মহকুমার একজন প্রসিদ্ধ ধার্ম্মিক উড়িয়া জমিদার ছিলেন। ব্রজসুন্দরের সঙ্গে কিছুদিন একসঙ্গে পড়িয়াছি। এফ্, এ, পর্য্যন্ত পড়িয়া সে সব-ডেপুটি চাকরি পায়, এবং সুখ্যাতির সহিত কাজ করিয়া এখন পেন্‌সন্ ভোগ করিতেছে।

কটকে পড়িবার সময়ে, ব্রজসুন্দরের বাড়ি, আমাদের মিলিত হইয়া আমোদ করিবার প্রধান স্থান ছিল। ব্রজসুন্দর অত্যন্ত বন্ধুবৎসল। উড়িয়াদের মধ্যে সুনিয়া একটি প্রধান পর্ব্ব। জমিদারের আদায়-তহসিলের নূতন বছর ঐ দিন আরম্ভ হয়। একবার সুনিয়ার দিন একজন সহপাঠী এবং আমি, ব্রজসুন্দরের সই নকল করিয়া, তার নামে চিঠি পাঠাইয়া, কয়েকজন বন্ধুকে সন্ধ্যার সময় নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলাম! ব্রজসুন্দর জমিদার, সুনিয়ার দিন জমিদারের বাড়িতে নিমন্ত্রিত হওয়া কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নয়, সকলে নিমন্ত্রণ প্রথম যথার্থ বলিয়া মনে করিয়াছিল। সকলের সই হওয়ার পর, নিমন্ত্রণের চিঠি ব্রজসুন্দরের নিকট পাঠাইয়া দিলাম। পরে জানাজানি হইল, নিমন্ত্রণ আমাদের কারসাজী। নিমন্ত্রিত কেহ অবশ্য তার বাড়িতে যাইবার বিষয় ভাবে নাই, কিন্তু ব্রজসুন্দর ছাড়িবার পাত্র নয়, আহারের আয়োজন করিয়া, সন্ধ্যার পর লোক পাঠাইয়া, বাড়ি হইতে আমাদের ধরিয়া লইয়া, খাওয়াইয়া ছাড়িল!

ব্রজসুন্দর বৈষ্ণব, এবং তার প্রকৃতি অত্যন্ত অমায়িক। তাদের বিপুল দেবোত্তর সম্পত্তি এখনও দেব এবং অতিথি সেবায় নিযুক্ত আছে। জীবনের অনেকগুলি আনন্দপূর্ণ দিন তার সঙ্গে কাটাইয়াছি, যার স্মৃতি এখনও হৃদয়কে পুলকিত করে।

পাটনা হাইকোর্টে কাজ করিবার সময়ে, দুইজন হৃদয়বান বন্ধু পাইয়াছি। তাঁরা হইতেছেন, সার্ সৈয়েদ্ সুল্‌তান্ আহমদ্ এবং সৈয়েদ্ আব্‌দুল্ আজিজ্। উভয়ে জনসাধারণের নিকট এত সুপরিচিত, তাঁদের সম্বন্ধে বেশি কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

সুল্‌তান্ আহমদ্ পাটনা হাইকোর্টের জজিয়তি না লইয়া, ব্যারিষ্টারি করা পছন্দ করিয়াছেন। তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্‌সেলার্, এবং কিছুদিনের জন্য, বড়লাট সভার সদস্য হইয়াছিলেন।

আব্‌দুল্ আজিজ্, ব্যারিষ্টার্, দক্ষতার সহিত পাটনা গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা-সচিবের কাজ করিয়াছেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

উড়িষ্যা

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে। শাসন কর্ত্তাদের সহানুভূতির অভাবে উৎকলের দুর্গতি, এতকাল পরে সৌভাগ্যক্রমে দূর হইয়াছে। একটি জাতিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া, বিভিন্ন শাসনাধীনে রাখিয়া কি তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হইয়াছিল, তাহা বুঝা যায় না। ঐরূপ অদ্ভুত ভ্রমের জন্য আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ না করিয়া, সার্ সামুয়েল্ হোর্ নূতন উড়িষ্যা প্রদেশ ঘোষণা করার সময়ে যে আত্মপ্রশংসা লইয়াছিলেন, পড়িয়া খুবই আমোদ বোধ করিয়াছিলাম। উড়িয়া জাতিকে একত্রিত করার জন্য বাঙ্গালী মাত্রেই আনন্দিত হইবে, কারণ স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার মর্ম্মান্তিক আস্বাদ, তারা কর্জ্জনের প্রসাদে কিছুদিন বেশ উপভোগ করিয়াছিল।

উড়িষ্যা প্রদেশ, মানচিত্রে দেখিতে বেশ বড, কিন্তু আসলে তাহা খুব ছোট। শুনিয়াছি, যখন শিমলা শৈলে, হার্ডিঞ্জের দপ্তরে, নূতন বিহার এবং উড়িষ্যা প্রদেশ সৃষ্টি করিবার পরামর্শ খুব গোপনে চলিয়াছিল, বিলাতে কর্ত্তাদের মতে, ঐ প্রদেশ আয়তনে যথেষ্ট বড বিবেচিত হইতে না পারে, সে আশঙ্কা খুবই হইয়াছিল। তখনও উড়িষ্যার ঐ মানচিত্রের আকার খুব কাজে লাগিয়াছিল। উড়িষ্যার যে অংশ দেশীয় রাজাদের অধীন, ইংরাজ শাসনাধীন অংশ অপেক্ষা তাহা বড। ঐ রাজ্যগুলিকে গডজাত-মহল বলে। ময়ূরভঞ্জ তাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। গডজাত-মহলের জন্যই উড়িষ্যাকে অত বড় দেখায়। ময়ূরভঞ্জ এবং অন্য দু'একটি রাজ্য ছাড়া, গডজাত-মহলের সুখ্যাতি করিতে পারিলাম না। ঐ সব দেশের সাধারণ লোকেরা, ইংরাজ-শাসনাধীনে আজ আসিতে পারিলে, কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবে না!

উড়িষ্যা ভারতের সাগরতীরবর্ত্তী একটি প্রদেশ। সমুদ্র এবং শৈলশ্রেণীর জন্য উহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতি মনোহর। ভগ্ন উর্ম্মিমালার জন্য পুরীর সমুদ্রকূল বিখ্যাত। এক সময়ে উড়িষ্যার স্বাস্থ্য ভাল ছিল। পার্শ্ববর্ত্তী বাঙ্গালা প্রদেশ হইতে ম্যালেরিয়াজীর্ণ অনেক বাঙ্গালী রোগমুক্ত হইবার জন্য

উড়িষ্যায় আসিত। ১৯২২ খৃষ্টাব্দ হইতে উড়িষ্যার স্বাস্থ্যের ঘোর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ঐ বছর ম্যালেরিয়া ঢুকিয়া, উড়িষ্যাকে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত বাঙ্গালা দেশের প্রতিদ্বন্দ্বী করিয়া তুলিয়াছে। যে সব স্থানে যাইয়া লোকেরা স্বাস্থ্যের উন্নতি করিয়া আসিত, সেখানে লোকেরা এখন কুইনাইনের বড়ি সঙ্গে লইয়া যায়!

বালুকাবহুল জমির জন্য উড়িষ্যার উর্ব্বরা-শক্তি কম। আহারের দ্রব্য এখন সব পাওয়া যায়। ছেলেবেলায়, মনে আছে, পূজার বন্ধে কলিকাতায় আসিয়া ভাল আলু, পটল, এবং বেগুণ খাইয়া কি আনন্দ হইত। তখন উড়িষ্যায় কেবল গুঁড়ি গুঁড়ি আলু পাওয়া যাইত; কেন্দ্রাপাড়া হইতে সামান্য পটল আসিত, তার আস্বাদ অনেক সময়ে তিক্ত; বেগুণ পাওয়া যাইত, ছোট এবং শক্ত; পৌষ মাসের শেষে অতিকষ্টে কপির মুখ দেখা যাইত। এখন স্থানীয় ভাল আলু, মুক্তকেশী বেগুণ, এবং সুস্বাদু পটল যথেষ্ট পাওয়া যায়। কপির চাষ এখন কটকে এত ভাল হয়, কয়েক বছর দেখিতেছি, কলিকাতায় আসিবার সময়, কটক হইতে ঝুড়ি ঝুড়ি কপি লোকেরা লইয়া আসে। মাছ তেমন রকমারি পাওয়া যায় না। বালেশ্বর এবং পুরী হইতে সমুদ্রের মাছ, প্রত্যহ বিক্রয়ের জন্য কলিকাতার বাজারে আসিয়া থাকে। গোধনের অবস্থা উড়িষ্যায় খুব খারাপ, সেজন্য দুধ প্রচুর পাওয়া যায় না, এবং দরও চড়া। সচরাচর সব আহার্য্যের মূল্য কলিকাতার দরের ন্যায়, পশ্চিমের সস্তা দরের সঙ্গে তুলনা হয় না। তরি-তরকারি বাঙ্গালা দেশের মত সুস্বাদু নয়। অবশ্য বাঙ্গালা দেশের অপেক্ষা পশ্চিমের শাকশব্জী অধিক সুমিষ্ট।

উড়িষ্যা দেশ অত্যন্ত গরিব। জমিদারের অবস্থা খারাপ, চাষীর অবস্থা তার অধিক খারাপ। কয়েকটি স্থান ছাড়া, রাজস্বের বন্দোবস্ত সর্ব্বত্র অস্থায়ী। জমিদার এবং চাষীর চেষ্টায় যাহা কিছু উন্নতি হয়, তার ফল ভোগ করেন সরকার বাহাদুর, নূতন বন্দোবস্তে অধিক রাজস্ব চাপাইয়া! রাজস্বের সহিত চাষীর করও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া, উড়িষ্যায় বন্যার উপদ্রব খুবই আছে। পুরাতন উড়িষ্যায় কোনও জমিদারের আয়, একলক্ষ টাকার বেশি ছিল না; কেবল কয়েকটি পুরাতন "কিল্লার" অধিকারীর আয় কিছু বেশি, যারা এখন জমিদার গণ্য হইয়া থাকে। ব্যবসায়ের অবস্থা ভাল নয়। মামলা বৃদ্ধি বাঞ্ছনীয় নয়, কিন্তু তার সংখ্যার দ্বারা, দেশের আর্থিক অবস্থার আন্দাজ অনেকটা পাওয়া যায়। পুরাতন উড়িষ্যায়, কটক, পুরী, বালেশ্বর, সাধারণ

হিসাবে তিনটি জেলা হইলেও, জজিয়তি হিসাবে একটি জেলা ছিল। পুরী এবং বালেশ্বরের দাওয়ানি আপিলের বিচার কটকে হইত, এবং সচরাচর একজন, দৈবাৎ দুইজন, সবজজ্ কটকে থাকিয়া, তিন জেলার বড় দাওয়ানি মোকদ্দমা বিচার করিতেন। পুরী এবং বালেশ্বরে কেবল স্বতন্ত্র ম্যাজিষ্ট্রেট্ এবং মুন্সেফ্ থাকিতেন। নূতন উড়িষ্যায়, গঞ্জাম আসাতে, আর্থিক অবস্থার অপেক্ষাকৃত পরিবর্ত্তন হইবে, কারণ ঐ জেলায় কতগুলি ধনী জমিদার এবং ব্যবসায়ী লোক আছে। উড়িষ্যার গড়জাত-মহলে, আয়বৃদ্ধির নানাবিধ প্রাকৃতিক উপায় সময়ে উদ্ঘাটিত হইতে পারে, কিন্তু সাধারণ উড়িষ্যা তাহাতে উপকৃত হইবে না। অধিক পরিমাণে ব্যবসায় এবং শ্রম-শিল্পের উন্নতি না হইলে, দেশের অর্থোন্নতির অন্য উপায় নাই। শিল্পের জন্য উড়িষ্যা প্রসিদ্ধ, কলাকুশলতা উড়িষ্যার লোকদের মধ্যে অভাব নাই। যারা দেশের যথার্থ মঙ্গল কামনা করে, তাদের কর্ত্তব্য, কলা এবং শিল্পের বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া, জনসাধারণের মধ্যে তার বহুল প্রচার করা।

খৃষ্টীয় দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত, পুরী, এবং উড়িষ্যার অন্যান্য স্থানে, বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব খুব বেশি ছিল। পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দির যে এক সময়ে বৌদ্ধ মন্দির ছিল, এবং জগন্নাথ-মূর্ত্তি যে বুদ্ধ-মূর্ত্তির স্থানাধিকার করিয়াছে, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ঐ বিশ্বাস হইয়াছে দুই কারণে। মন্দিরের বর্ত্তমান দেবমূর্ত্তি, প্রথম কারণ। মন্দিরের শিল্পকার্য্যের সঙ্গে দেবমূর্ত্তির কোন সামঞ্জস্য নাই—ঐরূপ সুন্দর মন্দিরের শিল্পী কখনও ঐরূপ মূর্ত্তির শিল্পী হইতে পারে না। মন্দিরের অধিকারীরা যে তাহা বেশ বুঝিতেন—নিজে বিশ্বকর্ম্মা মূর্ত্তি প্রস্তুত করিতেছিলেন, রাজার দোষে অসময়ে দ্বার খোলার জন্য, তাহা অসম্পূর্ণ রাখিয়া চলিয়া গিয়াছেন—এই কিংবদন্তি হইতে প্রকাশ পায়। আমি এখানে সূক্ষ্ম ঐতিহাসিক তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করি না। সকলেই জানে, তথা-কথিত ইতিহাসের সাহায্যে, রামের বোঝা অনেক সময়ে রহিমের ঘাড়ে চাপান হইয়াছে! উত্তর-ভারতবর্ষে, হিন্দুর অনেকগুলি কীর্ত্তি, প্রস্তর ফলক বদলাইয়া, মুসলমানের কীর্ত্তি বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে! তবে, পুরীর মন্দিরের দেবমূর্ত্তি যে পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পুরীর "মাদলা" পাঁজীতে, কালাপাহাড়ের দ্বারা মন্দিরের বিগ্রহ নষ্ট করার বিষয় উল্লেখ আছে। কয়েকবার বিগ্রহ দীর্ঘকালের জন্য স্থানান্তরিতও করা হইয়াছিল; সেই বিগ্রহ যে পুনরায় আনা হইয়াছে, বলা কঠিন। বিগ্রহ

পরিবর্ত্তনের সহিত, সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য, মন্দিরের গায়ের ছবিগুলিও পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় কারণ, জগন্নাথ দেবের ভোগ প্রস্তুত করার নিয়ম, আদি বুদ্ধ-মূর্ত্তির স্বপক্ষতা করে। যারা ভোগ প্রস্তুত করে এবং রন্ধনশালা হইতে ভোগ বিগ্রহের সম্মুখে লইয়া যায়, তারা ব্রাহ্মণ নয়। পুরীর রাজা কতগুলি শূদ্র চাষাকে, উপবীত ধারণ করার অনুমতি দিয়া, ব্রাহ্মণে পরিণত করিয়াছেন। তাদের হলুয়া (চাষী) বামুন বলে। তাদের গোত্র, হলধর। তারা, শূদ্র পূর্ব্বপুরুষদের মত, এখনও সাহু, বিশ্বাল, ইত্যাদি, উপাধি ধারণ করিয়া থাকে। হলুয়া বামুনদের সহিত উড়িষ্যার কান্যকুব্জ হইতে আগত ব্রাহ্মণদের বিবাহ হয় না, কিংবা তাদের প্রস্তুত অন্ন উড়িষ্যার অন্য কোন ব্রাহ্মণ গ্রহণ করে না। ঐ হলুয়া বামুনরাই জগন্নাথ দেবের ভোগ প্রস্তুত করে, এবং রন্ধনশালা হইতে ভোগ বিগ্রহের নিকট লইয়া যায়। অন্য কোন হিন্দু বিগ্রহের ভোগ শূদ্রের দ্বারা প্রস্তুত করা হয় না। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, মন্দিরের বিগ্রহের ভোগ, প্রথম হইতে শূদ্রেরা প্রস্তুত করিত। বৌদ্ধদিগের মধ্যে জাতি-বিচার নাই, সেজন্য আদি-বিগ্রহের ভোগ পাক করার জন্য ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু মন্দিরে হিন্দু-বিগ্রহ স্থাপনের পর, কৌশল করিয়া, বিত্তভোগী শূদ্র পাচকদের উপবীত ধারণ করার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। জগন্নাথ দেবের ভোগসম্বন্ধে জাতিবিচার নাই, সকলে জানে। তাহা ছাড়া, বুদ্ধদেবের একটি দাঁত বহুকাল পুরীতে ছিল, তাহা পরে সিংহলে পাঠান হয়। বৌদ্ধদের মধ্যে রথোৎসব আছে, জগন্নাথ দেবের প্রধান উৎসব রথযাত্রা, তার অনুকরণ মাত্র।

উড়িষ্যায় কায়স্থদের মধ্যে জাতির নিয়ম সেরূপ কড়াকড়ি দেখা যায় না। একটি প্রচলিত কথা আছে, "বড়ি বড়ি করণ, ছিণ্ডি ছিণ্ডি চষা", অর্থাৎ, বাড়িতে বাড়িতে করণ বা কায়স্থ হয়, এবং ছোট হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ চাষায় দাঁড়ায়। বাড়া এবং কমার কারণ, যথাক্রমে, অর্থবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য, তাহা বলা দরকার করে না। কথায় সাজাইয়া ঐরূপ বলা হইয়াছে, কিন্তু একবার যে সমাজে "করণ" বলিয়া গণ্য হইয়াছে, তার বংশ কখনও চাষায় পরিণত হয় না। আমি দেখিয়াছি, চাষা-শ্রেণীর লোক, শিক্ষিত এবং ধনী হইয়া করণদের সঙ্গে কাজ করিয়া, জাতিতে বড় হইয়াছে।

দেশের সাধারণ লোকেরা ধর্ম্মভীরু। শক্তি উপাসনার প্রচলন, এক সময়ে

ব্রাহ্মণদের মধ্যে খুব বেশি ছিল, এখনও অনেক ব্রাহ্মণ শাক্ত, কিন্তু দেশের অধিকাংশ লোকেরা বিষ্ণুভক্ত, এবং জগন্নাথ দেবের উপর ভক্তি অচলা। চৈতন্যর উডিষ্যায় আসার সময় হইতে, উড়িষ্যা বৈষ্ণব-প্রধান দেশ হইয়াছে, এবং একটিও ক্ষুদ্রগ্রাম নাই, যেখানে ভাগবৎ পাঠ এবং সংকীর্ত্তন হয় না। বাধাকৃষ্ণের লীলা লইয়াই দেশের অধিকাংশ পুরাতন গ্রন্থ এবং গীত রচনা করা হইয়াছে, এবং রথযাত্রা ছাড়া দেশের প্রধান ধর্ম্মোৎসব হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন এবং দোল। উডিষ্যায বাঙ্গালীরা, বাঙ্গালার প্রচলিত ধরণে, দুর্গোৎসব এবং কালীপূজা করিয়া থাকে। উড়িয়াদের মধ্যে দেবী পূজা, ঘট কিংবা ধাতু মূর্ত্তির সাহায্যে সম্পন্ন হয়।

অল্পদিন হইল একজন বাঙ্গালী ইতিহাস প্রণেতার মাথায় এক খেয়াল ঢুকিয়াছে যে, চৈতন্যর অভ্যুদয়ের সময় হইতে উডিষ্যার অবনতি হইয়াছে! তাহা পডিয়া, এক শ্রেণীর উডিয়ারা ধরিয়া লইতে ইচ্ছুক, ইহা যথার্থ। আমি কার্য্য-কাবণের এরূপ বীভৎস সম্বন্ধ পাতান কখনও দেখি নাই। ইতিহাসের চর্চ্চা খুবই করিযাছি, কিন্তু কোন ইতিহাস-প্রণেতার মস্তিষ্ক ঐ লেখকের মস্তিষ্কের মত উর্ব্বর দেখি নাই। ঐ লেখকেব মত যুক্তিকে আমাদের ন্যায় শাস্ত্রে বলিয়াছে, "কাকতালীর ন্যায়"। অর্থাৎ, তাল গাছে পাকা তাল রহিয়াছে, একটি কাক যেমন তার পাশ দিয়া উড়িয়া গেল, ঠিক ঐ সময়ে পাকা তালটি পড়িযা গেল, তাহা দেখিয়া লোকেরা যেরূপ ভাবে কাকই তালটি ফেলিয়া দিয়াছে, ঐ লেখকের যুক্তি ঠিক সেইরূপ! লেখকের কথা সত্য মনে করিতে হইলে, ধরিয়া লইতে হয়, উড়িষ্যার অবনতি, খৃষ্টীয় ষোল শতাব্দী হইতে হইয়াছে, কারণ চৈতন্যর জন্ম হয় ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে, এবং তাঁর দেহত্যাগ হয় ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে। একবার দেখা যাক, ঐ সময়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে হিন্দুর অবস্থা কিরূপ ছিল। ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে, ফতেপুর শিক্‌রির্ যুদ্ধের পর, উত্তর ভারতবর্ষ মোগলদের করগত হয়। ঠিক ঐ সময়ে, দেখিতে পাই, দক্ষিণ ভারতবর্ষ বিপ্লবের দ্বারা ছিন্ন-ভিন্ন হইতেছে। কোন উদ্ভাবন-ক্ষম ঐতিহাসিককে দেখিতে পাই না, উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতবর্ষের ঐ রাজনীতিক অবনতির জন্য, কোন ধর্ম্মবিশেষকে দায়ী করিতে! কেবল সম-সাময়িক উড়িষ্যার রাজনীতিক অবস্থার জন্য ধর্ম্মগত কারণ অন্বেষণ করার প্রয়োজন হইল!

ঐ বাঙ্গালী লেখকের উদ্ভাবনার কারণ নির্ণয়ের জন্য, আমি যথেষ্ট সাহায্য

করিতে পারি। উড়িষ্যার সাধারণ লোকেরা জানে না, বাঙ্গালা দেশে, এমন কি চৈতন্যর জন্মস্থান নবদ্বীপে, একশ্রেণীর লোক আছে, যারা শাক্ত বা তান্ত্রিক, যাদের বিদ্বেষ বৈষ্ণবদের প্রতি অত্যন্ত অধিক। তাদের পূর্ব্বপুরুষরাই চৈতন্যকে নানারূপে বিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, এবং তারাই বৈষ্ণব ধর্ম্মকে "নেড়া-নেড়ীর" ব্যাপার বলিয়া ঠাট্টা করিয়া থাকে, এবং অনেক দোষের বোঝা বাছিয়া বৈষ্ণবদের উপর চাপাইয়া থাকে। ঐরূপ বিদ্বেষ আমার সম্মুখে প্রকাশ করিতে দেখিয়াছি। গত বছর গ্রীষ্মকালে, কলিকাতায় আমার একজন শ্রদ্ধেয় বন্ধুর সহিত, অনেকদিন পরে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তাঁকে উড়িষ্যার সকলে জানে। ঐ সময়ে, অল্পবয়স্ক একজন ব্রাহ্মণও—তিনি অধ্যাপকের কাজ করেন—আমার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। আমি জানিতাম না যে উভয়ের দেশ নবদ্বীপে। আমার বন্ধুর পূর্ব্বপুরুষরা নবদ্বীপের শাক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন, সেদিন প্রথম জানিলাম। অল্পবয়স্ক ব্রাহ্মণ অধ্যাপকের পূর্ব্বপুরুষরাও ঐ সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ, তাহাও শুনিলাম। কিছুক্ষণ পরে, তাঁদের মধ্যে চৈতন্য এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মের কথা উঠিল। চৈতন্যর একমাত্র অপরাধ, তিনি ঈশ্বর প্রেমে পাগল হইয়া জীবন কাটাইতেন, এবং অপরকে ঐ প্রেমে বিভোর করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু ঐ দুইজন শিক্ষিত বাঙ্গালীর, চৈতন্য এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ দেখিয়া আমি অবাক্ হইলাম! চৈতন্যর প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া যে ঐ বাঙ্গালী গ্রন্থকর্ত্তা ঐরূপ আজগুবি কথা লিখিয়াছেন, তাব কোন সন্দেহ নাই।

এমন কোন ধর্ম্ম নাই, যার মূলে ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি, এবং তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা, দেখিতে পাওয়া যায় না। চৈতন্য কি প্রেমধর্ম্মের প্রচার জগতে প্রথম করিয়াছেন? তাঁর জন্মের পনর শতাব্দী পূর্ব্বে, আর একজন মহাপুরুষ, যাঁকে আমি চৈতন্যর অপেক্ষা কম সম্মান করি না, তিনি প্রেম-ধর্ম্মের প্রচার করিয়া জগৎকে মাতাইয়া তুলেন। তিনি যীশু খৃষ্ট। তিনি লোকদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব যেরূপ জাগাইতে চেষ্টা করেন, সেরূপ আর কেহ করিয়াছে কি না সন্দেহ। চৈতন্য প্রেমধর্ম্ম বিলাইতে গিয়া শরীরে আঘাত পাইয়াছিলেন, কিন্তু ঐ মহাপুরুষ যীশু, প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়া হৃষ্ট-চিত্তে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। যীশু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াও ক্ষমা গুণের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। তিনি ঈশ্বরকে প্রার্থনা করেন, তাঁর হত্যাকারকদের

ক্ষমা করিতে, কারণ তারা বুঝে না, কি পাপ তারা করিতেছে! সেই যীশুর ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া, কই ইয়োরোপবাসীদের ত অবনতি হয় নাই, কেবল উড়িষ্যার কি না অবনতি হইল, কিছুকাল প্রেমধর্ম্মে মাতোয়ারা হইয়া!

উড়িষ্যার মৌলিক রীতি, উত্তরে, বালেশ্বর অঞ্চলে, কতক পরিমাণে, বাঙ্গালা দেশের, এবং খোরধার দক্ষিণে, অধিক পরিমাণে, মান্দ্রাজ বা দক্ষিণ অঞ্চলের রীতির দ্বারা, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। বালেশ্বরের স্ত্রী-পুরুষের কাপড় পরার ধরণ এবং অনেকগুলি রীতি, বাঙ্গালীর মত, এবং কথিত ভাষার মধ্যেও বাঙ্গালা কথার ধরণ পাওয়া যায়; পুরী এবং গঞ্জামে, মান্দ্রাজ দেশের রীতির প্রভাব অত্যন্ত বেশি।

উডিয়াদের পছন্দ করি আমি দুই কারণে। যাদের সঙ্গে জীবনের এতদিন কাটাইয়াছি, তাদের প্রতি টান হওয়া স্বাভাবিক। দ্বিতীয় কারণ, তাদের বিনয়ের ভাব, যে জন্য আমি মান্দ্রাজীদেরও পছন্দ করি। যাদের "সব্‌জান্তা" ভাব ধরণের গোড়ায় আছে, তাদের পছন্দ করিতে আমার সময় লাগে, তাদের ভাল দিক দেখার পর। আমার মনে হয়, বিনয়, যদি হীন তোষামোদে পরিণত হইয়া আত্মসম্মান জ্ঞান নষ্ট না করে, মানুষকে সময়ে জ্ঞানী এবং চরিত্রকে দৃঢ় করিয়া থাকে। লোক বিভিন্ন প্রকৃতির দেখা যায়, সেজন্য দুএকজন দাম্ভিক হওয়া সত্ত্বেও, জ্ঞানী এবং চরিত্রবান হইয়া থাকে, কিন্তু সচরাচর বিনয়ের অভাব, জ্ঞান বৃদ্ধির পক্ষে বাধা দেয়, এবং চরিত্রের মাধুর্য্য হরণ করে।

আমি উড়িয়াদের দোষ-গুণ ভাল জানি, কিন্তু উপস্থিত দোষ-গুণের দ্বারা কোন জাতির ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণ করিতে একান্ত অনিচ্ছুক। বেশ বুঝিয়াছি, অনেক ভুলের মধ্যে ইহা একটি বিষম ভুল। কোন জাতির এক অবস্থা কি চিরকাল থাকে? জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে, তার উত্তরে একটা বড় "না" বলিতে হয়। যারা কোন জাতিকে এক সময়ে আকাশে তুলিয়াছে কিংবা নগণ্য মনে করিয়াছে, এক শতাব্দীর পর, সে জাতির রূপ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাহা না হইলে, পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিগুলিকে, হিন্দুর জাতিবিভাগের মত, চিরকাল এক ভাবে, বড় কিংবা ছোট হইয়া, কাটাইতে হইত! সময়ে উচিত শিক্ষা এবং সংস্কারের গুণে জাতি বড়, এবং তার অভাবে জাতি ছোট হয়। পুরাকালে, ইস্‌রেল্ জাতির লোকদের ধারণা ছিল, তারা ঈশ্বরের প্রিয়জাতি! আসলে বিধাতার চোখে কোন জাতি প্রিয়

কিংবা কোন জাতি ঘৃণ্য নয়। একসময়ে ভারতের ইতিহাসে উৎকল গৌরবান্বিত স্থান অধিকার করিয়াছিল। উচিত শিক্ষা পাইলে, উড়িয়া জাতি সময়ে ভারতের যে কোন জাতির সমকক্ষ হইতে পারিবে। অর্দ্ধশতাব্দী যদি কোন জাতি পিছাইয়া পড়ে, সে জাতি চিবকাল ঐ অবস্থায থাকিবে, ইহা কখন সম্ভব নয়। যাহাতে উর্দ্ধে উঠিতে পারে, সেজন্য উচিত পন্থা অবলম্বন করা দবকার। এখনও কিছুদিন উড়িষ্যাকে অন্য দেশের লোকের সাহায্য লইতে হইবে। সেজন্য লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই। এক সময়ে জাপান ঐরূপ সাহায্য লইয়াছিল, কিন্তু এখন তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা জগতের সব জাতিরা আশঙ্কার চোখে দেখিয়া থাকে। কাল কাগজে পড়িলাম, আগামী বছর রাজার অভিষেকের সময়ে, কোটি কোটি টাকার যে সব জিনিষের প্রয়োজন, তাহা খুব অল্প মূল্যে জাপান যোগাইতে পারিবে, এবং তাহা হইলে দেশের লোকেরা লাভের অংশ হইতে বঞ্চিত হইবে, সেজন্য বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ খুবই চিন্তিত হইয়াছেন! কিন্তু ঐ জাপান, পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বে, ঐ সব জিনিষ প্রস্তুত করিবার প্রণালী, ইয়োরোপে গিয়া কিংবা ইয়োরোপীয় লোক রাখিয়া শিক্ষা করিয়াছিল।

আমার এই বৃত্তান্তের মধ্যে,উড়িষ্যাবাসী বাঙ্গালীর কথা স্বতই আসিয়া পড়ে। বাঙ্গালীরা অর্থোপার্জ্জনের জন্য স্বেচ্ছায় উড়িষ্যায় আসিবার পূর্ব্বে, সরকার তরফ্ হইতে, শাসন কার্য্যের সাহায্যের জন্য যে তাদের আনা হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমি এই অংশ ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে, জুলাইয়ের শেষভাগে, কলিকাতায় বসিয়া লিখিতেছি। তিন দিন পূর্ব্বে আমার একজন আত্মীয়, যে কলিকাতার জেনেরাল্ পোষ্ট আফিসে কাজ করে, আমাকে বলিয়াছে, কটকে পোষ্ট-মাষ্টার-জেনেরালের অফিস্ হইবে, সেখানে লোকের অভাব, অফিস্ বসাইবার জন্য তাদের অফিস্ হইতে কয়েকজন লোক যাইবে। সর্ব্বপ্রথম যে বাঙ্গালীরা উড়িষ্যায় আসে, তারা অধিকাংশই কায়স্থ এবং বেশির ভাগ উড়িষ্যার পার্শ্ববর্ত্তী জেলার লোক। জাহাজের রাস্তা হইবার পর, কলিকাতা এবং অন্য স্থান হইতেও বাঙ্গালীরা আসিয়াছে। উড়িষ্যায় বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের সংখ্যা অত্যন্ত কম, অনেক সময়ে সামাজিক কাজের জন্য ভাল পুরোহিত পাওয়া যায় না।

বাঙ্গালী এবং উড়িয়ার মধ্যে, অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য এত বেশি, উড়িষ্যায় বাঙ্গালী, কিংবা বাঙ্গালায় উড়িয়া আসিয়া, উল্লেখযোগ্য কোনও অসুবিধা ভোগ

করে না। বিহার এবং উড়িষ্যা নূতন প্রদেশ যখন প্রথম হয়, এবং কাজের জন্য উড়িয়াদের কলিকাতায় না আসিয়া পাটনায় যাইতে হইল, তখন অনেক উড়িয়াদের মুখে শুনিয়াছি, তারা পাটনায় আসিয়া বুঝিতে পারিল যে, স্বতন্ত্র দেশে আসিয়াছে, বিহারীদের সঙ্গে তাদের এত প্রভেদ। ভাষার সাদৃশ্য এত বেশি, উড়িয়াকে বাঙ্গালা ভাষা এবং বাঙ্গালীকে উড়িয়া ভাষা শিখিতে সামান্যই চেষ্টা করিতে হয়। আমি উড়িয়া ভাল লিখিতে পারি, কিন্তু কবে কার কাছে লিখিতে শিখিয়াছি, তাহা মনে পড়ে না।

উড়িষ্যায় বাঙ্গালীরা প্রথম হইতে দেশের সব অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছে। বাঙ্গালীরা উড়িয়াদের সঙ্গে মিশিয়া 'কটক প্রিন্টিং কোম্পানি' নাম দিয়া কটকে একটি সঙ্ঘ স্থাপন করে, এবং ঐ সঙ্ঘ হইতে উড়িষ্যার প্রথম সাপ্তাহিক কাগজ, "উৎকল দীপিকা", যাহা এখন দৈনিক কাগজে পরিণত হইয়াছে, বাহির হয়। ঐ কাগজের প্রথম সম্পাদক ছিলেন, রায় বাহাদুর গৌরীশঙ্কর রায়; তিনি আজীবন ঐ কাগজের সম্পাদকতা করেন। গৌরীশঙ্করের মত উদারচেতা বাঙ্গালী উড়িষ্যায় খুব কম দেখিয়াছি। কটকের টাউন হল্‌ তাঁর দানশীলতার পরিচয় দিতেছে। তিনি ধনী ছিলেন না, কিন্তু তাঁর সর্ব্বস্ব সাধারণের সেবায় নিযুক্ত করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। আমার অল্পবয়সে, চারি জনকে দেখিতাম উড়িয়া ভাষার সেবা করিতে; তাঁদের মধ্যে একজন উড়িয়া, তাঁর নাম ফকিরমোহন সেনাপতি; দুই জন বাঙ্গালী, রায় বাহাদুর রাধানাথ রায় এবং রায় বাহাদুর রামশঙ্কর রায়; এবং চতুর্থ জন মহারাষ্ট্রী, তিনি রায় বাহাদুর মধুসূদন রাও। ফকিরমোহন এবং মধুসূদন ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করেন। রাধানাথ যে একালের উড়িষ্যার একজন বিখ্যাত কবি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তিনি উড়িষ্যা বিভাগের স্কুল ইন্‌স্‌পেক্‌টার ছিলেন। রামশঙ্কর গৌরীশঙ্করের ছোট ভাই, কটকে ওকালতি করিতেন। রামশঙ্কর নাটক এবং উপন্যাস রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। এক সময়ে তাঁর নাটকগুলি খুব আগ্রহের সহিত অভিনীত হইত।

উড়িষ্যার প্রথম রাজনীতিক সমিতি, "উড়িষ্যা এসোসিএন্‌"র বাঙ্গালী সভ্যের সংখ্যা, উড়িয়া সভ্য-সংখ্যা অপেক্ষা কম ছিল না, এবং রায় বাহাদুর রামশঙ্কর রায় বহুদিন তার সম্পাদক ছিলেন। জেলা বোর্ড এবং মু্যনিসি-প্যালিটিতে বাঙ্গালীরা যোগ দিয়া দেশের সেবা করিয়াছে। কটকের প্রথম বেসরকারি ইংরাজী হাইস্কুল, একজন বাঙ্গালী, প্যারিমোহন আচার্য্য, স্থাপন

করেন। প্যারীমোহন ব্রাহ্মণ এবং কটকে মোক্তারি করিতেন। "প্যারীমোহন একাডেমী" কটকের একটি ভাল হাই-স্কুল।

বালেশ্বরের আধুনিক সদনুষ্ঠানগুলি, রায় বাহাদুর রাধাচরণ দাসের সময়ের পূর্ব্বে, মহারাজা বৈকুণ্ঠনাথ দের যত্নে এবং অর্থে হইয়াছে। বাঙ্গালীদেব মধ্যে বৈকুণ্ঠনাথই মহারাজা উপাধি পাইয়াছিলেন। তিনি বালেশ্বরের একজন বড় জমিদার ছিলেন।

পুরীর উল্লেখযোগ্য সদনুষ্ঠানগুলিব ভার, প্রথমে ধনী হিন্দুস্থানী মোহন্তরা লইয়াছিলেন। পুরীতে বাঙ্গালীর সংখ্যা বরাবরই কম। কেহ যেন মনে না করে, দেশের সব সদনুষ্ঠান প্রথমে কেবল বাঙ্গালীর যত্নে হইয়াহে। ইহা কখনই সম্ভব নয়। উডিষ্যায় বাঙ্গালীব সংখ্যা শতকরা একজন। আমার বলিবার একমাত্র উদ্দেশ্য এই, উডিষ্যায় বাঙ্গালীরা কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তায় দিন কাটায় নাই।

উড়িয়া ও বাঙ্গালীর মধ্যে প্রগাঢ সদ্ভাব প্রথম হইতে স্থাপন হইয়াছে, এবং তাহা এখনও একরূপ অক্ষুণ্ণ আছে। সুখে দুঃখে, বাঙ্গালী এবং উড়িয়া, মিলিয়া মিশিয়া দিন কাটাইতেছে, এবং চিরকাল ঐ ভাবে কাটাইবে। দুঃখের সহিত কিন্তু বলিতে বাধ্য হইলাম, কিছুদিন হইল, অতি ক্ষুদ্র একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে, ঈর্ষার জন্য, বহুকালের এই সম্প্রীতিতে কিছু ব্যাঘাত জন্মিয়াছে, কিন্তু তাহা অতি অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে।

এই মনোমালিন্যের জন্মস্থান, বার লাইব্রেরি বা উকিলখানা। কটক, পুরি এবং বালেশ্বরের ভাল উকিল, প্রথম হইতে বাঙ্গালীরা হইয়া আসিয়াছে, এবং এখনও বাঙ্গালী উকিলের সংখ্যা ক্রমশ কম এবং উড়িয়া উকিলের সংখ্যা অনেক বেশি হওয়া সত্ত্বেও, সে অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। শীঘ্র একসময় আসিবে, যখন উড়িষ্যার বাহির হইতে আর বাঙ্গালী উকিল আসিবে না, কেবল স্থানীয় বাঙ্গালীর ছেলেরা, সংখ্যায় অত্যন্ত কম, ইচ্ছা করিলে উকিল হইবে। ইহাই স্বাভাবিক। এক সময়ে কলিকাতায় অনেক ইংরাজ ব্যারিষ্টার্ ছিল, কিন্তু তাদের সংখ্যা খুব কমিয়াছে, এবং আরও কমিবে। ভারতবর্ষ এবং বর্ম্মার যে সব স্থানে বাঙ্গালীরা গিয়া ওকালতি করিয়াছে এবং হাইকোর্টের জজ্ও হইয়াছে, সেখানকার অবস্থাও ঠিক ঐরূপ দাঁড়াইয়াছে। স্থানীয় লোকেরা যোগ্য হইলে, বাহিরের লোকদের প্রতিপত্তি থাকে না। ওকালতী এবং চিকিৎসা ব্যবসায়ে কেবল, দেশের লোক হইলে কৃতকার্য্য হওয়া

যায় না। যাদের দ্বারা উপকৃত হয়, লোকেরা তাদেরই নিযুক্ত করিয়া থাকে।

উকিলখানায় জাত এই মনের ভাব স্বল্পসংখ্যক শিক্ষিত লোকের মধ্যে আবদ্ধ আছে। পাশাপাশি প্রদেশের মধ্যে, সব বিষয়ে আদান প্রদান স্বাভাবিক। কটক, পুরী, এবং বালেশ্বর জেলার মধ্যে যত বাঙ্গালী উকিল আছে, সকলের আয় জড়াইয়া, মাসে পঁচিশ হাজার টাকার বেশি হয় না। বাঙ্গালা দেশের অন্য সব স্থানে যারা আছে, তাদের বাদ দিয়া, কেবল কলিকাতা এবং হাওড়ায় যে উড়িয়ারা আছে, তারা সাধারণ মেহনতের দ্বারা স্বচ্ছন্দ ভাবে, মাসে খুব কমে দশ লক্ষ টাকা রোজগার করে। উড়িষ্যার বার আনা ব্যবসায় বাহিরের লোকের হাতে, তাদের মধ্যে অধিকাংশই বম্বে এবং গুজ্‌রাট্ অঞ্চলের লোক। কই তাদের বিরুদ্ধে কখন কাহাকেও কিছু বলিতে ত শোনা যায় না? বাঙ্গালী উকিলদের অপেক্ষা তাদের আয় পঞ্চাশ গুণেরও অধিক।

আমি এই নূতন সঞ্জাত মনোমালিন্যের দ্বারা কখনই বিচলিত হই নাই। যোগ্য উড়িয়াকে ফেলিয়া আমি কখন অযোগ্য বাঙ্গালীকে পছন্দ করিতে পারি নাই। কটকে, এক সময়ে, একটি উচ্চ পদের জন্য, রায় বাহাদুর সুদামচন্দ্র নায়ক এবং আমার একজন স্থানীয় বাঙ্গালী আত্মীয়, প্রার্থী হইয়াছিলেন। সুদামচন্দ্র একজন যোগ্য ডেপুটি, এবং সুখ্যাতির সহিত 'উৎকল দীপিকার' সম্পাদকের কাজ কিছুকাল করিয়াছিলেন। তাঁর উদারতা এবং নানাবিধ গুণের আমি পক্ষপাতী ছিলাম। সুদামচন্দ্রের সহিত তাঁর বাঙ্গালী প্রতিদ্বন্দ্বীর তুলনা হয় না। আমি তাঁর স্বপক্ষে, জানাজানি হইল। একদিন স্থানীয় একজন নামজাদা রায় বাহাদুর বাঙ্গালী আসিয়া, সুদামচন্দ্রকে ভোট না দিয়া বাঙ্গালী প্রার্থীকে ভোট দিবার জন্য, আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমি সুদামচন্দ্রকে ভোট দিলাম।

এই মনোবিচ্ছেদ সাধারণ লোকদের স্পর্শ করে নাই। আমার স্থির বিশ্বাস, উড়িয়াদের মধ্যে উচ্চশিক্ষিত লোকের সংখ্যা বেশি হইলে, এই সাময়িক মনের ভাব অদৃশ্য হইবে।

উড়িষ্যার বাঙ্গালীদের সম্বন্ধে আর একটি কথা বলা দরকার মনে করি। হিন্দুদের সামাজিক বন্ধন এরূপ, বাঙ্গালী যতকালই উড়িষ্যায় থাকুক, সামাজিক হিসাবে তাকে বাঙ্গালী হইয়া থাকিতে হইবে, কারণ উড়িয়ার সহিত বাঙ্গালীর

সামাজিক বন্ধন হইতে পারে না। আগে যখন যাওয়া-আসার সেরূপ সুবিধা ছিল না, উড়িষ্যার বাঙ্গালীরা, নিজেদের মধ্যে কোন-রকমে সামাজিক কাজ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া থাকিত। রেলের রাস্তা হইবার পর, উড়িষ্যার অনেক বাঙ্গালী এখন বাঙ্গালা দেশে পুত্র-কন্যাদের বিবাহ দিয়া থাকে। সেজন্য বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা তাদের মধ্যে আগেব অপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছে। কেবল উড়িয়া জানা পাত্র-পাত্রীকে, বাঙ্গালা দেশের বাঙ্গালীরা কখনই পছন্দ করিতে পারে না। তাহা ছাড়া, বাঙ্গালা ভাষার আদর, তারা যেখানেই থাক, বাঙ্গালীদের মধ্যে অধিক হওয়া স্বাভাবিক। একজন উচ্চ শিক্ষিত উড়িয়া, কিছু কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছেন, উড়িষ্যার বাঙ্গালীরা আর সেরূপ উড়িয়া ভাষা চর্চ্চা করে না। ঐ কটাক্ষের দু'রকম অর্থ করা চলে। স্থানীয় বাঙ্গালীরা উড়িয়া ভাষার চর্চ্চা না করিলে, ভাষার সম্পদ ক্ষুণ্ণ হইতে পারে ভাবিয়া যদি কথাটা বলা হইয়া থাকে, নিশ্চয়ই তাহা উড়িয়াদের আত্ম-সম্মানে আঘাত করে। অতি অল্প সংখ্যক বাঙ্গালীরা উড়িয়া ভাষার চর্চ্চা না করিলে, ভাষার গৌরবের হানি হইবে, ইহা অত্যন্ত হাসির কথা! যদি কটাক্ষের উদ্দেশ্য হয়, উড়িয়া ভাষা আগেকার মত চর্চ্চা না করার জন্য, স্থানীয় বাঙ্গালীরা বিদেশী ভাবাপন্ন হইতেছে, এবং উড়িষ্যায় তাদের দাবি আর গ্রাহ্য করা হইবে না, তাহাও সেইরূপ হাসির কথা। উড়িষ্যার মুসলমানেরা, বাল্যকাল হইতে উর্দ্দু ভাষা শিক্ষা করে, এবং বাঙ্গালার মুসলমানেরা বাঙ্গালা ভাষায় যেরূপ বাড়িতে কথা কহিয়া থাকে, তারা বাড়িতে উড়িয়াতে কথা না কহিয়া উর্দ্দুতে কথা কয়। সেজন্য কেহ কখন ভাবে নাই যে, উড়িষ্যার মুসলমানেরা তাদের দাবি হইতে বঞ্চিত হইবে। মধুসূদন দাস, সি, আই, ই, একসময়ে উড়িষ্যার সর্ব্বপ্রধান নেতা ছিলেন। তিনি খৃষ্টীয়ান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং ইংরাজের গির্জ্জায় উপাসনা করিতে যাইতেন। তিনি বাঙ্গালীর মেয়েকে বিবাহ করেন, এবং বাড়িতে, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত, সকলের সঙ্গে বাঙ্গালায় কথা কহিতেন। তাঁর উত্তরাধিকারী বাঙ্গালী হইয়াছে। ঐ সব কারণে কখন কেহ ভাবে নাই, মধুসূদন উড়িষ্যার নেতা হইবার অযোগ্য! এক দেশের লোক হইবার জন্য, এক ধর্ম্ম, এক সামাজিক বন্ধন, কিংবা মাতৃভাষা এক হওয়া, দরকার করে না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

শেষ কথা

বয়স যখন অল্প, বুদ্ধি ও বিবেচনা অপেক্ষা উৎসাহ এবং উদ্দাম কল্পনা যখন বেশি, অনেক সময়ে সৃষ্টির নিয়মের ভুল ধরিয়াছি। মনে করিতাম, সৃষ্টি কত ভাল হইতে পারিত, যদি তার তেমন বুদ্ধিমান পরিচালক থাকিত! আর এখনকার মনের ভাব? ভুল মনে করিয়া বিষয়ের তলা পর্য্যন্ত না গেলে, ভুলটা ভাল ধরা যায় না, কিংবা সত্যের মর্ম্মও তেমন বুঝা যায় না। এখন যে দিকে দেখি, যে অবস্থার কথা ভাবি, মনে হয়, ঠিক সময়ে জিনিষের উচিত বিকাশ হইতেছে। অল্প বয়সে,সংসার জয় করিয়া নিজের অধীনে আনা যায়— যদি মনে এভাব আসে, এবং তাহা করিতে না পারিয়া, কেহ গ্রামের মোড়ল হইয়া যদি দিন কাটায়, অপরিপক্ক বয়সের ঐ আকাঙ্ক্ষা যে পাগলামি আর বলিতে ইচ্ছা করে না; কিংবা যখন বেশি বয়সে, সংসারের সঙ্গে যুঝিয়া ক্ষত-বিক্ষত হইয়া, অধিকাংশ ধারণা ভ্রান্ত বুঝিতে পারা যায়, তখনও মনে হয় না যে উদ্যম বৃথা গিয়াছে। এ সংসারে কি মানুষ আসে, কয়েকটি কামনা পূর্ণ করিয়া, তৃপ্ত হইয়া, দিন কাটাইবার জন্য? এত বড, এত বিচিত্র, এত রহস্যময় সৃষ্টি কি ঐরূপ সঙ্কুচিত উদ্দেশ্যের ক্রীড়াভূমি হইতে পারে? যদি তাহাই হইত, বিধাতা এরূপ শক্তিমান ও ঐশ্বর্য্যশালী, প্রত্যেক লোকের ইচ্ছা এক মুহূর্ত্তে পূর্ণ করিতে পারিতেন; রোগ, শোক, অভাব লোককে পীড়ন করিত না; বসুন্ধরা মাসে একবার প্রচুর ফসল দিয়া সকলকে পরিতুষ্ট করিত!

তাই কামনার দিক হইতে জীবন একবার আলোচনা করিতে ইচ্ছা হইতেছে। বাল্যকাল উচ্ছৃঙ্খল ভাবে কাটার পর, বুদ্ধির বিকাশ যখন প্রথম হইল, হতাশ প্রাণে কেবল দু'একটা পাশ করিয়া কোন রকমে জীবন যাপনের অধিক আকাঙ্ক্ষা করিতে পারি নাই। তার পর, যখন পাশের পর পাশ করিতে লাগিলাম, খ্যাতি এবং অর্থের জন্য মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। অকপটভাবে বলিতে গেলে, খ্যাতির অপেক্ষা অর্থই বেশি কামনা করিয়াছি। অনেক সময় যখন খ্যাতির কামনা করিয়াছি, তাঁহা অধিক অর্থলাভের জন্য। ফলে কি হইয়াছে? খ্যাতির জন্য সেরূপ ব্যগ্র না হইয়াও, কতক পরিমাণে তাহা লাভ করিয়াছি, কিন্তু প্রচুর অর্থ লাভের সব চেষ্টাই বিফল হইয়াছে!

মন স্থির করিয়া কিছু সময় কাটাইতে পারিলে, যথেষ্ট উপার্জ্জন করিতে পারিতাম, অথচ মনের ঐ স্থিরতা আসে নাই। একবার নয়, এরূপ অনেকবার ঘটিয়াছে। যে সময়ে যে ভুল না করিলে প্রচুর অর্থাগম হইত, ঠিক ঐ ভুল করার প্রবল ইচ্ছা হইয়াছে এবং করিয়াছি! কলিকাতায় বি, এ, পড়া ত্যাগ করিয়া কটকে চলিয়া না আসিলে, অক্লেশে মুন্সেফ্ এবং যথাসময়ে জেলার জজ্ হইতে পারিতাম; হঠাৎ পাটনা হাইকোর্ট ছাড়িয়া না আসিলে, অন্য বন্ধুদের মত সেখানে প্রচুর উপার্জ্জন করিতে পারিতাম; কটক ম্যুনিসিপ্যালিটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না হইলে, অনায়াসে কটকের একজন ভাল পসারওয়ালা উকিল হইতে পারিতাম; এরূপ অনেক ভুল করিয়াছি।

তার পর, ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে, যাহা কিছু ধৈর্য্য ছিল হারাইয়া, ওকালতি আর করিব না স্থির করিলাম। একবছর পরে, রাভেন্সা কলেজের আইনের অধ্যাপক হইলাম। ইহার পরিণাম কি দাঁড়াইবে, প্রথমে নিজেই বুঝিতে পারি নাই। কটকে নিজের বাড়ি ছাড়িয়া, কলেজের নিকট সহরের একপ্রান্তে, একটি বাড়ি লইয়া একাকী রহিলাম। অবিবাহিত পুত্ররা কলিকাতায় থাকিত, স্ত্রী তাদের নিকট রহিলেন। তিন মাইল দূরে আমার ভাইয়েরা থাকিত, প্রয়োজন হইলে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিত। একমাত্র বন্ধু ব্রজসুন্দর, যার সঙ্গে সময় কাটাইতে ভাল লাগিত, সেও দুই মাইল দূরে থাকিত, মাঝে মাঝে তার সঙ্গে দেখা হইত। বছরের নয় মাস এইভাবে কাটিত। প্রচুর অবসর পাইয়া মন শান্তভাব ধারণ করিল, ধীরে ধীরে তত্ত্বচিন্তায় হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সকালে দুই ঘণ্টা পড়াইয়া, বাকি সময়, লেখার কাজ না থাকিলে, নানাবিধ দর্শনের বই পড়িতাম এবং চিন্তায় মগ্ন হইয়া থাকিতাম। এখন ভাবিয়া দেখিতেছি, দুই বেলা ঘর পোরা মক্কেল লইয়া, মামলার স্বপক্ষে বিপক্ষে, সূক্ষ্ম যুক্তির চিন্তা করিয়া, সময় কাটানর তুলনায়, ঐরূপ জীবন কতদূর মসৃণ ও চিন্তার অনুকূল। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে উপনিষদ্ সম্বন্ধে বই লিখিলাম। ঐ বই লিখার পর, জীবনে যাহা কিছু ঘটিয়াছে, এক নূতন দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলাম। আকাঙ্ক্ষা-মত উপার্জ্জন করি নাই সত্য, কিন্তু তার পরিবর্ত্তে যাহা করিতে পারিয়াছি, তার সঙ্গে কি অর্থের তুলনা হয়? যদি আমার দাবি সত্য হয়, উপনিষদের—মানব চিন্তার চরম ফলের—পঙ্কোদ্ধার আমার দ্বারা হইয়াছে, ইহা অপেক্ষা জীবন আর কি মহৎ কাজে নিযুক্ত হইতে পারে? নিজের বই পড়িয়া শরীর রোমাঞ্চিত

হইয়া উঠে, আমি যে ঐসব বিষয় চিন্তা করিয়া লিখিতে পারিয়াছি, ভাবিয়া বিস্মিত হই। যদি ধরিয়া লই আমার দাবি অলীক—নিজের সম্বন্ধে ধারণা কেহ খাট করিয়া করে না—তবু যাহা থাকে তাহা যে অমূল্য। লোক আজীবন চেষ্টা করিয়া, এমন কি কথায় যেরূপ বলে, অনেক জন্ম কাটাইয়াও শান্তি পায় না, আমি সে শান্তি পাইয়াছি, তার সঙ্গে পৃথিবীর সমস্ত অর্থের কি তুলনা হইতে পারে?

অর্থের অন্বেষণে কৃতকার্য্য হইলে, জীবন কি ঐ ভাবে নিযুক্ত করিতে পারিতাম? আইন ব্যবসায়ের মর্ম্ম বেশ জানি। ব্যবসায় ত্যাগ না করিলে, যথার্থ অবসর, কৃতকৃত্য ব্যবহারজীবী, কখন উপভোগ করিবার সুবিধা পায় না। যে অবসর পাইয়া থাকে, তাহা ক্লান্তি দূর করিতে কাটিয়া যায়, অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন লোক না হইলে, ব্যবসায় সংক্রান্ত ভিন্ন অন্য বিষয়ে মৌলিক চিন্তা কখনই সে করিতে পারে না। তখন এই চিন্তা রোধ করিতে পারি না, জীবনের নির্দ্দিষ্ট পথে যাইবার জন্যই প্রচুর উপার্জ্জনের চেষ্টা সফল হয় নাই। একে একে অধিক অর্থাগমের সকল চেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছে, অর্থশালী লোক অপেক্ষা আমাকে অধিক সুখী করিবার জন্য।

তবে কি সকলের জীবনে নিরূপিত কাজ আছে, যাহা সে করিয়া থাকে? তার কি কোন সন্দেহ আছে? তুমি ছোট একটি গৃহের কর্ত্তা হইয়া, সংসারের নানাবিধ কাজের জন্য লোক নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখ, আর অনন্ত সৃষ্টি যাঁর ইচ্ছায় চলিতেছে, তিনি কি কাজের ভাগ, এবং সেগুলি কে করিবে, ঠিক করিয়া রাখেন নাই? ইহা ত হইল কথার সোজা দিকের উত্তর, কিন্তু তার একটি জটিল দিক আছে, যাহা বুঝিতে সময় লাগে। যারা এরূপ কাজ করিয়া জীবন কাটায়, যাকে সাধারণ লোকেরা মন্দ কাজ বলিয়া থাকে, তারাও কি ঐ সব কাজ করার জন্য সংসারে আসিয়াছে? তাদের যে ঐ কাজগুলি করিবার কথা, তার কোন সন্দেহ নাই, কেবল মনে রাখা দরকার, যাকে মন্দ বলি, তাহা আসলে মন্দ নয়, তাহা অজ্ঞান প্রসূত কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। ধীরে ধীরে মানুষের বিবেচনা এবং জ্ঞানের বৃদ্ধি, সৃষ্টির এই নিয়মের অবশ্যম্ভাবী ফল হইতেছে, যাকে বলি ভাল, তার পাশে যাকে বলি মন্দ, তার স্থিতি। মন্দ যেরূপ আসলে মন্দ নয়, ভালও সেরূপ নিরবচ্ছিন্ন ভাল নয়, অপেক্ষাকৃত ভাল, অর্থাৎ, মন্দের অপেক্ষা ভাল। যখন জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ হয়, ভালমন্দের পার্থক্য থাকে না। তাই, মন্দ কাজ করার জন্য

যেরূপ লোককে যথার্থ ঘৃণা করা যায় না, ভাল কাজ করার জন্যও লোককে যথার্থ প্রশংসা করা চলে না, কারণ, উভয় কাজই এক নিয়মের ফলে হইতেছে, যাহা জগৎব্যাপী এবং সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে। কাজের ভার, শক্তি অনুযায়ী দেওয়া হয়, অর্থাৎ, যার আধারে যেরূপ শক্তি আছে, সেইরূপ কাজ সে করিয়া থাকে।

কেহ মনে করিতে পারে, ইহা অবিকল অদৃষ্টবাদীর মত বলা হইল। এত বিদ্যা-বুদ্ধি, এত গবেষণার ফল কি, অদৃষ্টের হাতে আত্মসমর্পণ করা? এ তো ঠিক এদেশের মত হইল! এত জাঁক করিয়া শেষে না বলিয়া, গোড়ায় এ কথা বলিলে, মানাইত ভাল! ইহাকে অদৃষ্টবাদ বলে না, এইরূপ বিশ্বাস হইতেছে সম্পূর্ণ জ্ঞান-সম্মত। বিজ্ঞান এখন পরিষ্কার কণ্ঠে এবং দৃঢ়ভাবে বলিতেছে, একই শক্তি সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। শক্তি এক, তাব প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য কোন শক্তি নাই। অসংখ্য ছোট বড যে সব শক্তি জগতে কাজ করে, তাহা ঐ এক শক্তির রূপান্তর মাত্র। সে শক্তি অন্ধ শক্তি নয়, তাহা ইচ্ছা শক্তি। সেই এক ইচ্ছা-শক্তি কোটি কোটি রূপে সৃষ্টিতে পরিণত হইয়াছে। জীব বা জড় পদার্থ, প্রখরবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষ বা পাগল, ধার্ম্মিক বা অধার্ম্মিক, সৃষ্টির যতরূপ বিভাগ আমরা দেখিয়া থাকি, সবই সেই এক শক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপ বা স্তর। প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের মত এক বলিয়া কথা চাপা দেওয়া যায় না। ঈশ্বব কে না বিশ্বাস করে, কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে কল্পনা এত প্রকারের, কোন দুই কল্পনা এক বলা চলে না। সেবক হইয়া যে ঈশ্বরের কৃপাভিক্ষা করে, তার সহিত তত্ত্বমসি-বাদীর যেরূপ প্রভেদ, অদৃষ্টবাদী বলিয়া যাকে উপহাসের পাত্র মনে করা হয়, তার সহিত, যে বলে এক জ্ঞানময় অভ্রান্ত শক্তি বিচিত্র সৃষ্টিতে পরিণত হইয়া রহিয়াছে, সেইরূপ আকাশ-পাতাল প্রভেদ!

যার সত্যের পিপাসা আছে, কয়েকটি বিষয় তার মনে রাখা দরকার। কার্য্য-কারণের নিয়ম কেহ লঙ্ঘন করিতে পারে না, কারণ না থাকিলে কাজ কখন হয় না। যে মানুষ দুই রশির দূরে বস্তু অস্পষ্ট দেখে, দিনকয়েক আগে যে ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা স্মরণ রাখিতে পারে না, বার বার চেষ্টা না করিলে কোন জিনিষ ভাল বুঝিতে পারে না, এই বিরাট সৃষ্টি ও স্রষ্টা সম্বন্ধে ধারণা করার জন্য তার উচিত যোগ্যতা যে দরকার, সে বিষয়ে কি কোন সন্দেহ আছে? যাহাতে ধারণা-শক্তি এবং বিচারের ক্ষমতা দিন দিন বাড়ে,

সেজন্য প্রথম সংযম অভ্যাস করা দরকার। পুরুষানুক্রমে সংযমহীন হইয়া জীবন কাটাইয়া, আমরা দেহ-মন এরূপ ক্ষীণ করিয়া ফেলিয়াছি, গভীর চিন্তা করা দূরেব কথা, গভীর চিন্তার মর্ম্ম গ্রহণ করার ক্ষমতা আমাদের ক্রমশ লোপ পাইতেছে! সংযম অভ্যাস না করিলে, মেধাশক্তি কখন বাড়িতে পারে না। তলাফুটা কলসীর ভিতর যতই কেন কায়দা করিয়া জল ভরিতে চেষ্টা কব, তাহাতে জল বেশিক্ষণ থাকে না! দিন দিন সংযমহীন হইয়া জীবন যাপনের আমাদের যেরূপ ব্যবস্থা হইতেছে, গভীর চিন্তার নিকট শীঘ্র বিদায় লইতে হইবে, কেবল মোটা বুদ্ধি খাটাইযা যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া থাকিতে হইবে। একসময়ে হিন্দুস্থান সংযমের বড়াই করিতে পাবিত, কিন্তু এখন অন্যান্য সংযমহীন দেশের দশা প্রাপ্ত হইবার যোগাড় করিতেছে। এখন হিন্দুর সামাজিক ব্যবহারে, সাহিত্যে, কলায়—দৈনিক জীবনে—অসংযমের প্রবাহ ছুটিয়াছে। যখন শক্তিহীন হইয়া, ঘরে ঘরে জড়মতি বোকার দল বৃদ্ধি পাইবে, তখন হিন্দু বুঝিতে পারিবে, অসংযমের ফল, আনন্দ না শোক-তাপ বৃদ্ধি!

সংযম অভ্যাস না করিলে অগ্রসর হওয়া যায় না, কিন্তু কেবল সংযমের দ্বারা সত্যের পথ প্রসারিত হয় না। তার পর অত্যন্ত প্রয়োজন, সঙ্কীর্ণতা দূর করা। সংযম অভ্যাস অপেক্ষা ইহা কোন অংশে সহজ নয়, এক হিসাবে অধিক শক্ত। মনের বলের দ্বারা কয়েকটি নিয়ম পালন করিলে, মানুষ সংযমী হইতে পারে—এখনও এদেশে সংযমী লোক দেখিতে পাওয়া যায়—কিন্তু মনের সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করার জন্য বুদ্ধি ও বিবেচনার অধিক দরকার। আমি এদেশে সংযমীদের মধ্যে সঙ্কীর্ণতাশূন্য লোক খুব কম দেখিয়াছি। মনের উদারতা লাভ, অনেক সময়ে, এক জীবনে হয় না। ঐ যে দেখিতেছ, মন্দির হইতে পূজা শেষ করিয়া, তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ উপবীতধারী ব্রাহ্মণ আসিতেছেন, উপনিষদ্ তাঁর কণ্ঠস্থ, কিন্তু যদি তাঁর সমান জ্ঞানী একজন বৈশ্যকে আলিঙ্গন করিতে বল, কিংবা মরণাপন্ন একজন নিম্নজাতির লোককে পথের ধার হইতে কোলে তুলিয়া লইয়া, চিকিৎসার দ্বারা প্রাণরক্ষা করিতে বল, তিনি অবাক হইয়া তোমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিবেন! ঐ যে দেখিতেছ, অদূরে মস্‌জিদের মধ্যে, পাকা চুল এবং দাড়ি লইয়া সৌম্যমূর্ত্তির একজন মৌলবি সাহেব বসিয়া আছেন—সম্মুখে তাঁর ঈশ্বরের বাক্য খোলা—ঐ বাক্যের বিপরীত কোন একটি সত্য গ্রহণ করিতে বল, তিনি হাসিয়া

উঠিবেন! ঐ দেখ, আরও কিছু দূরে গির্জ্জার মধ্যে, অতি অমায়িক চেহারার একজন খ্রীষ্টীয় যাজক রহিয়াছেন—তাঁর সম্মুখেও ঈশ্বরের বাক্য খোলা—তাহাতে বর্ণিত পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় ছাড়া অন্য কোন উপায়ের কথা বল, দেখিবে তাঁর মনের ভাব কিরূপ দাঁড়ায়! তাঁরা নিশ্চয়ই নিজ নিজ ধর্ম্মের স্তম্ভস্বরূপ, কিন্তু তাঁদের কি তত্ত্বদর্শী বলা যায়? চরিত্রবান হওয়া সোজা, পরোপকারী হওয়া সোজা, প্রচলিত হিসাবে ধার্ম্মিক হওয়াও সোজা, কিন্তু সঙ্কীর্ণতাশূন্য হইয়া সত্যপথ অবলম্বন করা অত্যন্ত কঠিন। প্রত্যহ অসংখ্য লোক মনে করে, তারা ঈশ্বরের অভিমুখে যাইতেছে, কেহ কেহ মনের আনন্দে ভাবিয়া থাকে, ঈশ্বরলাভ করিয়াছে—তাহা কি সত্য? কখনই সত্য হইতে পারে না। যার মনে সৃষ্টি সম্বন্ধে সঙ্কীর্ণ কল্পনা দিবারাত্রি রহিয়াছে, সে কি কখন তাঁকে বুঝিতে পারে? তাঁর সৃষ্টি সম্বন্ধে অজ্ঞতা মানে তাঁর সম্বন্ধে অজ্ঞতা। সঙ্কীর্ণ হৃদয়ের লোক, সংযমী হইয়াও, ঈশ্বর হইতে অনেক দূরে থাকে। এত আর পৃথিবীর কোন ঐশ্বর্য্যশালী লোককে তুষ্ট করা নয় যে, কেবল তাঁকে দিবারাত্রি বড় বলিয়া প্রশংসা করিলে, অভীষ্ট সাধন হয়, ঈশ্বরলাভ করা যায়!

মনের সঙ্কীর্ণতা মানুষের প্রধান শত্রু। সঙ্কীর্ণতা মানুষকে উর্দ্ধে উঠিতে দেয় না। ক্ষুদ্রতা মানুষের দৃষ্টিকে এত খর্ব্ব করিয়া ফেলে, বস্তু-বিষয় সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান সে লাভ করিতে পারে না। সৃষ্টির মধ্যে প্রকটিত নিয়ম, অপ্রশস্ত হৃদয়ের লোক বুঝিতে পারে না। নিজের ক্ষুদ্রতার দ্বারা জগৎ-সৃষ্টিকে সে এরূপ টুকরা টুকরা করিয়া অসংলগ্নভাবে দেখে, দিন দিন তার অজ্ঞতা বাড়িয়া উঠে, ঈশ্বরকে সে একজন সঙ্কীর্ণচেতা স্রষ্টা ধরিয়া লয়! নিজের ভেদাভেদ জ্ঞান অবশেষে সে ঈশ্বরে আরোপ করিয়া থাকে! অনুদার হৃদয়ের লোক কখনই তত্ত্বদর্শী হইতে পারে না।

আমি কখন নিজের জাতিকে বড় মনে করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে চেষ্টা করি নাই। নিজের জাতিকে উর্দ্ধে তুলিতে চেষ্টা করা নিশ্চয়ই উচিত, কিন্তু যার অন্য জাতির মহত্ত্ব বুঝিবার ক্ষমতা নাই, সে কখনই নিজের জাতিকে বড় করিতে পারে না। নিজের জাতিকে কেন্দ্র করিয়া যে মানবজাতিকে পরিধিতে পরিণত করিতে পারে না, তার মনের সঙ্কীর্ণতা কখনই যাইবে না। যখন আবার নিজেকে কেন্দ্র করিয়া, ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যতে বিস্তৃত

সমস্ত সৃষ্টিকে আলিঙ্গন করিয়া মানুষ চিন্তা করিতে শিখিবে, তখনই সে তত্ত্বদর্শী হইবে।

সংযম অভ্যাস এবং সঙ্কীর্ণতা দূরেব পর, অত্যধিক অধ্যয়নের প্রয়োজন। সাধাবণ শিক্ষাব শেষে, মনস্তত্ব এবং বৈজ্ঞানিক সত্যের গভীর আলোচনা অত্যাবশ্যক। অধ্যয়ন কবিতে হইবে—পণ্ডিত হইবার জন্য নয়, সত্যানুসন্ধানের জন্য। অধ্যবসায় থাকিলে, পণ্ডিত হইতে বেশি সময় লাগে না, কিন্তু জ্ঞানী হওয়া খুবই শক্ত। এখানে স্বভাব বা প্রকৃতি অধিক সাহায্য করিযা থাকে। সব বিষয়ে স্বভাবের বলের প্রযোজন, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বেশি প্রয়োজন, জ্ঞানলাভের জন্য। চেষ্টা করিয়া চিন্তাশীল এবং জ্ঞানী হওয়া কঠিন। তত্ত্বজ্ঞানের চর্চ্চা এবং প্রচার বহুলভাবে হইলে, পুরুষানুক্রমে মানুযের চিন্তাশীলতা এবং জ্ঞান নিশ্চযই বাড়িবে।

একটি কথা জিজ্ঞাসা করা খুবই স্বাভাবিক। সৃষ্টিতত্ত্বের দ্বাবা জীবনকে বিব্রত করিযা কোন লাভ আছে কি? যেরূপ ভাবে হউক, দিনগুলি কাটিয়া যায়, তত্ত্বের চাপে মানুষকে অধিক ব্যস্ত কবার কোন প্রয়োজন কি আছে? প্রযোজন খুবই আছে। জ্ঞানী হওয়ার প্রযোজন, জ্ঞানকে নিত্য ব্যবহারে লাগাইবাব জন্য। একটিও কি গৃহ আছে, যেখানে গভীর শোক পাইয়া লোক দিন কাটাইতেছে না? দুঃখী গৃহস্থ, একটিমাত্র ছেলেকে অতি কষ্টে মানুষ করিয়াছিল। সে ও তার স্ত্রী আশা করিয়াছিল, ঐ ছেলে উপার্জ্জন করিলে, সংসারে সুখ কাহাকে বলে, তারা প্রথম আস্বাদ করিবে। ছেলেটি বেশ উপার্জ্জন করিতে লাগিল। আহ্লাদে অধীর হইয়া, পিতা তার বিবাহ দিয়া বধূ ঘরে আনিল। এক বছর না যাইতে, সেই ছেলে ইহলোক ত্যাগ কবিল! ছাড়িয়া দাও গরিব গৃহস্থের কথা। ব্যবসায় করিয়া অপর্য্যাপ্ত অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে, দশ টাকা সাহায্য চাহিলে, একশত টাকা সাহায্য কবিয়া অর্থ কমিয়া গেল বুঝিতে পারে না, সেই ধনীর চার বছরের একটি মাত্র কন্যা, নয়নের মণি হইয়া রহিয়াছে। হঠাৎ সেই শিশু একদিন অসুস্থ হইল, চিকিৎসার জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করিয়াও পিতা তার জীবন রক্ষা করিতে পারিল না! ছাড়িয়া দাও মরণের কথা। রূপে-গুণে অতুলনীয় যুবক, প্রাণ ভরিয়া স্ত্রীকে ভালবাসিয়া, কিছুদিন পরে দেখিল স্ত্রী বিশ্বাসঘাতিনী! দেশের রাজা, যে ছেলেকে প্রাণের অপেক্ষা ভালবাসিত, একদিন দেখিল সে বিদ্রোহী হইয়া তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত!

একজন বৃদ্ধ প্রভাতে উঠিয়া দেখিল, জীবনের সমস্ত সঞ্চিত ধন, রাত্রে তস্কর চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে! সূর্য্যের প্রথম রশ্মি বিলের উপর পড়িবার সময় হইতে, সান্ধ্য আকাশে তারা ফুটিয়া উঠা পর্য্যন্ত খাটিয়া, পেট ভরিয়া একবেলা নিজে খাইতে না পাইয়া, কিংবা স্ত্রীকে খাওয়াইতে না পারিয়া, কৃষক ভাবিল, আত্মহত্যা ভিন্ন অন্য উপায় নাই! অধিক দৃষ্টান্তের প্রয়োজন কি আছে? ঘরে ঘরে দুঃখ এবং হাহাকারের কারণ রহিয়াছে। সেই দারুণ দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা প্রয়োজন। তত্ত্বালোচনার দ্বারা দুঃস্থ শরীরকে সুস্থ করা যায়, সুস্থ শরীরকে কখনই ব্যস্ত করা হয় না। জীবন-মরণের নিয়ম, সুখ-দুঃখের কারণ, আদিকারণের সহিত মানুষের সম্বন্ধ, ইহকাল, পরকাল, সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে, যথাসম্ভব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া, মানুষ তার দুঃখের ভার কমাইতে পারে। তাই, উপনিষদে বলা হইয়াছে, ব্রহ্ম-জ্ঞান মানুষকে, ব্রহ্মের ন্যায়, নির্ভীক এবং আনন্দময় করে।

* * * * * *

মৃত্যুর স্বর্ণদ্বারের নিকট আসিয়া, মনে কি চিন্তার উদয় হইতেছে? কত সংশয় ও দুর্ব্বলতার দ্বারা জীর্ণ হইয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছি, দেহান্তে তাহা আর বিব্রত করিবে না ভাবিয়া, হৃদয় উৎসাহে পরিপূর্ণ হইতেছে। কত কাজ বাকি থাকিল চিন্তা করিয়া দুঃখ পাইয়াছি, কাহারও অভাবে কিছুই অসম্পূর্ণ থাকে না, বুঝিতে পারিব ভাবিয়া, মন শান্ত হইয়া আসিতেছে।

শুদ্ধিসূচী

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭	২৪	১৮০৩	১৮১৩
১২	৪	একটা	একটি
৩৪	২০	পুনমূষিক	পুনর্মূষিক
৪০	৪	কাজে	কাজ
৪১	২৩	যুক্তি	চুক্তি
৬১	২৬	ভবিষ্যত	ভবিষ্যৎ
৬৪	১১	আবেদনকারীর	আবেদনকারীদের
৬৮	৫	যুবককের	যুবকদের
৯৪	৩০	অধিকাংশই	অধিকাংশ
১০৫	৭	করিলেন না,	করিলেন না।
১৭২	১৮	নারায়ণ	নরনারায়ণ
১৭৯	১৬	সরোজবাসিনী	সরোজবালা